কালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে ঘড়ির কাঁটা ঘোরে।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের রঙীন পাতাগুলি একে একে ঝরে যায়। তাকিয়ে দেখি, আবার মে মাস এসে গেছে।

সহরের বাতাসে উদ্দীপ্ত উত্তাপ,—মনের অন্দরে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া।

চরণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্তের দুর্নিবার আকর্ষণ পথে টানতে থাকে।

তবুও, আমার প্রবাস-যাত্রার প্রস্তুতির লক্ষণ নেই।

বন্ধু-বান্ধব আসেন। প্রশ্ন করেন, একি! এবার এখনও এখানে? হিমালয়ে যাওনি?

আশ্চর্য হয়ে দেখি, এঁরা আশ্চর্য হন আমি গেলেও, না-গেলেও!

উত্তর দিই, যাবো বইকি। সময় হলেই যাবো। এবার যাত্রা ক/ ভাদ্র-আশ্বিনে—আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে।

এর বিশেষ কারণ আছে।

হিমালয়ে—উত্তরাপথে যতবার ঘুরেছি, তখন মে-জুন মাস। সে-সময় কয়েকটি গন্তব্য-স্থলে ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয়নি। কেননা, তখন যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-সব দুর্গম স্থান বছরের সে-সময়ে তখনও তুষার-আবরণ মোচন করে না। গ্রীষ্মের খরতাপে বরফ ক্রমে গলে যায়, তারপর বর্ষাশেষে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পথ-চলাচল খানিকটা সম্ভব হয়ে ওঠে।

যেন, সে-সব অঞ্চলে প্রকৃতিদেবীর মানব-লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সেইমাত্র স্বল্পপরিসর অবসর।

তাই, পাহাড়ী বন্ধুরা পরামর্শ দেন, চলে আসুন এবার 'ভাদর-আশ্বিনে', তখন যাবেন ও-সব দিকে। আস্‌মান্ বিল্‌কুল সাফ্ থাকবে, বরফও গলে যাবে, চারিদিকে সব ফুল ফুটে থাকবে—নানান্ কিসিম্ ফুল;—কমলফুলের বাহার দেখবেন—সূর্যকমল, রুদ্রকমল, ব্রহ্মকমল—দেবতার পূজার সেই-ই তো ফুল!

কথার উৎসাহের উৎস-পথে ফুলের সুবাস যেন ভেসে আসে, মন আগ্রহে আকুল হয়ে ওঠে।

বদরীনারায়ণের সাধারণ যাত্রাপথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সেইসব নির্জন পথে যাওয়াই এবার উদ্দেশ্য।

তাই, যেখানে যাত্রীর যাত্রার সারা, আমার হবে সেখানে যাত্রার সুরু।

২

হরিদ্বার থেকে ১৬ মাইল দূরে হৃষীকেশ। বাস্‌ও চলে, ট্রেন-ও যায়। হৃষীকেশের পর হিমালয়ের পাহাড় সুরু। ১৩৫ মাইল দূরে পিপুলকোটি। বদরীনারায়ণের পথে এই পর্যন্তই এখন বাস্ চলাচল। তারপরে হাঁটা-পথ। বাস্ চলায় সুবিধা হয়েছে যাত্রীদের নানান্ বিষয়ে। এই সুদীর্ঘ পথ এখন বাস্-এ বসেই চলে যায়। দু'দিনেই পথ ফুরায়। পথ-চলার শারীরিক ক্লান্তি নেই। চটীতে অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পাটও সংক্ষিপ্ত হয়। এখন ইচ্ছা করলে কলকাতা থেকে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কেদারবদরীর যাত্রা সাঙ্গ করে ফেরাও সম্ভব হয়। তা ছাড়া, এই বাস্-পথ-এর প্রায় সব স্থানই বিশেষ গরম। অর্থাৎ, মে-জুন মাসে। নদীর ধারে ধারে পথ। ছায়া-বিরল। দু'দিকে উঁচু পাহাড়। গ্রীষ্মের খরতাপে পাথর তাপে। বাতাসও তপ্তবাণ হানে। হিমালয় যেন ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যায় বসেন। এখন বাস্-এ বসে নিমেষে সে-পথ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু, পরিপূর্ণ সুখ কোথাও সম্ভব নয়। যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে বাস্ কম। তাই স্থানাভাবে বাস্-এর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও বা অতিরিক্ত রাত্রিবাসও। বিশেষ ব্যবস্থা করে টিকিট-কাটা-প্রথার প্রচলনও হয়। সভ্যতার যান চলাচলের অনুকম্পায় পাহাড়ীরা চতুর হতে শেখে। বাস্-এর ভিতর ঠেসাঠেসি ভিড়। তার মধ্যে অনেকেই পাহাড়-পথে মোটর চড়ায় অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ, পাহাড়ীরা। তাদের মাথা ঘোরে, গা ঘুলায়। তারপর, যা হবার তাই হয়। সহযাত্রীর অভিযোগ করার উপায় নেই, করে লাভও নেই, শাস্তিও নেই। সুস্থ যাত্রীর তখন এমনি করুণ কাতর অসহায় ভাব।

ভাবি, পায়ে-হাঁটাই এ-পথের সত্যকার যাত্রা। ধরণীর ধূলি-ধূসরিত প্রাণে মনে অনন্ত আনন্দ আনে; পথের সঙ্গে পথিকের প্রকৃত পরিচয় ঘটায়। কিন্তু, বাস্-এর পথে হেঁটে চলার প্রেরণা পাই না। শুধু, অতি-দরিদ্র যাত্রী

অথবা অতি-ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী এখনও হৃষীকেশ থেকে হাঁটা-পথের পথিক হন।

পিপুলকোটি থেকে হাঁটা-পথে বদরীনাথ মাত্র ৩১ মাইল। বাস্ আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে পথ আরও কয়েক মাইল তৈরিও হয়েছে; বিরাট অজগর সাপের মতো পাহাড়কে আঁকড়ে ধরার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও ব্যর্থ সে উদ্যম। মানুষ পাহাড়ের পাথর কেটে, সেই পাথর দিয়েই পাহাড়ের পথ তৈরি করে, প্রকৃতি অট্টহাস্যে এক মুহূর্তে সে-পথ ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ করে দেয়।

গতবছর মে-জুন মাসে যে-পথ দেখে গিয়েছিলাম প্রশস্ত রাজপথ, সভ্যতার যান চলাচলের ভার নিতে প্রায় প্রস্তুত, বর্ষার পর এখন গিয়ে দেখি —জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ, পাহাড়-ধসার ফলে বহু জায়গায় নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে।

পিপুলকোটি থেকে মাত্র আট মাইল দূরে পাতালগঙ্গা। কয়বছরের চেষ্টাতেও বাস্-এর পথ এখনও পাতালগঙ্গার পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করতে পারেনি,—এমনি ভঙ্গুর ভয়ঙ্কর সে-পাহাড়!

তবুও, মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ডিনামাইটের প্রচণ্ড শব্দ ওঠে। প্রতিধ্বনিতে প্রকৃতির অট্টহাস্যও দ্বিগুণ হয়। পাহাড়ে মানুষে যেন যুদ্ধ চলে।

আগামী বছর যোশীমঠ পর্যন্ত নিশ্চয় বাস্ চলবে,—অনেকে আশা করেন।

কেউ বা আবার আশঙ্কা করেন, বলেন, যতদিন না চলে ভালোই। বাস্ চলাচলের সুবিধা আছে ঠিক। কিন্তু, শুধু বাস্-ই তো আসবে না, আনবে ভরে অশান্তির ভার, সভ্যতার সহস্র সমস্যা—যেমন বন্যার স্রোতে ভেসে আসে অজস্র জাল-জঞ্জাল!

আশা-আশঙ্কায় পাহাড়ীদের উন্মুখ মন আলো-ছায়ার আলপনা আঁকে।

কয়বছর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে।

তখনও কলকাতাতে। কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি। এক পরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁরও আসার বিশেষ ইচ্ছা। যথারীতি উৎসাহ দিই। তিনি প্রস্তুতও হন। প্রশ্ন করেন, কী কী জিনিস সঙ্গে নেবো বলুন তো?

ঠিক এমনি সময়ে পাণ্ডা শ্রীসূর্যপ্রসাদজি এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বলি, এই যে আদত লোক এসে গেছেন, ইনিই সব পরামর্শ দেবেন।

পাণ্ডাজি নতুন যাত্রী পেয়ে খুশী। নতুন যাত্রীও পাণ্ডার আশ্বাসবাণী শুনে নিশ্চিন্ত। দুজনে পরামর্শ চলতে থাকে। পাণ্ডাজি গাড়োয়ালী হলেও বাঙালী। বাংলাদেশের সঙ্গে বহুদিনের সংস্রব। পরিষ্কার বাংলা বলেন।

নতুন যাত্রীটি স্টেনো-টাইপিস্ট। সঙ্গে-নিয়ে-যাবার জিনিসপত্রের নাম বলে যাচ্ছেন পাণ্ডাজি, আর তিনি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে চলেছেন। অল্পেই তালিকা শেষ হয়। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, এই তাহলে! বিশেষ কিছুই তো নয় দেখছি। ব'লে, আবার তাঁর ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ বলেন, হাঁ, ধরেছি। একটা জিনিস আপনি বাদ দিয়ে গেছেন। সেটা লিখে নিই।

বিচক্ষণ পাণ্ডাজি আশ্চর্য হন। জিজ্ঞাসা করেন, কী বাদ দিলাম? সবই তো বলেছি মনে হচ্ছে।

তিনি উত্তর দেন, একটিন ঘি। শুনেছি ওখানে ভাল ঘি পাওয়া যায় না।

শুনেই পাণ্ডাজি হাঁফ ছাড়েন। গম্ভীর হয়ে বলেন, ওঃ!—নাঃ, ঘি নিয়ে যাবার দরকার হবে না, ওটা আপনি ওখানে পাবেন। তবে, আপনি ঠিকই বলেছেন, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। সেটা হলো—বনস্পতি-তেল। আপনারা তো বনস্পতিই খান, সেটা ওখানে পাবেন না। পাবেন ঘি, তা হয়ত অনভ্যাসে পেটে সইবে না। সঙ্গে একটিন বনস্পতি নেবেন।

মাত্র বছর পাঁচেক আগেকার কথা। সেদিন পাণ্ডাজি বিদ্রূপছলে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু, কয়বছরেই চোখের উপর দেখলাম, এ-যাত্রাপথে যতদূর বাস্ গেছে এখন সর্বত্রই বনস্পতির প্রচলন। ক্বচিৎ কখনো দু-একটা দোকানে 'বিশুদ্ধ ঘি'-এর তৈরি খাবারের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়—যেমন কলকাতা সহরেও। সহরবাসীদের মতন যাত্রীরাও অনেক সময়েই সেগুলি সন্দেহের চোখে দেখেন।

দুর্গম হিমগিরি বাস্-পথের অগ্রগতি অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, বনস্পতির গতিপথের এখন আর রোধ নেই। বাস্-পথ অতিক্রম করেও চলেছে।

বাস্-এর পথে পিপুলকোটির দশমাইল আগে চামোলী। চামোলীর অপর নাম লালসাঙা। এখানে অলকানন্দার উপর যে পুল আছে, এককালে

তার রঙ ছিল লাল। তাই, চামোলী সেই লালরঙের ছোপ নিয়ে নিজের নতুন রঙীন নাম নিল—লালসাঙা। চামোলী ও পিপুলকোটির মাঝপথে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। পাহাড়ীরা বলেন 'বিরেহী'। ম্যাপ-এও সেই নাম দেখি। সঙ্গমের কিছু দূরে বাস্-এর পথে বিরহী-নদীর উপর পুল। পুল পার হয়ে আবার অলকানন্দার কূল ধরে বাস্ চলে যায় পিপুলকোটি,—পাঁচ-মাইল মাত্র দূর।

পুলের কাছে আমরা বাস্ ছেড়েছি। গন্তব্য-স্থল বিরহী-তাল। সাহেবরা বলতেন, গোণা-লেক। এখান থেকে নয় মাইল পথ। বিরহী-নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে হবে। এ-পথে গ্রীষ্মকালেও যাবার কোনো বাধা নেই।

হিমালয়ের অন্দর, যেন, মানুষের অন্তর।

অন্তরে স্থান পেতে হলে প্রীতি-ভক্তি-প্রেমের ধারা ধরে চলতে হয়। হিমালয়ের অন্দরে পৌঁছুতে হলে তেমনি গিরি-নির্ঝরিণীর গতিপথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। তুষার-শিখর থেকে পার্বত্য নদী আপন বেগে ধেয়ে নামে। নদীর প্রবল প্রবাহে পাথর কাটে, পাহাড় ধসে—নদী তার পথ খুঁজে নেয়। নদীর সেই প্রবাহ-পথ অনুসরণ করে পথিকেরও পথ-চলা সুরু হয়।

বিরহী-নদীর ধারা ধরে আমরাও চলেছি।

৩

ক'দিন আগে হেমকুণ্ডের পথে পরিচয় হয়েছে বন-বিভাগের একজন অফিসরের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন একই সঙ্গে। ভালোই হয়েছে। এ-সব অঞ্চলে তাঁরাই রাজা। প্রবল প্রতিপত্তি। হবার কথাও। সঙ্গে দুজন চাপরাসী আছে। পুলের কাছে এ-অঞ্চলের রেঞ্জারবাবুও এসেছেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। যে ক'দিন তাঁর এলাকায় অফিসর থাকবেন, তিনি-ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, চলবেনও।

অফিসরটির পদমর্যাদা আছে। তাই, সে-গৌরবের ভারে ভারাক্রান্ত হবার কথা। কিন্তু, আগেই পরিচয় পেয়েছি তা তিনি নন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে এ-পথে চলতে সম্মত হয়েছি। তাতে আমাদের সুবিধাও হয়েছে। এ-পথে লোক-চলাচল নেই, পথের নিশানাও নেই। মাঝখানে একজায়গায়

একটা গ্রাম আছে। তাও, শোনা কথা। কেননা, সে-গ্রাম পাহাড়ের উপরে, পথ থেকে দূরে। তাই, চোখে পড়ে না। গ্রামবাসীদেরও এ-পথে যাতায়াত করার প্রয়োজন হয় না।

বিজন পথে একাকী পথ চলায় আমার ভয় নেই। গহন বনের মধ্যেও নয়। কেন জানি না, নিবিড় নির্জন অরণ্যে আলোছায়ায় আবছায়া পথে পথে একা ঘুরেছি, তবু মনে ছম্‌ছমে ভাব আসেনি। অপার আনন্দই পেয়েছি। বিরাট বনস্পতির শান্ত-ছায়ায় শ্রান্ত কায়া আশ্রয় পেয়েছে, তরু-লতার শ্যামল শোভা নয়নে স্নিগ্ধতা এনেছে। বনের পশুর হিংসার কথা মনে জাগেনি। কেননা, এত ঘুরেও তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার ভাগ্য কচিৎ-ই হয়েছে।

কিন্তু, এখানে পথের নির্দেশ না থাকায় পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। এঁরা থাকায় সে-অভাব মিটেছে।

অফিসরটি নতুন। নতুন এসেছেনও এ-পথে।

লম্বা, দোহারা চেহারা। সাহেবী পোশাকে আরও লম্বা মনে হয়। ফরসা রঙ। বয়স অল্প।

নাম অমরনাথ।

বলে, গতবছর চাকরিতে যোগ দিয়েছি। প্রথমেই গাড়োয়ালে পাঠিয়েছে। ভালোই হয়েছে। হিমালয় আমার ভালো লাগে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে গাড়োয়ালী নয়!

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে বোঝে। নিজেই বলে, পাহাড়ে আমার বাড়ি নয়, তবে পাহাড়-ই আমার এখন ঘর-বাড়ি। বনে-জঙ্গলে ঘোরাই হলো আমার কাজ। দেশ মথুরায়। পড়াশুনা করেছি আগ্রায়। এম, এস্‌সি, পাস করে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিলাম, পাসও করলাম। গভর্ণমেন্ট থেকে জানতে চাইলো, পুলিসে বা বন-বিভাগে কোথায় যোগ দিতে চাও? জানতাম, পুলিসের চাকরিতে পয়সা বেশী, প্রতিপত্তিও প্রচুর। তবুও, বন-বিভাগই বেছে নিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? এখানে তো বনে জঙ্গলে বাস? সমাজ-সভ্যতা-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন তো এ-জীবন?

শান্ত-স্বরে জবাব দেয়, তারি মধ্যে তো অপার আনন্দ। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়—এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কোন্ চাকরিতে আছে বলুন?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। চারিদিকে সুস্নিগ্ধ-দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে নেয়। উচ্ছল নদীর চঞ্চল জলধারায়, উজ্জ্বল আকাশের নিবিড় নীলিমায়, গহন বনের ঘন-শ্যামলিমায় মগ্ন হয়। 'চক্ষুভিরিব পিবন্তি'—সত্যই চোখ দিয়ে প্রকৃতির মনোলোভা শোভা যেন আকণ্ঠ পান করে নিতে চায়।

তারপর বলে, বদরীনারায়ণের পথে চাকরির প্রথমেই এসেছিলাম। কিন্তু, বিরহী-তালের পথে আসা হয়নি। এখন ইন্‌স্‌পেক্‌শনে চলেছি। হ্রদের ধারে বোট-হাউসটি এবার বর্ষায় প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। জিনিস-পত্রও কিছু নষ্ট হয়েছে। সেইসব দেখতে যাওয়াই উদ্দেশ্য। পথটাও দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। যে-পথে চলেছি আমরা, সেটা এবছরই প্রথম তৈরি হয়েছে। নইলে, পথ বলতে বিশেষ কিছু ছিলই না। এবছর এক মিনিস্টারের আসার কথা ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা তৈরি হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আসা হলো না—আপনারাই ভোগ করে গেলেন।

পথ-তৈরির পরিচয় পথ-চলার মাঝে পাচ্ছি বটে। আবার অনেক সময় দেখছি, পথ নেই-ও। সে-সব স্থানে পাহাড় ধসে গেছে, পথও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে, যদি সম্ভব হয়, নদীর মধ্যে নেমে জলের পাশে ছড়ানো পাথরগুলির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। যেখানে আবার নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে পাহাড়ের ধস্ খাড়া নেমে গেছে, নীচে নামা সম্ভব নয়, সেখানে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠে সে-সব স্থান কোনরকমে অতিক্রম করছি।

অমরনাথ বলে, পাহাড়ে প্রথম বছরের নতুন পথই সবচেয়ে বেশী ভাঙে। যেমন মানুষ প্রথম হাঁটতে শিখে বেশী পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণটিও সহজ। ভূতাত্বিকের মতে হিমালয় এত বিরাট হলেও, সৃষ্টির জগতে ছেলেমানুষ। এখনও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি। এ-সব পাহাড়ের পাথর ও মাটি সব জায়গায় শক্ত হয়ে দানা পাকায়নি। নতুন পথ তৈরির ফলে পাহাড়ের ভারসাম্যের হেরফের হয়, হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিরিরাজ ধস্ নামিয়ে দেন, পথরেখাও নিশ্চিহ্ন হয়। অথচ, এই পথ তৈরি করতে কম কাঠ-খড় আমাদের পোড়াতে হয়েছে? খরচ তো আছেই। তার কথা বলছি না। কিন্তু, গভর্ণমেন্টের কোন বিভাগ থেকে সেই খরচা হবে তারই সমাধান হতে ক'বছর কেটে গেল।

তারপর আশপাশের জঙ্গলগুলি দেখিয়ে বলে, সাধারণের ধারণা চারি-

দিকের সব জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে। কিন্তু আশ্চর্য হবেন শুনে যে, এর মধ্যে অনেক বড় বড় জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে নয়।

প্রশ্ন করি, বন বন-বিভাগের নয়, সে কী ব্যাপার ?

অমরনাথ দুঃখ করে বলে, কিন্তু তাই তো চলে আসছে! কবে কোন্ কারণে ইংরাজ-আমলে বড় বড় বনগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগের অধীনে রাখা হয়েছিল। এখন সেভাবে রাখার কোনও কারণই নেই, তবুও সেই-ভাবেই চলেছে। অনেক লেখালেখির পর এবার শুধ্ এই পথটুকু তৈরি করবার ভার বন-বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। মিনিস্টারের আসার সম্ভাবনায় তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। এখন সব বন্ধ।

হঠাৎ সোৎসাহে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভালো কথা। মাছ খান তো ?

এই আকস্মিক অবান্তর প্রশ্নে আশ্চর্য হই।

বলি, হঠাৎ এ-কৌতূহলের কারণ কি ? কথা হচ্ছিল তো পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, পথ-তৈরির ব্যাপার নিয়ে। মাছ এলো কোথা থেকে ?

হেসে উত্তর দেয়, বাঃ! চলছেন গোণা-লোকে, আর ও-প্রশ্ন করব না ? যারা ওখানে যায়, তারা সবাই তো মাছ ধরতে ও মাছ খেতেই যায়। ওখানকার ঐ তো মস্ত স্পোর্ট। তারই জন্যে ও-লেকের প্রসিদ্ধিও।

বললাম, তুমি খাও তো ? খুব ধোরো, খেয়ো।

সে বলে, মাছ আমিও খাই না। শুনেছি, সাহেবরা ওখানে ট্রাউট্-মাছ ফেলেছিল। এখনও মাঝে মাঝে ফেলা হয়। বিলেতী মাছ, একটামাত্র কাঁটা, খেতে সুস্বাদু। টাটকা, চলন্ত জলে ওরা নাকি থাকে ভালো।

হেসে বললাম, ভালো মানে মৎস্যাশীর লোলুপ দৃষ্টিতে থাকে ভালো। যেমন, কচি ঘাস খাইয়ে অতি-যত্নে পোষা কল্য-ভক্ষ্য ছাগ-শিশু!

মনে পড়ল, কয়বছর আগে পাঞ্জাবে কুলু-ভ্যালিতে ট্রাউট্-মাছের চাষ দেখেছিলাম। বিয়াস্-নদীর অর্থাৎ বিপাশার উপত্যকা। ঘননীল জল। স্ফটিক-স্বচ্ছ। তরঙ্গোচ্ছল। পাথরে আঘাত পেয়ে জলস্রোত সাদা-সাদা ঢেউ-এর পাল তুলে চলেছে। কোথাও বা নদীর স্রোত বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে, ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। নদীর ধারেই পাইন ও চীর্ গাছের বন। জলের একটা ধারাকে সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ধারার পথে মাঝে মাঝে বাঁধানো চৌবাচ্চা। সেখানে জল

জমে, আবার বয়েও যায়। সে-সব জলাধারের দুই মুখে ছোট ছোট দুয়ার। প্রয়োজন মতো সেগুলি খোলা বা বন্ধ করা যায়, জলের গতি-বেগ সংযত করা হয়। তারি মধ্যে বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন আকারের মাছ। কোন্‌টিতে কত বছর বয়সের মাছ আছে, পাশেই সাইন-বোর্ডে লেখা।

শিখ-অফিসরটি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মাছ বিক্রিও হয়। আমার সঙ্গীরা কিনতে উৎসুক হলেন।

সবচেয়ে বড় মাছগুলি যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে অফিসরটি বললেন, হাত দিয়ে আপনারা নিজেরাই ধরতে পারেন, কোনো ভয় নেই।

যতীনবাবু মৎস্যাশী। তবুও, মাছ ধরার উৎসাহ বা ধৈর্য তাঁর কোনকালে নেই। মাছ-ধরার এমন সহজ সুযোগ পেয়ে চৌবাচ্চার পাশে থপ্‌ করে বসে পড়ে তিনি জলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটি বিশেষ মাছের উপরই তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। অনেক করে সেটি ধরলেনও। হাতের মধ্যে মুঠা করে ধরেছেন। ধরেই আমাদের দিকে উৎফুল্ল নয়নে তাকালেন। মুখে বিজয়ী বীরের জয়োল্লাস। কিন্তু, নিমেষে মাছটা হাত থেকে সড়াৎ করে পিছ্‌লিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। 'এই পালালো'—বলে যতীনবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

শিখ ভদ্রলোকটি কিন্তু দেখলাম খুব খুশী। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন, ভালোই হয়েছে। অপর আর একটি ধরুন। আপনার উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারছিলাম না—ওটি মৎস্য-নারী, ওগুলি ধরার এখানে নিয়ম নেই। অত মাছের মধ্যে ঠিক ঐটিই আপনি বেছে ধরেছিলেন।

সবাই আমরা হেসে উঠি। যতীনবাবুও। বলেন, আমার ভাগ্যই এইরকম!

সেই দেখেছিলাম ট্রাউট্‌-চাষ।

কিন্তু, গাড়োয়ালে—উত্তরাখণ্ডে—এ-চাষ হলো কি করে? এ যেন মন্দিরে মৎস্য-ভোগ!

মায়ের মন্দিরে, মায়ের অনুচরদের জন্যে, হয়তো, নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু, এ তো শিব-স্থান!

এরও কারণ আছে। বিরহী-তাল প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। আবার মানুষের সৃষ্টিও নয়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যে এর জন্ম-কাহিনী।

বিরহী-গঙ্গার পৌরাণিক প্রাচীনত্ব আছে। সতীর দেহাবসানের পর বিয়োগ-বিধুর শঙ্কর এই তরঙ্গিণীর তটে বসে নিদারুণ তপশ্চর্যা করেন। সেই তপস্যার তপোফলে দেবী চণ্ডিকা পার্বতীরূপে আবার অবতীর্ণা হন—এই পুরাণকাহিনী। বিশ্বের ঈশ্বর তিনিও বিরহ-কাতর। সেই বিরহী শিবের বিগলিত অশ্রুর পূতধারার সূত্র ধরেই নদীর নামকরণ হলো বিরহী-গঙ্গা। পরমপাবনী নদী। 'ব্রীহিকা নাম বিখ্যাতা'।

শুনেছি, এ-অঞ্চলে কোথায় বিরহীশ্বর শিবের মন্দিরও আছে।

কিন্তু বিরহী-হ্রদের সে ঐতিহ্যময় গরিমা নেই, পুণ্যের মাহাত্ম্যও নেই। তবে প্রসিদ্ধির ভৌগোলিক কারণ আছে।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এক গভীর রাত্রে হঠাৎ গোণা-গ্রামের নিকটে এক বিরাট পাহাড়ের অর্ধাংশ ভেঙে পড়ে। সেই ধসে-পড়া পাহাড়ের বিপুল স্তূপে নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ রোধ করে ফেলে। ফলে, নদীর জল ক্রমে জমতে থাকে এবং একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস নদীর জল সেখানে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জমতে লাগল, অথচ সে-জল নিকাশের কোন পথ নেই। কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, জল-নিকাশের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অবশেষে, এগারো মাস পরে সেই ক্রম-প্রসারমাণ বিপুল বারি-রাশি আত্মশক্তির প্রভাবে নিজেই এ-সমস্যার সমাধান করে নিল,—প্রচণ্ড বেগে সেই ভগ্নস্তূপের বাঁধ ভেঙে এক ক্ষুরধারা নদী নেমে এলো। সংহারিণী তার মূর্তি, সর্বপ্লাবিনী তার শক্তি। দেবী চণ্ডিকা বুঝি আবার কলিযুগে প্রচণ্ড নদী-রূপেই নেমে এলেন!

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা!'

প্রবল বন্যায় চারিদিক ভেসে গেল। অলকানন্দাও সে-জলভারে স্ফীত হলো। গাড়োয়াল-রাজধানী শ্রীনগরের শ্রী লুপ্ত হলো, নগর ধ্বংস পেলো। হরিদ্বারের দ্বারদেশেও সে-বন্যার নির্দয়, ক্রুদ্ধ আস্ফালন আঘাত হেনেছিল। এখনও সে-সব দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে নদী শান্ত হলো। অবরুদ্ধ নদী মুক্তিপথের সন্ধান ফিরে পেলো।

তাই আজ দেখি তার উচ্ছল জলধারার সহজ সুন্দর গতিবেগ। নৃত্যভঙ্গে ছুটে চলেছে।

হ্রদের জল কিন্তু কমে গেলেও, থেকে গেল।

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে পাহাড়-ঘেরা হ্রদ, সাহেব-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুইজারল্যাণ্ডের স্বপ্ন-বিলাসী সৌন্দর্য-পিয়াসী মন নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে চলে এলেন এখানে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। আনন্দ-ভোগের লিপ্সা জাগল। জলে মাছ ভাসল, নৌকা চলল, তীরে বোট-হাউস তৈরি হলো।

স্বাধীনতার পর এখন সাহেবরা বিরল। তবুও যে-ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যেই জনকয়েকের এখনও গোণা-লেকে আনাগোনা। আর যান সরকারী কর্তৃপক্ষের কয়েকজন মাত্র।

কিন্তু, সে-মাছধরার মৎস্যগন্ধী গল্প ভালো লাগে না।

হিমালয়ের বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে মন চায়।

অমরনাথের হালকা শরীর। যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে সে চলে। অত দ্রুত চলা আমার স্বভাব নয়। তাকে বলি, তুমি এগিয়ে চলো। আমি ধীরে ধীরে যাবো। ভয় নেই, পথ ভুলব না; পিছনে তো তোমার চাপরাসীরা আসছে।

সে এগিয়ে চলে তার রেঞ্জারের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে। পথের দু'-পাশের গাছের পাতা দেখে, ফুল দেখে, টেনে ছেঁড়ে, গন্ধ নেয়—গাছের নাম বলে দেয়। রেঞ্জারকে কখনও বা প্রশ্ন করে, তোমাদের ভাষায় একে কি বলে?

আমার দিকে ফিরে বলে, এদেরও একবছর এসব বিষয়ে পড়তে হয়েছে, ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

গাছ, ফুল, পাতা—বন জঙ্গল—সবাই যেন জানতে পারে এসেছে তাদের বন-কর্তা। তাদের জন্ম-পরিচয়, নাড়ী-নক্ষত্র তার নখ-দর্পণে।

আমার মন, কিন্তু আন্‌মনা।

আমি পেছিয়ে পড়ি। ইচ্ছা করেই,—আরোও। একা চলায় আনন্দ অনেক। একা তো নয়,—নিজেকেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া, চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আবার নিজের মনোমুকুরে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখা। এ যেন একান্ত অন্তরঙ্গের সঙ্গে এক অভিনব লুকোচুরি-খেলা।

বন-পথ। বিশাল সব বনস্পতি। তারি ফাঁকে ফাঁকে পথের ধারে

নদীর নীল ধারা চোখে পড়ে। উপরে সবুজ পাতার জালি-পথেও দেখা যায় ফালি ফালি নীল আকাশ। গায়ে লাগে হেমন্তের প্রশান্ত বাতাস। সকালের রোদে চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করে। বর্ষার পর প্রকৃতির শুচি-স্নিগ্ধ শ্যাম-শোভা। যেন স্নান সেরে পুষ্পপাত্র হাতে জননী বসুন্ধরা স্মিত-বদনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

বাড়িতে দুর্গাপূজা। মা নিজের হাতে সব ভোগ রাঁধেন। আর কেউ রাঁধলে চলবে না। বলেন, সাহায্য করতে হয়, তরি-তরকারি এগিয়ে দাও। ঐ পর্যন্ত।

ভোরে স্নান সেরে গরদের লালপেড়ে শাড়ি পরে রান্নাঘরে ঢোকেন।

মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধা, খুলে গেলে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পড়ে। মুখের রক্তিম আভা আগুনের তাপে আরও রাঙা হয়ে ওঠে। উনুন তো একটা নয়, সারি সারি কয়টা জ্বলছে, সব-ক'টিতেই রান্না চড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার মা তো নন—জগজ্জননী দশভুজা। হাতে দশ-প্রহরণ নয়, রন্ধনের দশ প্রকরণ। আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা যেন দশ-হাতে রন্ধন করছেন।

একটু দূরেই পূজামণ্ডপ। নিজেই ভোগ বয়ে নিয়ে যান। প্রকাণ্ড সব থালা। ভারে দেহ নত হয়েছে। মাথায় ঘোমটা। বাড়ির অন্দরমহল, তবুও লজ্জা। বলেন, পুরুতঠাকুর রয়েছেন যে!

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁট চেপে ফুঁ দেন। হাওয়ায় ঘোমটার কাপড় অল্প ফাঁক হয়। তারি মধ্যে দিয়ে আড়চোখে দেখে পা ফেলে চলেন।

আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি। শুচি-স্নিগ্ধ মায়ের রূপ। রূপের ছটা যেন ঠিক্‌রে পড়ে। ভাইবোনে বলাবলি করি, দেখেছ,—মায়ের মুখখানি ঠিক প্রতিমার মুখ-বসানো—এক্কেবারে।

কথা শুনে মা রাঙা-মুখে চোখ রাঙান। ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধমধুর হাসি, —বলেন, ছিঃ! বলতে আছে! জ্বালাসনে কাজের সময়। ছুঁবি না'কি!

ছেলেবেলার সে-ছবি ভোলবার নয়। আজ প্রকৃতির রূপের মাঝে সেই ছবিরই প্রতিচ্ছবি দেখি। চারিদিক সুরভিত সুন্দর।

অনাবিল আনন্দে মন ভরে ওঠে।

পথ চলেছি। ধীরে ধীরে। চলার কষ্ট নেই। পথ-শ্রান্তিও নেই। কেননা, দুরারোহ চড়াই-এর অকস্মাৎ-সাক্ষাৎ-ও নেই।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে-আসা ঝরণাধারা পথের স্বচ্ছন্দ গতি অবরোধ করে। পুল নেই। ছোট-বড় ঝরণা। ছোট ধারাগুলি পার হওয়ার অসুবিধা নেই। জলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত পাথর। সেই সব পাথর ঘিরে জলের ধারা ছুটেছে। মাথা-উঁচু-করা পাথরগুলির উপর পা রেখে ডিঙিয়ে জল পার হই।

বড় ধারাগুলিরও জলের ভিতর নানান আকারের পাথর। কিন্তু, পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে যাওয়া সব জায়গায় সম্ভব নয়। কোথাও বা সম্ভব হলেও সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। সাবধানী মন কখনও বা সে-আত্মবিশ্বাসের অন্তরায় হয়। মনে ভাবি, অযথা সাহস প্রকাশের প্রয়োজন কি ?

পায়ের জুতা-মোজা খুলে ফেলি।

সঙ্গের পাহাড়ীরা বলে, কাঁধে উঠে পড়ুন, পার করে নিয়ে যাই।

হেসে বলি, কাঁধে চাপবার সময় যখন হবে নিশ্চয় উঠব। কিন্তু এ সময়ে নয়।

তারপর বলি, তোমরাও তো হেঁটেই পার হবে, তবে আমি-ই বা যাবো না কেন ?

সাবধান করে দেয়। বলে, তবে দাঁড়ান। চট্‌ করে জলে নামবেন না। জলের মধ্যে বড় পাথরগুলির কাছে কতখানি জল জানা নেই। কোমর-জলও কোথাও হতে পারে। ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো নেই। আগে আমরা পার হয়ে দেখি কোনখানে জল কম।

হাঁটুর উপর পায়জামার কাপড় তুলে একজন লাঠি-হাতে জলে নেমে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে বলে দেয় কোথা দিয়ে পার হব।

তারপর, আবার সতর্কবাণী। দাঁড়ান, জলের বড় টান। হাত ধরে চলুন।

সেইমতো যাই-ও। পায়ের তলায় জলের ভিতর কোথাও বা পিছল পাথর, কোথাও বা পাথরে রুদ্ধগতি নদীর প্রবল প্রবাহ। হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে

সহজেই পার হই। পাহাড়ী কর্কশ কঠিন মুষ্টি। বন্ধুর পথে প্রকৃত বন্ধুর স্পর্শানুভূতির তৃপ্তি আনে।

ছয় মাইল পথ চলে এসেছি। মাত্র তিন মাইল আর বাকি। বেলা এগারোটা বেজেছে।

অমরনাথ বলে, সামনে ঐ একটা নদী দেখছি, বিরহী-নদীতে এসে মিশেছে। ওরই কাছে বসে কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম করে আবার চলা।

সঙ্গী শিশিরবাবু বলেন, বিশ্রামে প্রয়োজন কি? মাটেই শ্রান্ত হইনি। ছ'মাইল পথ দু'ঘণ্টায় চলে এসেছি—বাকি তিন মাইলও একঘণ্টায় যাবো। একেবারে যাত্রাপথ সাঙ্গ করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

অমরনাথ হেসে বলে, অঙ্কর খাতার পাতায় হাতের হিসাবে ওটা মেলে বটে, কিন্তু হিমালয়ের পাহাড়-পথে পায়ে ও-আঁক মেলে না। শুনেছি, সামনে কয়েক জায়গায় এখনও পথ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কয়েক জায়গায় পাহাড়ও ভেঙেছে। এটুকু পার হতে সময় নেবে, একটু ক্লান্তিও হবে। তাই এঞ্জিনে কিছু জল-কয়লা ভরে নেওয়া ভালো। আমি অবশ্য একটানা চলতে প্রস্তুত,—চলার অভ্যাসও আছে।

কারণ শুনে অকারণ ক্লেশভোগে সকলেই নারাজ হই। নদীর ধারে বিশ্রামের আশ্রয় খুঁজি।

বিস্তীর্ণ বালি-ভরা নদী। স্বর্ণকান্তি বালুকারাশির উপর জলধারার সুনীল জাল বোনা। বড় ধারাটির হাত দুই-তিন উপরে দুখানা পাইনগাছের গুঁড়ি পুলের আকার ধরে শুয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। পড়ার আশঙ্কা কম, ভয়ও করে না,—কেননা, পড়লে জামা-কাপড়ই ভিজবে, তার বেশী কিছু নয়।

জলের ধারে বালির উপর নানান্ আকারের পাথর। কালো বড়-বড় পাথরগুলি দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন অনেকগুলি প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিশ্চল হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

দুটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে আরামে বিশ্রাম করি। পাথরের পাশেই জলের ধারা।

কল্‌কল্ স্বরে বয়ে চলেছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। জলের ভিতর সোণালী বালি চিক্‌চিক্ করে। ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। এদিক থেকে

ওদিকে যায়, আবার চকিতে এদিকে ঘুরে আসে। নদীর দুই তীরেই পাহাড়ের ঢালু গা। ধীরে ধীরে বহু উপরে উঠে গেছে। দুই দিকেই গভীর বন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের মাঝে শ্যামলতার স্নিগ্ধ শোভা।

অমরনাথ তরুণ। পরিশ্রমের শ্রান্তি জানে না। বিশ্রামের শান্তি মানে না।

এরি মধ্যে গাছের কয়েকটি বড় পাতা সংগ্রহ করেছে।

হেসে বলি, ওগুলি হবে কি? বটানির স্পেসিমেন নাকি?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সায়েন্স-সৎকার নয়, অতিথি-সৎকারের আয়োজন হচ্ছে।

শিশিরবাবু নদীর জলে পাতাগুলি ধুয়ে নেন। পাথরের উপর বিছিয়ে দেন। অমরনাথের চাপরাসী খাবার-ভরা টিফিন-কেরিয়ার আনে।

অমরনাথ বলে, পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল আমার ঘর-বাড়ি। তাই এখানে আপনারা আমার অতিথি। আমার অকিঞ্চন আয়োজনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করছি।

আলুর সব্জি, রুটি ও মুগের ডালের নাড়ু। অমৃতভোগের আস্বাদন পাওয়া যায়।

আহারান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম। নদীর ধারেই গাছের নীচে সামান্য একটু ছায়া। সেই ছায়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ মেখে শ্রান্ত দেহখানি একটি পাথরের উপর এলিয়ে দিই। চোখে আলস্যের আবেশ আসে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু জলধারার একটানা ছলছল্ শব্দ। সত্যই যেন 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'।

মৃদু মধুর সুরধ্বনি তোলে জলতরঙ্গ।

প্রশান্ত প্রকৃতি মনে শান্তির পরিতৃপ্তি আনে।

কিন্তু, পথের আহ্বান পথিক-চিত্তকে সজাগ করে তোলে। আবার পথ-চলা সুরু হয়।

মাঝে মাঝে জঙ্গল। মানুষ-উঁচু ঘাস, ছোট ছোট গাছ। লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলেছি। কখনও বা উন্মুক্ত বনপ্রান্তর। তারি বুকে আঁকা-বাঁকা পথরেখা।

হঠাৎ একজায়গায় পথ-চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে নেমে আসা প্রকাণ্ড একটা ধস পথের ক্ষীণ রেখাও গ্রাস করেছে। খাড়া পাহাড়ের গা সোজা নদীর কূলে নেমে গেছে। অগ্রসর হবার উপায় নেই।

পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে নদীর ধারে নামতে পারলে, জলের ধারে ধারে বালি ও পাথরের উপর দিয়ে চলা যাবে বটে, কিন্তু নামা তো এখানে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

রেঞ্জারবাবু বলেন, ভুলই হয়েছে। আর একটু আগে পথ ছেড়ে নদীর বুকে নামা উচিত ছিল, নামবার মতো পথও ছিল। সেইদিকে ফিরে যাওয়া যাক্।

অমরনাথ চাপরাসী ও কুলীদের বলে, আবার ফেরা কেন? দেখ না, এইখানেই কোথাও নামা সম্ভব কিনা।

আমরা অপেক্ষা করি। তারা গাছের ডালপাতার অন্তরালে অদৃশ্য হয়। কিছু পরে ফিরে এসে জানায়, নাঃ, নামার পথ নেই। সোজা পাহাড় ধসে গেছে—একেবারে গাছপালা সমেত। অবশ্য আমরা পাহাড়ী আদ্‌মীরা—কোন রকমে নেমে যেতে পারি, কিন্তু আপনারা পারবেন না।

পাহাড়ীরা যখন পথ খুঁজতে ব্যস্ত, তখন অমরনাথের সঙ্গে প্রায় ব্যবস্থাই করেছিলাম যে ফিরে গিয়ে সোজা পথে নদীতে নামা যাবে।

এখন, অক্ষমতার কটাক্ষপাতে তার আত্মসম্মান আহত হয়।

বলে, চলো দেখি—আমিও পারব,—এখানেই নামব।

আমি সাবধান করি, দরকার কি অযথা দুঃসাহস-প্রকাশে? চলো ঘুরেই যাওয়া যাক।

সে তখনি গম্ভীরভাবে আমাদের জানায়, আপনারা দাঁড়ান এখানে, আমি দেখছি। পাহাড়ীদের ধারণা আমরা বুঝি ভীরু।

তারপর, গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়। আমরা অপেক্ষা করি।

কিছু পরেই দূর থেকে ডাক শুনি, চলে আসুন—সাবধানে, কুলীদের হাত ধরে।

এলামও তাই। তাদের হাত ধরে, ভেঙে-পড়া গাছের ডালের উপর পা রেখে, আর একটা গাছের ডালে ঝুলে। কোথাও বা বসে বসে।

কেন জানি না, তবুও ভয় করেনি—উত্তেজনার মধ্যে আনন্দই পেয়েছিলাম। গাছের ডালের স্পর্শ তো নয়, যেন মনে হয় ধরিত্রীমাতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে নেমে এলাম।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, জন্মগত স্বভাব ভোলবার নয়!

সম্মুখে নদীর ওপারে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে

অমরনাথ বলে, ঐ পাহাড়টিরই অর্ধেক অংশ ভেঙে গিয়েছিল দেখা যাচ্ছে,—ওতেই বোধ করি গোণা-লেকের উৎপত্তি।

রেঞ্জারবাবু বললেন, ঠিক তাই। ঐটিই সেই পাহাড়। ওর পরেই গোণা-লেক।

প্রকাণ্ড ভগ্নাঙ্গ এক পাহাড়। এক অর্ধাংশ তার মাথা থেকে ভেঙে ধসে গেছে। মনে হয় যেন কোন্ এক দৈত্য বিরাটাকার একটা ফলের মাঝখান দিয়ে ছুরি দিয়ে আধখানা কেটে ফেলে দিয়েছে। এত বড় পাহাড়-ধসা হিমালয়েও ক্বচিৎ দেখা যায়।

প্রকৃতির চারিদিকের শ্যাম-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে ধ্বংসলীলার এ এক বিকট নিষ্ঠুর রূপ।

মনে পড়ে কয়েকবছর আগেকার একটি ঘটনা।

হাজারীবাগ-রাঁচির পথে রামগড়। তারি কিছুদূরে মোটরের বড় রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে। রাজরোপ্পা। দামোদরের তীরে ছিন্নমস্তার মন্দির। চারিদিকে ছোট-বড় পাথর। তারি মাঝ দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। বনের ধারে নদীর তীরে ছোট মন্দির। একে ছিন্নমস্তা, তায় জাগ্রতা দেবী। সবাই ভক্তি করে, ভয় করে। কিছুদূরে একটি গ্রাম। সেখান থেকে প্রতিদিন পূজারী এসে পূজা করে যায়। দিনের আলো হলে লোক আসে, সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। রাত্রিবাসের নিষেধ আছে। বলে, দেবীর মানা আছে।

মানা থাকার বিশেষ কারণও আছে। জীবন্ত প্রমাণের রূপ ধরে এক মানুষ-মূর্তি সুমুখে দাঁড়ায়।

কী বিকট বিকলাঙ্গ! মাথা থেকে মুখ-বুক শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে ভরা। মূর্তিময়ী বিভীষিকা!

বলে, ভালুকের অত্যাচার। নখ দিয়ে চিরে এমনি করেছে!

বিকৃত ক্ষত-ভঙ্গ অঙ্গ নিয়ে তবুও সে প্রাণে বেঁচে আছে।

এখানেও প্রকৃতির অঙ্গে আঁকা এক নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী।

কিছুদূর গিয়েই নদী ছেড়ে আবার পাহাড়ের গায়ে পথ। বড় বড় গাছ। ছায়াশীতল। পথের মাঝে পার্বত্য নির্ঝরিণী। তুষার শীতল ধারা। আবার জুতা-মোজা খুলে পার হতে হয়। আরও খানিক এগিয়ে বিরহী-নদীর পরপারে পথ চলে গেছে। পারাপারের সাময়িক ছোট পুল। পাইনগাছের গোটা দুই গুঁড়ি ফেলা। সাবধানে পার হই। বেশী বৃষ্টি হলেই নদীর স্রোত বাড়ে, পুলের কাঠের উপর দিয়েই তখন জল ছুটে চলে কল্‌কল্ স্বরে। ফেরার পথে তাই হয়েওছিল। জুতা-মোজা-সমেত তারি উপর দিয়ে চলে এসেছিলাম। খুলিনি। কারণ, সেদিন ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যেই সারা বেলা পথ চলতে হয়েছিল। জলে সমস্ত ভিজে জব্‌জবে হয়ে উঠেছিল। নতুন করে ভেজবার আর কিছু বাকি ছিল না। বর্ষার প্রচণ্ড প্রকোপে বর্ষাতির তলায় জামা-কাপড়ও সম্পূর্ণ ভিজে। যেন সদ্য স্নান সেরে উঠলাম। ভিজা জামা-কাপড়-জুতা-মোজায় পথ চলাতে নবীন আনন্দের আস্বাদ। চারিদিকে যেমন বর্ষা-প্লাবিত প্রকৃতি, হৃদয়াঞ্চলে তেমনি বর্ষণ-মুখর মন। মুখে চোখে বৃষ্টিধারার ছাট লাগে। চারিদিকে জলের স্রোত ছোটে। তারি মাঝে ছপ্‌ছপ্ করে পথ চলি। সাবধানে পা ফেলি। সতর্কগতি ক্রমে সাহস সঞ্চার করে। দেখি, জলের মধ্যেও পথ চলার ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। মনে গুঞ্জরণ ওঠে: 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—ময়ূরের মতো নাচে রে!'—হিমালয়ে বর্ষামঙ্গল।

আশ্চর্য লাগে এ সিক্ত-সজ্জায় পথ-চলায়। গায়ের ভেজা কাপড় গায়ে শুকায়। আবার পথে বৃষ্টি নামে—আবার ভেজায়, আবার শুকায়। দিনশেষে পথ-চলা সাঙ্গ হলে, জামা-কাপড় ছাড়ি। আশঙ্কা হয়, পরদিন এই বৃষ্টি-ভেজার অত্যাচারের দুর্ভোগ আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু, কোনো কিছুই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। পাহাড়-পথে অভ্যস্ত জীবন-ধারা বৃষ্টির লক্ষ-ধারাকে সানন্দেই গ্রহণ করে।

শিশিরবাবু বলেন, দেবতার কী মহিমা। কলকাতা হোলে সামান্য একটু জলে ভিজলেই অব্যর্থ ফ্লু! আর এখানে? জলে এতো ভিজি তবুও জ্বর নেই। এতো চলি, এতো খাই—মনে হয় পাথর পর্যন্ত হজম করতে পারি।
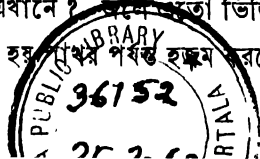
অনাচারে অত্যাচারে শুধু স্বাস্থ্য ভাঙেই না, অবস্থাবিশেষে স্বাস্থ্য গড়েও।

বিরহী নদী পার হয়েই বাঁ দিকে একটু উপরে ছোট একখানি গ্রাম। গোণা গ্রাম,—তা থেকে হ্রদের নামকরণ গোণা-তাল। হ্রদটি এখান থেকে আধ মাইলের উপর দূর। হ্রদের উপরে অপর পারে আর একটি গ্রাম আছে, নাম তার ডোর্‌মা। সে-গ্রামের অধিবাসীরা হ্রদের নাম দিয়েছে—ডোর্‌মা-তাল। বলে, গোণা-তাল নাম হবার কোনো কারণ নেই। ও গ্রাম তো জল থেকে অনেক দূরে, আমরা থাকি জলের কতো কাছে—এর ঠিক নাম আমাদের গ্রামের নামে।

দুই গ্রামে এই নাম নিয়ে বিরোধ।

আত্মপ্রাধান্য মানুষ-স্বভাব। হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলেও ঈর্ষার সে কীট সুযোগ বুঝে বাসা বাঁধে।

পাহাড়-ধসার সময় গোণা-গ্রাম বেঁচে গিয়েছিল। গ্রামের কিছুদূর দিয়ে পাহাড়ের ধস্ নামে। নদী পার হয়ে বাঁ দিকে গ্রামে যাবার পথ। আমাদের পথ গিয়েছে ডান দিকে হ্রদের অভিমুখে। পথের চারিপাশে পাহাড়-ধসার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। চতুর্দিকে ভাঙা পাথর, কাঁকর, বালি, মাটির বিরাট বিরাট স্তূপ। তারি মাঝে মাঝে পাথর-চাপা ঝরণার ক্ষীণ ধারাগুলি কোথাও বা আত্মপ্রকাশ করছে। সে-সব ধারার জলও ধ্বংসের মসী-মাখা। মলিন, কৃষ্ণাভ। কোথাও বা জলে গন্ধকের গন্ধ আনে। বাঁ দিকে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়। বিকৃত বিকট বিকলাঙ্গ। যেন অতিকায় এক দানবের বীভৎস কঙ্কাল।

কিন্তু, আশ্চর্য লাগে এই বিধ্বস্ত শ্মশানের মধ্যেও নবীন জীবনের স্ফুরণ দেখে। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। তবুও, সেই ঊষর ভূমি ভেদ করে নবীন তরুলতার সুশ্যাম সজীবতা।

বিরাট পাহাড় ধসে পড়ে, নির্মূল হয় বৃহৎ বনস্পতি। তারপর, একদিন আবার সেই ধ্বংসের মধ্যেও নবীন প্রাণের পুনঃ সঞ্চার হয়। হিমালয়ের পাথর ঠেলে নবজীবনের সবুজ পতাকা হাতে পাদপ-শিশু মাথা তোলে, নবীন প্রাণের আনন্দ আনে।

কালের বিচিত্র ধর্ম।

নিদারুণ শোকাতুর মানুষও একদিন তার সে-শোকের অসহ্য জ্বালা ভোলে। কালের কল্যাণময় কোমল প্রলেপ দগ্ধ-হৃদয়েও ভ্রান্তিময়ী শান্তি আনে। তাইতো, সংসারে মানুষ বাঁচে। এখানেও, ধ্বংসের মধ্যে প্রকৃতি আবার নবীন সাজে হাসে।

৬

অল্প গেলেই হ্রদের বিপুল বারিরাশি চোখে পড়ে। চারিদিকে ঘন-সবুজ বনময় গিরিশ্রেণী। তারি মাঝে সুনীল জলরাশির প্রশান্ত বিস্তৃতি।

পাহাড়ের কিছু উপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি। পথ নেমে জলের ধারে লুপ্ত হয়েছে। তারই অল্প দূরে ডান দিকে ধ্বংসস্তুপের বাঁধ ভেঙে জলধারা হ্রদ থেকে বেগে ছুটে চলেছে। নিম্নগামী ধারা পাষাণ-কারা ভেদ করে উন্মাদনায় উন্মত্ত। এই বিরহী-গঙ্গার ধারা ধরেই আজ সারাদিন এসেছি।

নদীর মুক্তিদ্বারের অল্প উপরে নূতন ধর্মশালা। বাসোপযোগী হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

অমরনাথ জানায়, ঐখানেই আমাদের রাত্রিবাস। দু'দিন এখানে আনন্দে কাটানো যাবে।

রেঞ্জারবাবু দূরে হ্রদের অপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ ওপারে বোট্-হাউস্। গত বর্ষায় হ্রদের জল ঢুকে ক্ষতি করেছে। ওখানে থাকা এখন চলবে না।

সাদা-ধব্‌ধবে ছোট্ট একটি বাড়ি। দূরে নীল-জলের ধারে সবুজ-পাহাড়ের গায়ে শ্বেতবিন্দুর মতো মনে হয়।

পথটুকু শেষ হবার আগে ধর্মশালার কাছে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র। সবুজ ঘাসের উপর হলুদ-রঙের বিচিত্র শোভা।

আশ্চর্য বোধ হয়। হঠাৎ এত ফুল ফুটল কোথা থেকে?

অমরনাথ বলে, দূর থেকে দেখে সব 'মেরিগোল্ড' মনে হয়।

নামতে নামতে দেখি, সত্যই তাই। আমাদের চিরপরিচিত গাঁদাফুল। হঠাৎ দেখে মনে হয়, কারা যেন জলের ধারে গেরুয়া-কাপড় বিছিয়ে রেখেছে।

গাঁদাফুলে সরস্বতীপূজার কথা স্মরণ করায়। প্রতিমার সামনে পুষ্পপাত্র-

ভরা গাঁদাফুল। অঞ্জলি ভরে অঞ্জলি দেওয়া—ছেলেবেলার ভয়-ভক্তি-মেশানো সে এক অপূর্ব অনুভূতি!

রেঞ্জার জানান, হ্রদের চারিদিকে অনেক জায়গায় ফুটেছে দেখবেন। এ-সব স্বামীজির হাতে-করা বাগিচা।

স্বামীজি! এখানে সাধু কেউ থাকেন নাকি?

শুনি, আজ বছর কয়েক হলো একজন এসেছেন। তাঁরই একার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা; নিজে থাকেন কিছুদূরে হ্রদের ধারে একটি গুহায়। স্থলপথে সেখানে যাবার পথ নেই। জলপথে নৌকায় যেতে হয়। বন-বিভাগের সরকারী নৌকা তো আছেই, স্বামীজির নিজেরও একটি আছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের নৌকা এপারে এনে রেখেছে তো?

একটি পাহাড়ী সেলাম ঠুকে সুমুখে দাঁড়ায়। মলিন বেশভূষা। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু, সবল স্বাস্থ্য, মুখে সরল হাসি। বলে, আমি চৌকিদারের ছেলে। বাবার বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নেই। তাই আমি এসেছি নৌকা নিয়ে। ধর্মশালায় থাকার সব ব্যবস্থা করেছি।

ধর্মশালা দোতলা বাড়ি। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি। একতলায় কুলী ও পিয়নরা উঠেছে। আমরা থাকব দোতলায়। উপরে ওঠবার সিঁড়ি নেই। ভবিষ্যতে হবার ব্যবস্থাও নেই। একটা মই লাগানো আছে। তাই দিয়ে উঠলাম। সিঁড়ি না করার হয়ত কারণও আছে। পাহাড়ে বাড়ী তৈরি হয় সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়। এখানেও তাই উঠেছে। সেইজন্যে পাহাড়ের গা থেকে সোজা বাড়ির উপরতলায় যাওয়া-আসা করা যায়। এখানেও বাড়ির পিছন দিকে একটা কাঠ ফেলে পাহাড়ের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, দোতলা হলেও সেখান থেকে এটা একতলা।

দোতলায় দুটি ঘর। তিনদিকে টানা বারান্দা। কাঠের রেলিঙ দেওয়া। সামনের বারান্দার নীচেই প্রাঙ্গণ। ফুলের রঙে রঙীন হয়ে আছে। মাঝখানে একটা শিমগাছ। শিম-এ ভরে আছে। আরও কিছু নীচে হ্রদ। ঘরের ভিতর বা বাইরের বারান্দায় বসে মনে হয় যেন স্টীমারে চলেছি। সামনেই প্রসারিত হ্রদের বিপুল বারিরাশি। হ্রদের অপরদিকে দূরে দেখা যায় একটি পার্বত্য নদী, হ্রদে এসে পড়েছে। এতোদুর থেকে জলের ধারা নজরে আসে না; বালি-মাটি-পাথরকুচির সাদা রঙ উজ্জ্বল দেখায়।

রেঞ্জার বলেন, ঐ বিরহী-নদী। অপর দিকে হ্রদে এসেছে, আর এইদিকে হ্রদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওপারে নদীর যে সাদা ধারা-পথ দেখা যায় তার অনেকখানি হ্রদের জলে আগে ঢাকা ছিল। হ্রদের জল ক্রমে ক্রমে নেমে আসছে।

শিশিরবাবু বলেন, তাহ'লে তো কিছুকাল পরে হ্রদের অস্তিত্ব যাবে, শুধু নদীর ধারাই থাকবে।

অমরনাথ জানায়, তাই হবারই হয়তো সম্ভাবনা, কিন্তু সে 'কিছুকাল' এখনও দীর্ঘকাল। এখনও হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল হবে, চওড়াও প্রায় সওয়া-মাইল। জলের গভীরতা এখনও অনেক। নৈনীতাল হ্রদের দ্বিগুণ আকার হবে।

বিরহী-নদীর উৎসমুখ চির-তুষার-প্রদেশে হিমপ্রবাহে। তুষার-মৌলী সেই গিরিশ্রেণী হ্রদের অপরপারে বহুদূরে দেখা যায়। নন্দাঘুণ্টি শিখর। বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করে। রাশি রাশি সাদা মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। যেন অলক্ষ্যে বসে কোন্ এক ধুনুরী সাদা তুলা পিঁজছে।

হ্রদের ডানদিকে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়। তারই বহু ঊর্ধ্বে একটি বড় গ্রাম আছে। নাম তার রাম্‌ণি। এখান থেকে দেখা যায় না।

বাঁ-দিকের উঁচু পাহাড়গুলির পিছনে 'কুয়ারী পাস'। তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট।

ঐসব পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি পথ আছে। পর্বত-চূড়া-আরোহণ-কারীদের অভিযান-পথ। ছাপার হরফে সে-সব পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়েছি। ছবিও দেখেছি। আজ মানস-পটে সেই অদৃশ্য-দৃশ্য কল্পনার রঙীন তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

৭

গোণা-তালের তীরে দু'দিন কাটল। নৌকা করে লেকে বেড়ালাম।

প্রথমদিনেই বোট্-হাউস্ দেখে এসেছি। কাঠের ছোট্ট বাড়ি। দু'খানি

মাত্র ঘর। হ্রদের উপকূলে। গত বর্ষায় হ্রদের জল একটু বেশী বেড়েছিল। তাই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করে সব ভাসিয়েও দিয়েছিল। কাঠের দেওয়ালের গায়ে, কাঠের মেঝেতে জলধারার নিষিদ্ধ-প্রবল-প্রবেশের অত্যাচার-কাহিনী এখনও আঁকা আছে।

অমরনাথ সব পরীক্ষা করে দেখে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। মন্তব্য করে, খুব বেশী ক্ষতি করেনি। কয়েক শ' টাকা খরচ করলেই সংস্কার হতে পারে। চায়ের সেট-এর পাত্রগুলি খুব বেঁচে গেছে।

তারপর চৌকিদারের ছেলেকে হুকুম দেয়, চায়ের কেট্‌লি, কাপ ডিশ নিয়ে চলো—আমাদের জন্যে। লিস্টে ঠিকমতো নোট করে রাখো,—আবার মিলিয়ে তুলে রাখবে।

সরকারী অফিসরের সতর্ক দৃষ্টি সজাগ আছে।

বোট্‌-হাউস্‌-এর কিছু উপরে ডোর্‌মা গ্রাম। ছোট গ্রাম। কয়েকখানি মাত্র ঘর। চৌকিদার ঐ গ্রামেরই লোক। নৌকায় বসে দাঁড় হাতে চৌকিদারের ছেলে গল্প করে, বাবা এখন আর বেশী কাজকর্ম করতে পারেন না। নৌকা বাইতেও সাহস পান না। আমার কিন্তু চালাতে খুব আনন্দ লাগে। কেমন দাঁড়ের সঙ্গে নৌকা চলে!

কথা বলতে বলতে দুই হাতের দুইটি দাঁড় ছপাৎ করে জলে ফেলে। জল ছিটকে ওঠে। ধীরে ধীরে হাত চালায়। জল কেটে নৌকা চলতে থাকে। শান্ত জলের উপর নৌকার গতিপথের বিচিত্র রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর জানায়, আমরা তো এই জলেই মানুষ। জন্মে অবধি এমন দেখছি। গ্রামের বৃদ্ধরা কিন্তু এ-জলকে ভয় করেন। গল্প শুনেছি, চোখের উপর তাঁরা দেখেছেন এই জল জমতে। ক'দিন ধরে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নেমেছিল। তারপর গভীর রাতে সে-নাকি এক অতি-বিরাট শব্দ করে পাহাড় ভেঙে পড়ে। সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেও ঘর ছেড়ে আতঙ্কে গ্রামের সব লোক বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীর প্রলয় এসেছে। সারারাত পাহাড়-ধসার ধ্বংসলীলা চলে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সব প্রকাশ পায়। তখনও সামনের ঐ পাহাড় ধসে-ধসে পড়ছে। তিনদিন ধরে এমনি করে পড়তে থাকে। প্রকাণ্ড বড় বড় পাথর সশব্দে এসে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে—নদীর এ-পারেও—কামানের গোলার মতো। যেমন তার প্রচণ্ড বেগ, তেমনি ভয়ঙ্কর গর্জন। চারিদিকে আবছায়া—ধূলার ধোঁয়া।

নদীর এ-পারের গাছপালা, মাঠ—সব ধুলায় মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেন ধূসর-বরফ-ঢাকা। পাহাড় থেকে চতুর্দিকে জলও নামছে। হ্রদের জল বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে সবাই পাহাড়ের আরও ওপরে বনের ভিতর আশ্রয় নিল। এমনিভাবে বছরখানেক কাটার পর হ্রদের বাঁধ ভাঙল। এখন এসব সুন্দর জায়গা,—আপনারা দেখতে আসেন; কিন্তু সে-সব দিনের গল্প বলতে বৃদ্ধদের এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকার উপর নিশ্চিন্ত আরামে বসে বিগত-কালের সেই ভয়াবহ কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। যেন, বই-এর পাতায় পড়া রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনা। অথচ, যা শুনছি তার মধ্যে এতোটুকু অতিরঞ্জন নেই। **Frank Smythe**-এর *Kamet Conquered* বইখানিতে এর সরকারী অনুরূপ বিবরণ পড়েছিলাম।

পাহাড়টির নাম মৈথানা। ১১,১০৯ ফিট উঁচু পাহাড়ের অংশ ধসে পড়ে। দুইবারে। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ কিউবিক ফিট পাথর ভেঙে পড়েছিল। নদীর গতিপথ রোধ করে ভেঙে-পড়া পাথর ও মাটিতে যে বাঁধের সৃষ্টি হলো, তারই উচ্চতা একহাজার ফিট! হিমালয়ের কোলে অবশ্য নবজাত শিশু-পাহাড়। তবুও, যেন হঠাৎ-বড়োর দম্ভে ভরা। উদ্ধত। কল্যাণী নির্ঝরিণীর সহজ গতিপথ অবরুদ্ধ করলে।

হ্রদের দীর্ঘতা হয়ে এলো তিন মাইল।

তারপর, জল জমে বাঁধ ছাপাবার উপক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ সময় মতো গ্রামে গ্রামে বন্যার সতর্ক-নির্দেশ পাঠালেন। অলকানন্দা ও ভাগীরথী গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম ও শহর-বাসীরা নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের বহু উপরে আশ্রয় নিলো। বাঁধ থেকে ১৪০ মাইল দূরে হরিদ্বার। সেখানেও সাবধান-রব উঠল।

১৮৯৪ সালের ২৫শে আগষ্ট। রাত্রি ১১টা ৩০। বাঁধ ছাপিয়ে—ভেঙে—জল ছুটল। ঘণ্টায় বিশ থেকে ত্রিশ মাইল গতিবেগ। বাঁধের মুখে গভীরতা হলো ২৮০ ফিট। প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অলকানন্দার উপর চামোলী সহর। তার মাইল দশেক আগে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। বন্যার জলভারে অলকানন্দাতেও স্ফীতি আনলো। চামোলীতে নদীর গভীরতা হলো ১৬০ ফিট!

তারপর, দুইদিনেই হ্রদের জল ৩৯০ ফিট নেমে গেল, এবং পরে দেখা গেল বিরহী-নদীর তলভূমি বন্যায়-বয়ে-আনা প্রকাণ্ড পাথর ও মাটির প্রলেপে ৫০ ফিট উঁচু হয়ে গেছে।

১৯৩১ সালে হ্রদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩,৯০০ গজ, প্রস্থ ৪০০ গজ, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফিট।

এই প্রবল বন্যায় মানুষের অসামান্য ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয়েছিল সামান্যই। সময়মতো সতর্ক-সংবাদে সকলেই সাবধান হয়েছিল। হয়নি শুধু একটি লোক। সে সপরিবার বাঁধের নীচেই বাসা বেঁধেছিল। বহু সতর্কবাণী সত্ত্বেও। বাঁধ-ভাঙার উপক্রম হলে তাদের জোর করে দুইবার সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। তবুও, তারা সেখানেই ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকে। কোনরকমেই আর সরানো যায়নি। বন্যার সেই ভয়ঙ্করী ভৈরবী-মূর্তির কাছে শুধু এরাই আত্মাহুতি দেয়।

চৌকিদারের ছেলে গল্প করছিল,—শুনেছি, লোকে তার নাম দিয়েছিল গোপা ফকির। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতো। বলতো, ভগবান—রাখবার, মারবারও তিনি। যদি জান্ নেবার মর্জি থাকে, তিনি নেবেনই, আমি পালিয়ে বাঁচবো কোথায়! যাবোই বা কেন?—কোন্ এক রাজার গল্প শুনিয়ে বলতো, অতোবড় রাজা, সব ব্যবস্থা করেও সাপের কামড়ে মরার ভাগ্য-লিখন কাটাতে পারেননি। আমি তো অতি সামান্য মানুষ, প্রাণ বাঁচাতে পালাবো কোথায়? শেষ পর্যন্ত নড়েওনি। বন্যা শুরু হোলে তাদের আর চিহ্নও পাওয়া যায়নি। লোকে বলে, মস্ত ভক্ত ছিল। আমি বলি, আস্ত পাগল!

নির্বাক হয়ে তার গল্প শুনি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘ জমে আসে। মেঘের জটাজালে সূর্যকিরণ বন্দী হয়। আলোছায়ার খেলা চলে। দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। সুমুখেই রামধনুর রঙীন রেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আকাশের বুকে নয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে। অদূরে হ্রদের জলের ভিতর সে-রঙীন-রেখার একপ্রান্ত বিলীন হয়।

৮

নৌকা করে চলেছি সাধুর গুহায়।

আগেই শুনেছি, তিনি এখন এখানে নেই।

তাঁর পূর্বাশ্রম আলমোড়া অঞ্চলে। পাহাড়ের অধিবাসী। শিক্ষিতও। আজ বছর পাঁচ-ছয় হলো এখানে এসেছেন। গুহার ভিতরে একা থাকেন।

সাধন-ভজন করেন। গ্রামবাসীরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তাদের সামান্য আহার্যের নৈবেদ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

কুতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এখন তিনি কোথায়? পাহাড়ের উপরে আরও একান্তে নিভৃতে কোথাও আছেন নাকি?

চৌকিদারের ছেলে উত্তর দেয়, না,—ওদিকে নয়। নীচে গেছেন। আজ মাসকয়েক হলো। এবার ফেরবার সময় হয়েছে।

নীচে—অর্থাৎ পাহাড় ছেড়ে হরিদ্বার, দিল্লী প্রভৃতি সহর অভিমুখে।

সহরে যাওয়ার কারণও শুনি। অর্থের অভাবে ধর্মশালার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তাই সঙ্গতির সন্ধানে সহরে যাওয়া।

বিচিত্র জগৎ।

সহর থেকে মানুষ আসে হিমালয়ে শান্তির আশায়, সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানে।

আবার, সত্য-সন্ধানী সাধু সাধনা ফেলে হিমালয় ছেড়ে সহরে ছোটেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে! আত্মসুখের লোভে নয়, সহরবাসী যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনের প্রয়োজনে!

অমরনাথ বলে, সাধুর আশ্চর্য ক্ষমতা। একার চেষ্টায় এখানে এমন ধর্মশালা তৈরি করা সহজ কথা নয়। ধর্মশালার বাকি অংশও হয়তো তিনি শেষ করাতে পারেন। কিন্তু, সমস্যা হয়েছে—দৈনিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে তিনি ফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্ট-এ জানিয়েছেন, তারা যদি এটা নিয়ে চালাতে চায়, তিনি দিতে রাজী আছেন। এই নিয়ে কথাবার্তাও চলছে। গভর্ণমেণ্ট থেকে নেবার প্রধান কারণ হলো, তারাও এখানে একটা নতুন বাংলো করতে চায়। ওপারে বোট্-হাউস্-এর কাছে জমিও ঠিক করা আছে।

শিশিরবাবু বলেন, কিন্তু সারা হ্রদের চারিদিকের মধ্যে এই ধর্মশালার জমিটি সবচেয়ে ভালো জায়গায়। উঁচু জমি। সামনেই হ্রদ। ওপারে আকাশ-ছোঁয়া বরফের পাহাড়। অপরূপ দৃশ্য ধর্মশালা থেকে। বোট্-হাউস্ থেকে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

অমরনাথ স্বীকার করে। বলে, তাইতো এটা নিয়ে নেবার আমার এতো উৎসাহ।

আমি বলি, তোমাদের নেওয়া-না-নেওয়ায় আমার উৎসাহ নেই। আমি

আশ্চর্য হই, সাধুটির সৌন্দর্য-দৃষ্টি দেখে। হ্রদের চতুর্দিকের মধ্যে সবচেয়ে রমণীয় স্থানটি ঠিক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রূপদ্রষ্টার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

গুহার কাছে নৌকা থামে। পাহাড়ের গায়ে জলের ঠিক উপরেই ছোট গুহা। কাঠের ফ্রেমে ছোট দরজা। হ্রদের দিকে—কাঠের একটি ছোট জানালাও আছে। জলে নৌকা বাঁধা। তাঁর আসা-যাওয়ার নৌ-যান।

অমরনাথ বলে, নেমে দেখবেন চলুন। সব খোলাই তো রয়েছে।

সাধুর অনুপস্থিতিতে নামতে অসম্মত হই। নৌকা থেকে বসেই দেখতে পাই তাঁর সামান্য মালপত্র। উঁচু করে সাজিয়ে রাখা। সবার উপরে একটি প্রাইমাস-ষ্টোভ। তার নীচেই একটি তব্‌লা।

অনুসন্ধানে জানলাম, সাধুজি সঙ্গীতজ্ঞ। সুমধুর ভজন করেন। গ্রামের লোকেরা প্রায়ই শুনতে আসে। শুনে যথার্থ আনন্দ পায়। গ্রামে বসেও নিস্তব্ধ নিশীথে তাঁর সুরের অস্ফুট-ধ্বনি শোনা যায়।

মৌন অচল হিমাচলে শব্দময় সঙ্গীত-স্পন্দন। যেন, হ্রদের ঐ শান্ত স্তব্ধ জলে মৃদু-সমীরণে ঈষৎ ঢেউ-এর খেলা।

স্বামীজির দর্শন পেলাম না। কিন্তু, মানুষটির প্রকৃত পরিচয় অন্তরে অনুভব করি। পান্থশালার পরিমিত পারিপাট্য, হ্রদের ধারে ধারে গাঁদাফুলের স্নিগ্ধ শোভা, নিভৃত গুহায় স্তব্ধ বাদ্যের নির্বাক্ ধ্বনি—অ-দৃষ্ট মানুষটিকে যেন অতি নিকটে এনে দিল। সৌন্দর্যের সাধনাও শিব-সুন্দরেরই আরাধনা।

কলকাতা-সহরের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

শীতকাল। সহরের এক অঞ্চলে সঙ্গীতের এক বড় জলসা চলেছে। বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন। মার্গ-সঙ্গীতের পরিবেশে আসর জমেছে। এক বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ যন্ত্র-সঙ্গীত আলাপ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। এমনি সময়ে গেরুয়াধারী এক সাধু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উঠে এসে কর্তৃপক্ষদের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, তিনিও কিছু যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ করতে চান। উদ্যোক্তারা আশ্চর্য হলেন। গুণীজনের এই আসরে একজন অখ্যাত অজানা ব্যক্তির এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য। বিনীতভাবে জানালেন, আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চলছে; এর মধ্যে বাইরের কারো কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সাধুজির তবুও বিশেষ আগ্রহ। অবশেষে, শ্রোতাদের অনুমতি নিয়ে অল্প সময়ের জন্য তাঁকে বাজাতে দেওয়া হলো। তাঁকে জানানো হলো, এর বেশী সময় যেন তিনি কোনক্রমেই না নেন! তিনি বাজালেনও সেই স্বল্পসময়ের জন্য। শ্রোতাগণ স্তম্ভিত। কী গভীর জ্ঞান! কী সুমিষ্ট ধ্বনি! কী সুনিপুণ হাতের খেলা! তাঁরা আরও শুনতে চান। সাধুটি বলেন, আজ আর নয়। যদি অনুমতি পাই, কাল আমার নিজের যন্ত্র নিয়ে এসে কিছু শোনাবো।

পরের দিন সেইমতো ব্যবস্থাও হয়। সকলেই প্রকৃত গুণীর অসাধারণ গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ হন। শ্রোতাদের উৎসাহ বাড়ে। অনুরোধ করে, তার পরের দিনের আসরেও যোগ দেবার জন্যে। কর্তৃপক্ষরাও পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু, সাধুজি কোনমতেই সম্মত নন। শেষ পর্যন্ত হলেনও না। বলেন, যাচ্ছিলাম গঙ্গাসাগরে। স্টীমার ছাড়ার দু'দিন আগে এ-সহরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আপনাদের জলসার খবর পেলাম। তাই, শুনতে এসেছিলাম। শুনে আনন্দও পেলাম। কাল স্টীমার ছাড়বে। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। আর থাকবার প্রশ্ন ওঠে না।

তাঁর সঙ্গীতের উচ্চ প্রশংসা শুনে বিনীতভাবে বলেন, ও কিছুই নয়। অতি সামান্যই জানি। জানতেন বটে আমার গুরুদেব! অমন বাজনা কখনও শুনিনি, কণ্ঠ-সঙ্গীতও নয়।—বলে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।

কর্তৃপক্ষরা সঙ্কোচভরে বলেন, আমাদের আসরে যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের কিছু প্রাপ্য হয়; আমাদের প্রণামীটা যদি—

তিনি বাধা দিয়ে বলেন, মন ভরে আমি আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি, তার চেয়ে বেশী আর কোনও প্রাপ্য নেই। প্রয়োজনও নেই।

উদ্যোক্তারা জানান, আবার যদি কখনো এ-পথে আসেন ও আমাদের ভাগ্যে থাকে—আবার শোনার আগ্রহ রইল।

সাধুটি হাসতে থাকেন। স্নিগ্ধ হাসি। সঙ্গীতের মতোই মধুর।

তপস্যার ক্ষেত্র থেকে বয়ে-আনা আনন্দের ফসল। স্বর্ণপ্রভ। দিব্যগন্ধি।

বদরীনাথের এক সাধুর কথাও মনে হয়।

প্রতিবছর বৈশাখ মাসে মন্দির-খোলার সময় আসেন। আবার কার্তিক মাসে দীপাবলির সময় মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে যান। মন্দির কমিটির উদ্যোগে তাঁর এখানে আসা ও থাকা। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে

মন্দিরে কয়মাস অখণ্ড কীর্তন চলতে থাকে। মন্দির-তোরণের উপরের একটি ঘরে দিবারাত্র এই নাম-ধ্বনি চলে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি লম্বা বারান্দা। হল্-ঘরের মতন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সাধুজি সেখানে নিজে কীর্তন করেন। সঙ্গে তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ থাকেন। যাত্রীরা বসে নাম-সুধা পান করেন, কীর্তনেও যোগ দেন। একপাশে একটি অল্প-উঁচু বেদীর উপর সাধুজি বসেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। শ্মশ্রুগুম্ফজটাভারে গম্ভীর-দর্শন। অথচ, আয়ত নয়নে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি। মুখে সুমিষ্ট হাস্য। জরি-দেওয়া সিল্ক-এর অঙ্গাবরণ। বোধ করি, মন্দির থেকে বিশেষ ব্যবস্থা-করে-দেওয়া সাজসজ্জা। দেখেই বুঝি, ওটা ওঁর অঙ্গের ভূষণ নয়, প্রয়োজনও নয়। কেননা, আসন নিয়েই বেশভূষা খুলে ফেলেন। নগ্নদেহে বসেন। প্রকাণ্ড বীণটি হাতে তুলে নেন। কখনও বা কোলে রাখেন। সুদীর্ঘ অঙ্গুলিগুলি শিল্পীর লক্ষণ জানায়। ধরা দেখেই বোঝা যায় কত প্রিয়, কত সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন। তারপর, ধীরে ধীরে স্বর ফোটে, সুর ওঠে। গম্ভীর। মধুর। ভাবাপ্লুত। ভক্তিদীপ্ত। মনে হয়, দেবতার পার্থিব মন্দিরের মধ্যে সুরের অপার্থিব পরিবেশ। মন-প্রাণ স্নিগ্ধ-দিব্য-ভাবে রোমাঞ্চ বোধ করে।

সাধুজির সঙ্গে বাইরেও দেখা হয়। সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ করি। স্মিত-বদনে তাকান। তার বেশী আলাপ হয় না। মৌনী তিনি। মৌনী,—অথচ ভগবদ্‌কীর্তনকারী। শুধু, দেবতার নাম-কীর্তনেই ধ্বনির উচ্চারণ। শুনি, এককালে ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এখন, সুরসাধনায় কেবল দেব-আরাধনা।

ভাবি, সত্যই, শিবের নামও তো—বীণাধর, সামপ্রিয়, স্বরময়!

৯

ধর্মশালায় বসেও সময় কেটে যায় অলস-মন্থর গতিতে।

বোট্-হাউস্-এর জন্যে রাখা মন্তব্য-পুস্তিকাটি পড়ি। বহু বছরের বহু লেখা। অধিকাংশই সাহেবদের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ মাছ-ধরার। কী আকারের কতোগুলি মাছ। কত তার ওজন। হ্রদের কোন্‌দিকে ধরা। কিসে ধরা। কী চারা। কবে কোন্

দিনের কোন্ সময়ে। আকাশের কী অবস্থা। বাতাসের কী গতি। জলের কী রঙ। সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা। যেমন মৎস্যশিকারে আনন্দ, তেমনি অকপট ফলাফল স্বীকারেও আগ্রহ। কোথাও সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা বিফলতার করুণ হুতাশ।

পড়তে বেশ লাগে। লেখার মধ্যে শুধু মাছ ধরাই নয়, লেখকের চরিত্র-চিত্রও ধরা পড়ে।

চারিদিকে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির অপরূপ রূপলীলা দেখেও সময় কাটে। দোতলার বারান্দায় বসে উপভোগ করি।

ঘরের ভিতর থেকে অমরনাথ ডাক দেয়, বলে, শুধু সৌন্দর্যই পান করছেন, আসুন, চাও একটু পান করবেন।

বলি, বাইরেই পাঠিয়ে দাও এখানে।

সে রাজী হয় না। তাই, ঘরের ভিতরেই যাই। দেখি, ঘরের মেঝেতে তার প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটির উপর রঙীন টেব্‌ল্‌ক্লথ পেতেছে। তার উপর চায়ের কাপ ডিশ-এর সুন্দর রঙীন সেট সাজানো। মাঝখানে একটা গ্লাসের মধ্যে ফুল সাজিয়ে ফুলদানি হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বলে, দেখুন, কেমন চায়ের টেবিল সাজিয়েছি। ক'চামচে চিনি দেবো বলুন।

সাজ-সজ্জা আয়োজনের প্রশংসা করি। হেসে বলি, সবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু, তোমার গৃহলক্ষ্মীটি কই ?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সে-কথাই যখন তুললেন তখন শুনুন তার কাহিনী। সে-বছর তখনও ট্রেনিং-এ আছি। ট্রেনিং শেষ হলেই চাকরি সুরু হবে। তখনও কয়েকমাস বাকি। ক্যাম্পে আছি। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে খবর পেলাম—আমার নাকি বিয়ের ঠিক করছেন। ছুটি নিয়ে যেন বাড়ি চলে আসি। তখনি তাঁকে লিখে জানালাম, ট্রেনিং-এর সময় বিবাহ করার এখানে নিয়ম নেই। তাই ছুটির অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়। লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ক'দিন পরে হঠাৎ আমাদের অফিসর আমাকে ডেকে পাঠালেন। খুব কড়া লোক। আইন-কানুন সব সময়ে মেনে চলেন। ভাবলাম, কোথাও কিছু দোষ করেছি নাকি। ভয়ে-ভয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। যেতেই বললেন, তোমার এক সপ্তাহের ছুটি। কালই তুমি বাড়ি যাবে। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফিরবেও। যেন, কোনও কারণে কামাই না হয়।

অবাক্ হয়ে বললাম, আমি তো ছুটি চাইনি।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি চাওনি, কিন্তু, তোমার বাবা চেয়েছেন। ছুটি মঞ্জুরও করেছি।

আমি সঙ্কোচভরে বললাম, কিন্তু ছুটির কারণটা—

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি কারণ জানতে চাই না। তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই করো। বাবার কথা শুনবে। কালই রওনা হবে। গুড্‌লাক্, ইয়ংম্যান!—বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। আমার কিন্তু মনে হলো, তাঁর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা। নির্বাক্ হয়ে চলে এলাম। বাড়িও গেলাম। বিবাহও করলাম। ফিরে এসে ট্রেনিং শেষ হবার পরই চাকরি স্থুরু হলো। গত দেড় বছরের মধ্যে মাত্র তিন দিনের ছুটি পেয়ে একবার বাড়িও গিয়েছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল সেই বিয়ের পর একবার। সে আছে মথুরায়। বি,এ পরীক্ষা দেবে। ইচ্ছা আছে, এবার একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবো। তাকে নিয়ে একবার কলকাতাও যেতে পারি। গেলে অবশ্য আপনাকে জানাতে ভুলবো না।— আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন? আমি তা বলে তার কথা বেশী ভাবি না। ভাববোই বা কখন? সব সময়েই তো কাজ করছি।

তারপর অতি ধীরে ধীরে বলে, তবে সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যার পর অন্ধকারটা ভারী হয়ে ওঠে!

আমি বলি, চলো, বাইরে বারান্দায়। চা-টা ওখানে জমবে আরও ভালো। দেখছ না, জ্যোৎস্না উঠেছে কিরকম?

বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে বসি। কাঠের দেওয়ালে ঠেসান দিয়েছি। পা-দু'খানি সোজা করে আরামে ছড়িয়েছি। নির্বাক্ হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকি। চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। একটু আগেই হ্রদের নীল জলে সন্ধ্যার ঘন-কালো ছায়া নেমেছিল। দূরে গগনস্পর্শী পাহাড়গুলি অন্ধকারের অন্তরালে বিরাট আকার দৈত্যের রূপ ধরেছিল। এখন জ্যোৎস্নার স্বর্ণময় স্পর্শে সেই ঘনীভূত আঁধার তরল হয়েছে। সুদূর আকাশ-পটে এখন তুষার-শিখর স্নিগ্ধোজ্জ্বল। স্বর্ণকান্তি তার রূপ। হ্রদের জলেও জ্যোৎস্নার রূপচ্ছটা। তরঙ্গ-জালে যেন আকাশের এক চন্দ্র সহস্রখণ্ডে খণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে।

প্রকৃতির এই প্রশান্ত স্নিগ্ধ শোভা অন্তরে অপার আনন্দ আনে। হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত, জ্যোতির্ময়।

হঠাৎ দেখি, হ্রদের জলে সচল যান। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

অমরনাথ জানায়, চৌকিদারের ছেলে নৌকা আনছে। তাকে বলেছিলাম, চাঁদ উঠলে আসতে। জ্যোৎস্নায় নৌ-বিহার হবে। চলুন, যাওয়া যাক্।

আমি যেতে অসম্মত হই।

সে একাই যায়।

হ্রদের জলে তরী তার ধীরে ধীরে বয়ে চলে। জ্যোৎস্নার আলোকেও তরণীর কালো-রূপ। দূরে সেই কালো-ছায়া ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে মিলিয়ে যায়। বিরহী-হৃদয় বিরহী-হ্রদে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় সানন্দ সান্ত্বনা খোঁজে।

যুগ-যুগান্তের বিরহ-কাতর শঙ্করের তপস্যার হোমানলে ক্ষুদ্র মানব স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।

আমার দৃষ্টি, কিন্তু, হ্রদের সসীম সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। জলের উপর দিয়ে আমার মন ভেসে চলে। চারু চন্দ্রিমার স্বর্ণময় সোপান বেয়ে স্বপ্নলোকে উঠতে থাকে। দূর-দূরান্তের মসীমাখা আঁকা-বাঁকা গিরিশিখরের পথে পথে ঘুরতে থাকে।

মনে পড়ে, ঐ পথ দিয়ে ঘুরে গিয়ে নামা যায় ফুলময় উপত্যকায়। তারও উপরে লোকপালে। হেমকুণ্ডে। এইতো ক'দিন মাত্র আগে সেখানে ছিলাম।

হিমগিরির দুর্গম গোপন-পুরে। সুরলোকের সন্ধানে।

লোকপাল-নন্দনকানন

জনসমাগমে রমণীয় স্থানও শ্রী হারায়। পিপুলকোটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

রেল-পথ থেকে ১৩০ মাইল দূরে। হিমালয়ের অন্দরে, নিভৃত অঞ্চলে। চারিদিকে বিরাট পাহাড়; তারই কোলে, অলকানন্দা থেকে হাজারখানেক ফিট উপরে স্নিগ্ধ-শীতল পার্বত্য আবহাওয়ার আমেজে তন্দ্রালস গ্রামখানি শান্ত ছিল। হঠাৎ বাস্ চলাচলে সজাগ, চঞ্চল হয়ে উঠল। এখন ছোটখাটো শহর। পাথরে-বাঁধানো পথের দুইদিকে বাড়ির ভিড়। সারি সারি দোকান-পাট। জামাকাপড়ের, মনিহারির, মুদির, খাবারের দোকান,—সরাইখানা, চায়ের স্টল—সব কিছুই আছে। পাহাড়ী স্থানীয় জিনিস-পত্রও বিক্রী হয়—হরিণের ছাল, বাঘ-ভালুকের চামড়া, চামর, কস্তুরী, শিলাজিৎ। শিলাজিৎ কালো তরল পদার্থ। শুদ্ধ ভাষায় শিলাজতু। বহু উঁচু পাহাড়ের উপর কালো পাথরের অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হয়। অতি-ঘোর কালিবর্ণ। পাহাড়ীরা বলে, পর্বতের স্বেদ। বহুগুণবিশিষ্ট। শুনি, সব অসুখেরই প্রতিষেধক। সর্ব-রোগ-নিরাময়ের কল্পতরু।

গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি।

বদরীনাথের যাত্রীপূর্ণ বাস্‌গুলি এসে এইখানে যাত্রীদের উজাড় করে হাঁফ ছাড়ে। বাস্ ঘিরে লোক দাঁড়ায়। কুলীর দল আসে, ডাণ্ডী-কাণ্ডী-বাহকরা আসে, ঘোড়াওয়ালাও আছে। এবার বাস্ ছেড়ে হাঁটা পথ,—৩১ মাইল দূর বদরীনাথ। সবাই ডাকে, চল, আমি নিয়ে যাব।

অধিকাংশই কেদার-ফেরৎ যাত্রী। এখন বদরীনাথ দর্শনে চলেছে। সাধারণতঃ দুইযাত্রার একই কুলী, তাই সঙ্গে থাকে। অনেকের সঙ্গে আবার পাণ্ডার লোকও আছে।

এদিকে বদরীনাথ-তীর্থ সাঙ্গ করে যাত্রীর দলও এখানে ফিরেছে। এবার ফিরতি-বাস্-এর টিকিট পেলেই সোজা হৃষীকেশ। তীর্থ-শেষের আনন্দ, গৃহে ফেরার আকুল আগ্রহ। কিন্তু, টিকিটের আশায় অপেক্ষা করতে হয়। দু'দিন, তিন দিন। কখনও বা তারও বেশী।

দুই দিকের যাত্রীর স্রোতে ছোট শহর প্লাবিত হয়। রাত্রি-বাসের স্থান পাওয়াই কঠিন। ধর্মশালা কানায় কানায় ছেপে ওঠে। দোকান ও চটীগুলিও ভরে যায়।

সে-বছর পরিচিত একটি দোকানদারের ঘরের সামনে পথের এক পাশে চেয়ার নিয়ে বসে ছিলাম। যাত্রীদের দুর্গতি দেখে দুঃখ হয়।

দেখছিলাম, স্থানীয় দোকানদারদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে কি আশ্চর্য-রকম! এই তো সে-বছরেও দেখেছি, যাত্রীদের তারা সর্বত্র সাদরে ডেকে নিত, যেমন করে হোক্ আশ্রয় দিত। আহারের সামগ্রী বিক্রী করে যে সামান্য পয়সা পেত, তাতেই পরিতুষ্ট। চটীতে থাকার জন্যে কোথাও ভাড়া দিতে হত না। দেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে সেবা করা,—সে তো ভাগ্যবানের পুণ্যলাভ!

এখন বাস্ চলাচলের ফলে সে-বিশ্বাস যেতে বসেছে। অনেক জায়গায় নতুন আবহাওয়া এসেছে। স্থানাভাবে বিপন্ন যাত্রীদল আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরে। কোন রকমে মাথা গোঁজার স্থানটুকু পেলেই হয়। সবাই ক্লান্ত, পথ-শ্রমে শ্রান্ত। দোকানদাররা প্রয়োজনের তাগিদ বোঝে। দাম হাঁকে,—একটা ঘর—শুধু এক রাত্রির জন্যে পাঁচ টাকা, দশ টাকা! কোথাও বা কুড়ি টাকাও চায়। নিরাশ্রয় যাত্রীরা দিতে বাধ্যও হয়। যারা পারে না, অন্যত্র আশ্রয়ও পায় না, পথের বুকে ধূলিশয্যায় শয়ন করে। ঘর-ভাড়ার বিরুদ্ধে আপত্তি বা প্রতিবাদের মূল্য কোথায়? ঘর তাদের, প্রয়োজন পথিকের। প্রয়োজন না থাকে, নিও না। বেশী ভাড়া—? দিতে না পারো, দিও না, অন্যত্র দেখ। সোজা কথা। বলে, ব্যবসার ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার কিসের? ওটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়!

কথা শুনে মনে পড়ে, ঠিক এমনি কথাই শহরের ব্যবসায়ীদের মুখে শুনেছি বটে!

'ব্ল্যাক্ মার্কেট' তার কালিমা নিয়েও কেমন চালু হয়ে যায়। শহরে কারও কাছে দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখে যখন কৌতূহলী প্রশ্ন করা যায়, আরে এ পেলেন কোথায়? তখনই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনি, কেন? 'ব্ল্যাকে'!

পিপুলকোটি আমার ভাল লাগে না। এখানে রাত্রিবাসও করতে চাই না। চার মাইল দূরে সোজা পথে গরুড়গঙ্গা। সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে যাই। আবার যখন রাত্রিবাস করতে বাধ্য হই, তখন বাধ্য হয়েই শহরের এই তপ্ত আবহাওয়া সহ্যও করি।

সে-বছর রাত্রে থাকতেই হল। অনুসন্ধানে জানলাম, ডাকবাংলো খালি

রয়েছে। অনুমতি নিয়ে সেখানে উঠলাম। মোটর স্ট্যাণ্ডের বেশ খানিকটা উপরে। শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে। পাথরের সুন্দর বাড়ি। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র। নেয়ারের খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা। এমন কি, আর্শিও। জানালায়, দরজায় তারের জাল-লাগানো— মাছি, মশা, পোকার গতি-রোধের জন্যে। স্নান-ঘরে জলের কল, স্যানিটারি ব্যবস্থাও। সব কিছু দেখে মন প্রফুল্ল হয়। সাবান দিয়ে ভাল করে মুখ হাত ধুই, স্নান করি। কয়দিনের ধূলি-মলিন বেশ-ভূষা ছেড়ে ফর্সা কাপড় পরি। তার পর, একখানা চাদর গায়ে বাইরে বারান্দায় ইজি চেয়ার টেনে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসি। পাশে টেবিলে গরম চায়ের কাপ। সামনে প্রাঙ্গণে একটি খোবানি গাছ। ছোট ছোট ফল ধরেছে। তার পিছনেই পাহাড়ের ঢালু-গায়ে ধাপে ধাপে শস্য-শ্যামল ক্ষেত। দু-তিনটি পাহাড়ী মেয়ে সেখানে কি কাজ করছে। তারও নীচে সোজা বাঁধানো যাত্রা-পথ, যেন সবুজ-শাড়ির ধূসর পাড়। কয়েকটি যাত্রী চলেছে ধীর পদক্ষেপে। দূরে—নদীর পরপারে স্তরে স্তরে পাহাড়ের শ্রেণী। স্নিগ্ধ নীলাভ। দুটো চিল উড়ছে বহু উপরে নীল আকাশের গায়ে।

একা বসে তাকিয়ে থাকি। নীচে শহরের কোলাহলের অস্ফুট গুঞ্জন কানে আসে। মনে হয়, শহরের কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করে চলে এসেছি। এখন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

আবার, হাসিও পায়,—শহর-বাসের সুখ-সুবিধায় পরিপুষ্ট এই মন। হঠাৎ এই সুন্দর-গৃহে সভ্য-জগতের পারিপাট্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদন পেয়ে কেমন পুলকিত হয়ে ওঠে। মানসিক তৃপ্তির এ-ও এক রূপ। বিচিত্র!

চমকে উঠি। গাছের ছায়ায় কে যেন আসে! ধীরে এসে দাঁড়ায়। যুক্ত করে অভিবাদন করে। দেখেই চিনতে পারি।

—আরে! শের সিং যে! কোথা থেকে এলে?

তিন বছর আগেকার কথা। শের সিং গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে মাল নিয়ে গোমুখে। তার পর আরও কয়েক জায়গায়।

হাসিমুখে বলে, বাজারে হঠাৎ আপনাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তার পর কুশল প্রশ্ন করে, সেবারকার সব সঙ্গীদের খবর নেয়। যেন, কত আপনার জন।

জিজ্ঞাসা করি, এবার যাত্রায় যাও নি?

বলে, হাঁ গিয়েছি বই কি। এই দুবার ঘুরে এলাম। আবার কাল সকালে একটা নতুন দলের সঙ্গে চলেছি।

আমার সব ব্যবস্থা হয়েছে কিনা খোঁজ নেয়। পুরানো দিনের গল্প করে,—গোমুখের দুর্গম পথহীন পথ, মদ্‌মহেশ্বরের দুরারোহ চড়াই, বাসুকী-তালের যাত্রা-পথে বরফের উপর দুর্গতি। আরো কত কি! বলে, সে-সব পথের কথা প্রায়ই মনে হয়। শুধু কেদার-বদরী যাওয়া—এ আর কী!

চোখের উপর সে-সব দিনের ছবি ভেসে ওঠে। বলি, হাঁ, আমরাও সে-সব গল্প করি প্রায়ই। তোমাদের কত কষ্টই না হয়েছিল!

আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। বলে, কষ্ট? আমরা তো খুবই আনন্দেই গিয়েছিলাম। আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, তাই তো আমাদের ওসব দুর্গমতীর্থ দর্শন হল, নইলে কি আর এমনি হত। প্রতিবছর আমি খোঁজ নিই, আপনি এলেন কিনা। কিন্তু, কোন বারেই ধরতে পারি না। চলে গেলে খবর পাই—এসেছিলেন, ফিরে গেছেন। এবার দেখা হল—তবু সঙ্গে যাওয়া হল কই?—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, কি কাজ করতে পারি এখন বলুন?

বলি, কিছুই করবার নেই। বসো। গল্প কর।

কিছু করার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত হয়। দেখে বলি, আচ্ছা, এক কাজ কর। শার্টটা ওখানে শুকোচ্ছে, সাবান নিয়ে একটু কেচে দাও।

যেন স্বর্গের চাঁদ পায়। হাসি মুখে উঠে পড়ে। কেচে নিয়ে এসে যত্ন ভরে টাঙিয়ে দেয়।

ফিরে এলে খাবার বার করে খেতে দিই। চা গরম করি। তাকে দিই। নিজেও খাই। তৃপ্তির সঙ্গে। সুখ-দুঃখের গল্প করে। যেন কত পরম-আত্মীয় বন্ধু।

বিদায় নেবার সময় দুটো টাকা তার হাতে দিই। জিজ্ঞাসা করে, কি কিনে আনতে হবে?

বলি, আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে। খাবার কিনে খেও।

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বলে, আমি তো কোন কাজই করতে পেলাম না! সঙ্গে যাওয়াও হল না!

তার আন্তরিক সরলতার কাছে সামান্য টাকাদুটি আমার চোখে নিরর্থক ঠেকে।

হেসে বলি, এবার হল না। পরের বছর হবে।

উৎসাহিত হয়ে সে বলে, ঠিক। আপনি নিশ্চয় মনে রাখবেন। আমিও খবর রাখব।

সন্ধ্যা নামে। সে ধীরে শহরে ফেরে।

এমনি করেই তারা আমার মনের কোণে অলক্ষ্যে বাসা বাঁধে। ভাবি, হিমালয়ের দুর্গম পথের এরাই সত্যকার বন্ধু। গিরিরাজ যেন তাঁর রাজ-সভায় সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর রাজদূত পাঠিয়ে!

২

পিপুলকোটি থেকে বদরীনাথ ৩১ মাইল। মাঝপথে যোশীমঠ। ৬,০০০ ফিট্ উচ্চতা। যাত্রাপথে বড় শহর। প্রসিদ্ধও। মাহাত্ম্যের কারণ বিশেষতঃ দুটি। শীতকালে যখন বদরীনাথের মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে, তখন এইখানে মন্দিরে বদরীনাথের পূজা হয়। তা ছাড়া, পুণ্যস্মৃতি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ভারতের চতুর্মঠের মধ্যে এইখানে একটি। যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ। তাঁর তপশ্চর্যার নিভৃত গুহাটি মঠের নিকটেই। শহরের কিছু উপরে।

পাহাড়ের গায়ে শহরটি দেখতে সুন্দর। ফলফুলের সম্পদ ও শোভা আছে। পথের পাশে অজস্র গোলাপের গাছ। বাগানে আপেল, পিয়ারা, নাসপাতি, সবেদা, খোবানি, পিচ্ ফলে রয়েছে।

এবার কিন্তু শহরে প্রবেশ করতেই বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ল। ভারত-সরকারের সেনা-নিবাস হয়েছে। পথের ধারে ছাউনি পড়েছে। খাকি বেশভূষা পরা লোকজন ঘুরছে। তাদের সঙ্গে দু-একটি গেরুয়া-পরা সাধুও নজরে পড়ল। কে কার পিছনে ঘুরছেন বুঝলাম না।

শুধু অনুভব করলাম, যোশীমঠেরও সে শান্ত পরিবেশ আর নেই। হয়তো, এ যুগে থাকবার কথাও নয়।

যোশীমঠ থেকে যাত্রা-পথ অনেকখানি উৎরাই-পথে নেমে গেছে। একেবারে নীচে অলকানন্দার উপত্যকায়। সেখানে ধৌলী নদীর সঙ্গে সঙ্গম। সঙ্গমে তীর্থক্ষেত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগ। পঞ্চপ্রয়াগের এই একটি মাত্র প্রয়াগ যেখানে

এখনও বাস্ পৌঁছয় নি। অপর চারটি বাস্-পথে ধরা পড়েছে—দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা পরমানন্দা নন। সংহারিণী রুদ্রমূর্তি। ক্ষুরধার প্রবাহে প্রখর বেগে ছুটে চলেছেন—দুই দিকের পাহাড়ের পাথর কেটে। চারিদিকে উচ্ছলিত জলোচ্ছ্বাস। শব্দময়, গতিময়। প্রচণ্ড প্রবাহ। সঙ্গমের কাছে ধৌলীনদীর উপর পুল। পুরানো জীর্ণ সেতুটির এখন সংস্কার হয়েছে। আগে এক-এক জন করে যাত্রী পার হত ; এখন লোহার শক্ত ঝোলাপুল—নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে যাত্রীরা সারি সারি পার হয়ে যায়।

পুল পার হয়ে অলকানন্দার তীর ধরে পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে পথ চলেছে। অলকানন্দার প্রসিদ্ধ গিরি-খাত (gorge)।

যোশীমঠ থেকে সাত মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বর। পাণ্ডুরাজা ও পাণ্ডবদের স্মৃতি ধরে নামকরণ। বদরীনাথ সেখান থেকে আরও বারো মাইল পথ।

পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছবার দুই মাইল আগে ঘাট চটী। ছোট চটী। খানকয়েক দোকানঘর মাত্র। চটী ছাড়িয়েই পথ একেবারে নদীর জলের ধারে নেমে গেছে। তাই বোধ করি 'ঘাট চটী' নামের সার্থকতা। নদীর ধার দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার এঁকে-বেঁকে পথ সামান্য উঠেছে। পথের প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড কালো পাথর। এই পাহাড়-পথে অতি-সাধারণ পাথর—বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। তবুও, আমার কাছে এই সামান্য পাথরটি এক অসামান্য রূপ নিয়ে বিরাজ করে। কয় বছর আগেকার একটি ঘটনার এটি নির্বাক্ সাক্ষী। তাই, প্রতি বছর এ-পথে যাবার সময় এর দিকে সাগ্রহ-নয়নে তাকাই। দেখেই চিনি, এবং সেই পরিচিতির সূত্র ধরে সেদিনের ঘটনাটি স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে।

সে-বছর কেদারনাথ পৌঁছে শুনলাম কাশ্মীরের মহারাণী এসেছেন। মহারাণী,—অতএব চারিদিকে জাঁকজমক, লোক-লস্করের হৈ-চৈ। তাই, আমিও সারাদিন শহর ছেড়ে কাটিয়ে এলাম বাসুকী-তালের জনহীন পথে পথে। বৈকালে ফিরে এসে আশ্রয়-স্থলে বিশ্রাম করছি ; একটি পূর্ব-পরিচিত ভদ্রলোক দুজনকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন। শুনলাম, এঁরা মহারাণীর সঙ্গে এসেছেন। আমাকে অনুরোধ করলেন, চলুন, মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—ব্যবস্থা করে দিই।

বিনীতভাবে জানালাম, আলাপে প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই।

ইচ্ছা না থাকার কারণ সুস্পষ্ট।

'কাশ্মীর' নাম শুনলেই তখন যেন মনের মধ্যে একটা জ্বালা উঠত। এখনও যে না ওঠে এমন নয়। কাশ্মীরে মেজদাদার জীবনের শেষ দিনগুলির বেদনাভরা স্মৃতির এমনি প্রবল প্রবাহ।

তাই, মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় না।

এর পরে প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে। যাত্রা-পথ ছেড়ে হিমাচলের কোন এক নিভৃত অঞ্চলে একান্তে শান্তভাবে আমার কিছু দিন কাটল। তার পর, বদরীনাথে চলেছি। মহারাণীর কথা স্মরণেও নেই। একমনে ধীরে ধীরে পথ চলেছি। এই ঘাট চটীর কাছে হঠাৎ এক বৃহৎ যাত্রীদল নেমে এল বদরীনাথের দিক থেকে। বহু লোকজন—কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা ডাণ্ডী করে—হৈ-চৈ করে সব নেমে চলেছেন। বেশভূষা, চাল-চলনে ধন-দৌলতের উৎকট প্রকাশ মনকে সঙ্কুচিত করল। পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। 'বাবুজি, সামালকে, সামালকে'—বলতে বলতে ডাণ্ডীবাহকরা ডাণ্ডী নিয়ে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আবার পথ চলতে শুরু করেছি। হঠাৎ মনে পড়ল,—সেই মহারাণীর দলটা না? বদরীনাথ দর্শন করে তা হলে ফিরছেন। ভালই হল, আমি পরে যাচ্ছি।

এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে এক জন আমার কাছে ফিরে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সবিনয়ে জানালেন, পাহাড়ের ঐ বাঁকে ডাণ্ডী নামিয়ে মহারাণী অপেক্ষা করছেন,—আমার যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে, তিনি একবার আলাপ করতে চান—এই সংবাদটুকু পাঠিয়েছেন।

দ্বিধা কাটিয়ে ফিরে চললাম। আহ্বানকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-মহারাণী কে এবং আমার পরিচয়ই বা পেলেন কি করে?

শুনলাম, ইনি মহারাজা হরি সিং-এর প্রধানা মহিষী। এখন রাজ-মাতা। যুবরাজ করণ সিং-এর জননী। আমার এ অঞ্চলে আসার খবর তিনি শুনেছিলেন। আজ পথে আমাকে দেখে, কেন জানি না, তাঁর সন্দেহ হয়, তাই কিছু পিছনে আমার যে সঙ্গীটি আসছিলেন তাঁকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং পরিচয় পেয়ে ডাণ্ডী থামিয়ে এখন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

এই পাথরটির কাছে পথের উপর দুইটি ডাণ্ডী নামানো রয়েছে দেখলাম। অপর ডাণ্ডীটিতে তাঁরই এক সঙ্গিনী-যাত্রী—কোথাকার আর এক রাণী।

কাছে আসতেই দুই হাত তুলে মহারাণী অভিবাদন করলেন।

লক্ষ ললনার জনতার মধ্যে যদি তিনি থাকতেন এবং আমাকে কেউ প্রশ্ন করত, তাঁদের মধ্যে মহারাণী কে?—আমি নিঃসন্দেহে এঁকেই দেখিয়ে দিতাম। বর্ণে, রূপে, লাবণ্যে তাঁর এমনি এক মহিমান্বিত দীপ্তি ছিল। কিন্তু, আমার শোনা না থাকলে বিশ্বাসই হত না যে ইনি রাজমাতা। দেখে মনে হয়, রূপ-রাজত্বের স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন করিয়ে বয়স যেন এগিয়ে যেতে ভুলে গেছে।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হল অল্পই, কিন্তু তাঁর কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে।

আমায় প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আপনি ডাঃ মুখার্জির ভাই? কেদারনাথে যখন পৌঁছেছিলাম তখন আপনিও সেখানে ছিলেন। অথচ দেখা হয় নি।

বললাম, হওয়ার তো কোন কারণ ছিল না।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, কিন্তু আমি আশা করছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। অথচ, পথে আর কোথাও আপনার খবর পাই নি। আজ আপনাকে দেখে সন্দেহ হতে ডেকে কষ্ট দিলাম—একটা কথা বলার জন্যে। আপনার মাতাঠাকুরাণী এখন কোথায় আছেন?

বললাম, পুরীতে। তাঁর কাছেই ছিলাম। তারপর এদিকে এসেছি।

তিনি তখন শান্ত কণ্ঠে বললেন, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয় ছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল। অথচ কি নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিড়ম্বনা—তাঁর যখন কাশ্মীরে জীবন নিঃশেষ হল, আমরাও তখন শ্রীনগরেই, তবুও এত বড় নিদারুণ দুঃসংবাদের কোন রকম আভাস পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছয়নি! সব শেষ হয়ে যাবার পর—তাঁর মর-দেহ কাশ্মীর থেকে চলে গেলে আমি খবর পেলাম। অথচ, আমি হলাম—

কথার মাঝে তিনি থেমে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে,—আর কেউ জানুক বা না জানুক আমি জানি কাশ্মীরের কত বড় হিতৈষী বন্ধু চলে গেলেন, আজ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যে যোগ-সূত্র এখনও রয়েছে, তার জন্যে কাশ্মীর তাঁর কাছে ঋণী। তাই, সেদিন

আমার ছেলে যখন কলকাতায় গেল তাকে বলেছিলাম যে আজ কাশ্মীরে তোমার যে প্রতিপত্তি ও পদের মর্যাদা, তা কতখানি ডাক্তার মুখার্জির জন্যে তা তুমি জানো। কলকাতায় গিয়ে তাঁর জননীকে প্রণাম করে আসবে এবং নিজের মুখে জানিয়ে আসবে যে তাঁর শেষ দিনগুলির খবর যেমন তাঁর কাছে অজ্ঞাত, তেমনি সেখানে আমাদের নিজের দেশে উপস্থিত থেকেও আমরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। —এ-ব্যথা আমারও কখনও ভোলবার নয়!

তাঁর কথা ভারী হয়ে উঠল। চোখ তুলে দেখি, তাঁর দু-নয়ন-ভরা অশ্রুরাশি।

একটু চুপ করে থেকে আবার ধীরে ধীরে বললেন, আমার ছেলে ফিরে এলে আপনার মার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে লজ্জিত হয়ে আমায় জানাল, তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে যায় নি; বললে, 'অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না, ডাঃ মুখার্জির মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত মনের জোর কোনও মতেই পেলাম না।'—আমি আমার ছেলের এ অক্ষমতার কথা বুঝি, তবুও আমি এর জন্যে সত্যিই দুঃখিত। আপনি ফিরে গিয়ে মাকে আমার প্রণাম জানাবেন—আমার কথা তাঁকে বলবেন।

তিনি নিস্তব্ধ হলেন।

নির্বাক্ হয়ে শুনছিলাম। ভাবছিলাম, এ তো একজন সামান্য নারীর ব্যক্তিগত ব্যথার সমবেদনার কথা নয়, কাশ্মীরের মহারাণীর শোক-গাথাও নয়—এ যেন মূর্তিময়ী কাশ্মীর-দেশ-জননী এসেছেন—ভারত-মাতার পুত্র-শোকের নিদারুণ ব্যথার অংশ নিতে।

তাঁকে জানালাম, ফিরে গিয়েই মাকে নিশ্চয় সব বলব। কিন্তু, আপনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন তো নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

তিনি বললেন, সে ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু কলকাতা যাওয়া আমার হয় না। আমার প্রণাম জানাবেন তাঁকে। আমারও মা তিনি।—বলে হাত তুলে উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

ফিরে এসেই মার কাছে সব গল্প করেছিলাম। তাঁরও দু চোখ বেয়ে শুধু অঝোরে অশ্রু ঝরেছিল।

এখন সব স্মৃতি-কথা। অশ্রুময় সেই সজল-কাহিনী এখন যেন পাষাণ রূপ নিয়ে পথ-প্রান্তে ঐ পড়ে রয়েছে। তাই থাক। হিমালয়ের বন্ধুর পথ বন্ধুর আহ্বান দিয়ে সজাগ করে তোলে পথিক-চিত্তকে। আবার পথ চলি। ধীরে

ধীরে এগিয়ে যাই। অলকানন্দার জল-তরঙ্গ মনের মধ্যে উদাস সুরে পূরবীর তান তোলে।

৩

ঘাট-চটী ও পাণ্ডুকেশ্বরের মাঝপথে—অর্থাৎ দুদিক থেকেই এক মাইল দূরে—পথের পাশে একটি ছোট ঘর। আজ কয় বছর আসা-যাওয়ার পথে উৎসুক নয়নে দেখতে দেখতে যাই। চোখে পড়ে, কেমন করে ছোট ঘর ধীরে ধীরে বড় হয়। একতলার উপর দোতলা ওঠে। মাথার উপর গম্বুজও তৈরী হয়।

শিখদের একটি সুন্দর গুরুদ্বার।

শিখদের? প্রথম যে-বছর শুনেছিলাম আশ্চর্য বোধ হয়েছিল। বদরীনাথে ভারতের সর্ব-প্রদেশের যাত্রী দেখেছি। পাঞ্জাবীও। কিন্তু, শিখদের বিশেষ দেখি নি। এতদিনে হিমালয়ের এ-অঞ্চলে তাদের একটি নতুন তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠছে।

তাই, এবার যাত্রা-পথে অনেক শিখ-যাত্রীরও সাক্ষাৎ হয়েছে। মুখ ভরা দাড়ি-গোঁফ, মাথা-ভরা চুল, হাতে লোহার বালা—দলে দলে যাত্রী চলেছে। মেয়েরাও চলেছে—লম্বা গড়ন, সবল সুপুষ্ট দেহ—পায়জামা ও ঝোলা পিরাণ পরা—তারই ওপর রঙিন ওড়না উড়িয়ে। কেদার-বদরী-যাত্রীদের মত তাদেরও বিপুল উৎসাহ। কিন্তু, মুখে তাদের 'জয় বদরীবিশাললালকী জয়' ধ্বনি নয়, যাত্রী দেখলেই তারা হাসিমুখে ধ্বনি তোলে, 'জয় হেম্‌কুন্‌ড্‌ কী জয়!'

তাদের জয়ধ্বনির আমিও প্রতিধ্বনি তুলি। কেন না, আমিও এবার সে-পথের যাত্রী।

যাত্রা-পথের পাশেই যেখানে নতুন গুরুদ্বারটি—সে স্থানটির নামকরণ হয়েছে গোবিন্দ-ঘাট। ঘাট—কেননা অলকানন্দার জলধারার ঠিক উপরেই। গোবিন্দ—শিখগুরু গোবিন্দ সিং।

গোবিন্দ সিং-এর নামের সঙ্গে যোগ-সূত্রের আবিষ্কার অতি-আধুনিক।

'বিচিত্র নাটক' শিখদের ধর্মগ্রন্থ। গুরু গোবিন্দের রচিত। তাঁর স্ব-কথিত জীবন-কাহিনী। শুধু সেই জন্মের আত্ম-কথাই নয়—পূর্ব-জন্মের ইতিকথাও

আছে। এরই এক অংশে তিনি তাঁর জন্মান্তরের সাধনার উল্লেখ করে বলেছেন হেমকুণ্ডের কথা। সেইখানেই সপ্তশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী; পাণ্ডুরাজ সেখানে যোগসাধনা করেছিলেন। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে মহাকালের আরাধনা করে ঘোর তপস্যার ফলে গুরুগোবিন্দ বিধাতার সঙ্গে মিলিত হন।

অব মৈ অপনী কথা বখানীঁ, তপ সাধত জিহি বিধি মোহি আনীঁ।
হেমকুণ্ড পর্বত হৈ জহাঁ, সপ্তশৃঙ্গ সোহত হৈ বহাঁ।
সপ্তশৃঙ্গ তিহি নাম কহাবা, পাণ্ডুরাজ জহাঁ জোগ কমাবা।
তহঁ হম্ অধিক তপস্যা সাধী, মহাকাল কালকা অরাধী।
এহি বিধি করত তপস্যা ভয়ো, দ্বৈ তে একরূপ হ্বৈ গয়ো॥

এই পুণ্য-সাধনা-ক্ষেত্রের সন্ধান বহু অনুসন্ধান করেও শিখেরা পান নি। ১৯৩৬ সালে সন্ত সোহন সিং ও হাবিলদার মোদন সিং নামে দুইজন শিখ হিমালয়ের বহু দুর্গম তীর্থ ঘুরে এই গিরিশ্রেণীর শীর্ষদেশে হিন্দুদের অতি-প্রাচীন দুরূহ তীর্থ লোকপাল হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। গুরু গোবিন্দের বর্ণনা মিলিয়ে এঁরাই প্রথম আবিষ্কার করলেন যে এই 'বিচিত্র নাটক'-এর উল্লিখিত হেমকুণ্ড! এই পাহাড়ের পাদমূলেই তো পাণ্ডুকেশ্বর—ঐখানেই তো পাণ্ডুরাজ শিবস্থাপনা করেছিলেন। ঐ তো অদূরে গগন-স্পর্শী তুষার-শিখর সপ্তশৃঙ্গ। মহাভারতের আদি পর্বে মহারাজ পাণ্ডুর হিমালয়বাসের বর্ণনার মধ্যে এরই তো উল্লেখ আছে:

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরঃ প্রাপ্য হংসকূটমতীত্য চ।
শতশৃঙ্গে মহারাজ তাপসঃ সমপদ্যত॥

আধুনিক মানচিত্র আজও সেই নামই বহন করে।

তাঁদের এই আবিষ্কার-কাহিনী শিখ-সমাজে প্রচার করতে তাঁরা পাঞ্জাবে ফিরে গেলেন। শিখদের বিরাট ধর্মসভা বসল, এঁদের প্রমাণ ও যুক্তি স্বীকৃত হল।

তার পরেই শুরু হল পুণ্যকামী শিখ যাত্রীদের তীর্থযাত্রা—নব-আবিষ্কৃত প্রাচীন পবিত্র হেমকুণ্ডে। দুর্গম পার্বত্য পথ। দুরারোহ চড়াই। অল্প-সংখ্যক যাত্রী চলে,—যেন গিরিশিখরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত তুষার উদ্দীপিত ধর্মের উত্তাপে বিন্দু বিন্দু গলতে শুরু করল। যাত্রী চলে,—পথে আশ্রয় নেই, কিন্তু বুক বেঁধে পুণ্য-লাভের আশা নিয়ে।

ক্রমে ক্রমে যাত্রাপথের মুখে—এই 'গোবিন্দ-ঘাট' গড়ে উঠল। 'গুরুদ্বার'

জাগল,—নবীন তীর্থ-পথের তোরণ হয়ে সুন্দর একটি ধর্মশালাও তৈরী হল। শিখেদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ যাত্রাপথও প্রশস্ত হল। যাত্রীরা নিরাপত্তার স্বস্তি বোধ করলেন। যাত্রা-পথ-শেষে ঘাংরিয়াতেও ধর্মশালা গড়ে উঠল। পাহাড়ের চূড়ায় হ্রদের তীরেও আর একটি সুন্দর গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হল। এখন, দুর্গম পথ সুগম হওয়ায় যাত্রী চলেছে দলে দলে,—তুষার-গলা ঝরণাধারার মত।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে এক মাইল আগে বদরীনাথের যাত্রা-পথের দক্ষিণ দিকে এই গোবিন্দ-ঘাটের ধর্মশালার প্রবেশ পথ। পথের ধারে কাঠের ফলকে বিজ্ঞপ্তি আছে। গোবিন্দ-ঘাটের উচ্চতা ৬,০০০ ফিট। এখান থেকে লোকপাল বা হেমকুণ্ড প্রায় বারো মাইল। সেখানকার উচ্চতা ১৪,২৫০ ফিট। আরও একটি খবর লেখা আছে: এখান থেকে Valley of Flowers নয় মাইল তিন ফার্লঙ মাত্র। সেখানকার উচ্চতা ১৩,০০০ ফিট। সাত মাইল—একই পথ।

প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। এই নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় হিমালয়-অভিযানকারী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ-এর একখানি বই-এ। ভুন্দর নদীর (Bhyundar) উপত্যকায় ও তুষার-রাজ্যে কাটানো দিনগুলির বিচিত্র কাহিনী। নদীর উপকূলে অপরূপ এক পুষ্পরাজ্য। নানান রঙের ফুলের রঙে আলোকিত, সৌরভে আমোদিত।

১৯৩১ সাল। কামেট গিরিশিখর (২৫,৪৪৭ ফিট) আরোহণ করে ফেরার পথে স্মাইথ ও তাঁর সঙ্গীরা অকস্মাৎ এই উপত্যকাটি দেখতে পান। এমন বিচিত্র ও অপূর্ব কুসুম-সমাবেশ তাঁরা পৃথিবীর আর কোথাও দেখেন নি। স্মাইথ-এর *Kamet Conquered* বই-এ এর বিবরণী আছে। ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পরও এই উপত্যকার উজ্জ্বল স্মৃতি তাঁর মনকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে। হিমগিরি দেবতার সত্যকার উপাসক তিনি। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর রোধ করার উপায় ছিল না।

১৯৩৭ সাল। তিনি আবার ফিরে এলেন ভুন্দর উপত্যকায়। নদীর শ্যাম-বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তাঁবু ফেললেন। হিমাচলের এই নিভৃত অঞ্চলে তাঁর কয়েক মাস কাটল। বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলির চূড়ায় ওঠেন, উপত্যকার বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান—নানান বর্ণের নানান জাতির ফুলগুলি

সংগ্রহ করেন। তাদের নাম-গোত্র-জন্ম-পরিচয় নেন, অজানা ফুলগুলি বিলাতে পাঠিয়ে অভিজ্ঞের মতামত জানেন। তারপর, তাঁর এই সৌন্দর্যময় অভিনব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে যে পুস্তক প্রকাশ করলেন তার নাম দিলেন—*Valley of Flowers*। তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন রকমের ফুলের সংখ্যা হয়েছিল আড়াই শত।

এই গোবিন্দ-ঘাট থেকে সেই Valley of Flowers-পথেরও যাত্রা শুরু। লোকপাল-ক্ষেত্রেরই আর এক অংশ।

এর কয়েক বছর পরের কথা।

শ্রীবুদ্ধ বসু তাঁর হিমালয়-অভিযানের প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্রের মাধ্যমে এই উপত্যকার ফুলরাজির বিচিত্র বর্ণবিন্যাস শহরবাসী লোক-সমাজে প্রচার করলেন। তিনি তাঁর স্বকীয় নামকরণ করলেন—নন্দন-কানন।

পাহাড়ীরা অনেকে এসব নতুন নাম পছন্দ করেন না, গ্রহণও করেন না। তাঁদের কাছে এখনও সেই প্রাচীন পরিচয়,—লোকপাল—হেমকুণ্ড।

গোবিন্দ-ঘাটের কাছে কাঠের ফলকে স্বাধীন ভারতে এখন হিন্দী নামকরণ হয়েছে—ফুলোঁকী ঘাটি। কানে ও মনে যেন কাঠি বাজায়!

৪

সে-বছর বদরীনাথ থেকে ফেরবার পথে গোবিন্দঘাটে এসেছি। শিখদের সেই ধর্মশালায় উঠেছি।

বদরীনাথ যাবার সময় ধর্মশালায় প্রবেশ করে হেমকুণ্ড ও Valley of Flowers-এর পথের খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন এখানে কয়েকজন শিখ-যাত্রী ছিলেন, দেখেছিলাম। এখন সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। যাত্রী কেউই নেই।

ধর্মশালার স্থানীয় শিখ ভদ্রলোকটি আমাদের আদর-অভ্যর্থনা করলেন, গরম চা খাওয়ালেন, ধর্মশালার উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। পরিচয় পেলাম, ইনিই সেই তীর্থ-আবিষ্কারক সোহন সিং।

গুরুদ্বারে দুদিকে চওড়া রোয়াক। উপরে আচ্ছাদন নেই। পাশে তখনও

রেলিঙ্ তৈরী হয় নি। ঘর তৈরীর মালমশলা, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা আছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড হল্‌ঘর। এখনও মেঝে হয় নি। সেই-খানেই গ্রন্থ মহারাজ অধিষ্ঠিত হবেন। সেই হল্‌ঘরটিকে ঘিরে চারিদিকে লম্বা টানা বারান্দার মত ঘর। চারিদিকেই জানালা। একদিকের ঘরের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। সেইখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন হল। নতুন ঘর। প্রকাণ্ড লম্বা। সিমেন্টের মেঝে। কাঠের দেওয়াল। নতুন কাঠের সুবাস।

বাইরের খোলা বারান্দার একদিকে এসে দাঁড়ালাম। নীচেই অলকা-নন্দার বেগময়ী ধারা। তারই উপর পুরানো ঝোলা পুল। মাঝে মাঝে কাঠ ভেঙে গেছে। নতুন লোহার পুল তৈরী হবার কথা আছে। ঐ পুল পার হয়ে অপর পারে আমাদের নতুন যাত্রা-পথ।

ধর্মশালা থেকে কিছুদূরে অলকানন্দার সঙ্গে ভুন্দর নদীর সঙ্গম। ভুন্দর নদীর অপর নাম লক্ষ্মণগঙ্গা। সেই নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে হবে।

অপর পারের পাহাড়ের বুকে আঁকা আঁকা-বাঁকা ক্ষীণ পথরেখা। অজানা জগতের কুহক-মাখা।

·

বদরীনাথে দেখা হয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। কলকাতা ছাড়ার আগে তিনি কেদার-বদরী যাত্রার উদ্দেশ্যে এ-পথের সন্ধান নিতে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, যাত্রা সাঙ্গ করে তিনি বদরীনাথে অপেক্ষা করবেন, তার পরে একসঙ্গে লোকপাল ও Valley of Flowers-এ যাওয়া যাবে। বদরীনাথে তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু, লোকপাল-যাত্রা তাঁর বন্ধ করতে হল স্বাস্থ্যের কারণে। রক্তের চাপ তাঁর আগে থেকেই ছিল, হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বদরীনাথের বাঙালী সরকারী ডাক্তার সাবধান করে দিলেন, লোকপালের মত উঁচু জায়গায় তাঁর যাওয়া ঠিক হবে না।

বদরীনাথ থেকে গোবিন্দঘাটে আসার পথে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল। বললেন, আপনারা এগিয়ে যান। গোবিন্দঘাটে আপনাদের সঙ্গে মিলব। ইচ্ছা ছিল, লোকপালের পথে ক'দিন একসঙ্গে কাটাব তা যখন হল না, আজকের রাত্রিটা অন্ততঃ একসঙ্গে আনন্দে কাটানো যাবে,—নাই বা গেলাম আজ যোশীমঠ পর্যন্ত। এখন তো বাড়ি ফেরার পথ।

গোবিন্দঘাট-এ এসে তাঁদের দলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ঘরের ভিতর তাঁদের জন্যে একধারে কম্বল বিছিয়ে আয়োজন করে রাখি।

বিকেল বেলা। বৃষ্টি নামল। মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। তাঁদের জন্যে উৎকণ্ঠা হয়, শরীর খারাপ, ভিজবেন নিশ্চয়। পাণ্ডুকেশ্বরে থেকে যাবেন নাকি? কিন্তু, থেকেই বা লাভ কি? পাহাড়ে বৃষ্টি—পথ-চলার মধ্যে এড়ানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে ডাক শুনি।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াই। ঐ তো এসে গেছেন!

উৎসাহে বলি, আরে! চলে আসুন ভেতরে। একেবারে ভিজে নেয়ে গেছেন। বর্ষাতি, ছাতায়—কোন কিছুতেই এ-বৃষ্টি বাগ মানে না। আর ভিজবেন না,—ভেতরে এসে, শুক্‌নো জামা-কাপড় দিচ্ছি, ছেড়ে ফেলুন। গরম চাও তৈরী হয়ে যাবে এখনই।

তবুও ঘরে ঢোকেন না। বাইরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। হাসতে থাকেন।

বলেন, না, আর ভেতরে ঢোকা নয়। সেই কথাই বলছি। কিছু মনে না করেন তো আমরা যোশীমঠেই চলে যাই। বৃষ্টি এখন তবুও একটু কমেছে। কাল যদি আবার আরও জোরে নামে! আপনারা তো চলে যাবেন ওপরে, আমাদের তো সেই নামতেই হবে। আজ তবু যতটা পারা যায় এগিয়ে থাকা যাক্।

আমিও স্বীকার করি। বলি, সত্যি বল্‌তে কি—শুধু রাত্রি কাটানোর প্রস্তাবটা আমারও মনে ধরে নি। একসঙ্গে ওপরে যাবার কথা। ডাক্তারের মতে তা যখন একেবারে সম্ভবই নয়, তখন কাল ভোরে উঠে আমরা যাব নির্দিষ্ট পথে, আর আপনারা যাবেন ফিরে—সেটা মনে বড় লাগ্‌ত। এ মন্দের ভাল হয়েছে।—আপনারা এগিয়ে চলুন। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলে ভিজবেন না।

বন্ধুটি পিছন ঘুরে এগিয়ে যান। থম্‌কে দাঁড়ান। আবার ফিরে আসেন। সঙ্কোচভরে বলেন, একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। রাখবেন?

বলি, নিঃসঙ্কোচে বলুন কি হুকুম।

তিনি বলেন, সঙ্গে এক টিন না-খোলা বিস্কুট আছে। কলকাতা থেকেই এটা আলাদা করে রেখেছিলাম—লোকপাল তীর্থে এর সৎকার করব বলে। এখন বেচারী ফিরে চলেছে আমাদের সঙ্গে। ওটা দিয়ে দিই,—নিয়ে যান—সেখানে সদ্‌গতি হবে।—তারপর হাসিমুখে বলেন, আমাদের কথাও নিশ্চয় তখন মনে পড়বে।

তখনই জবাব দিই, মনে এমনি অনেক সময়েই পড়বে। তবুও দিন, আপনার ইচ্ছার অন্ততঃ এইটুকু পূরণ হোক্।

তারপর বলি, আমারও একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। এখানে এসেই আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যে রাত্রিতে পরমান্নের ব্যবস্থা করেছিলাম—আমসত্ত্ব দিয়ে খাবেন বলে। পরমান্ন এখনও তৈরী নয় বটে, কিন্তু আমসত্ত্ব বার করা রয়েছে—সেটা নিয়ে যান, পথে কাজ দেবে।

বন্ধু এসে নিয়ে নেন। বলেন, এমনি করেই ভাগ্যে জোটে। ক'দিন হল আমাদের ওটার স্টক্ ফুরিয়েছে।—ভাল কথা, লোকপাল থেকে ব্রহ্মকমল আনবেন। অদ্ভুত না কি সে ফুল! কল্‌কাতায় বসে বসেই দেখব, আঘ্রাণ নেবো।—আর ক'দিন পরেই তো বাড়ি পৌঁছচ্ছি! চল্‌লাম।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। বৃষ্টিধারার ঝালরের মধ্যে দিয়ে। চারিদিকে আবছায়া আবহাওয়া। আকাশের মেঘ পাহাড়ের বুকে নেমে আশ্রয় নিয়েছে। দূরের পাহাড় চোখে পড়ে না। কাছের পাহাড় মেঘের পর্দার অন্তরালে অস্পষ্ট। তারই মধ্যে যাত্রী চলেছে। কর্দমাক্ত পথে। সিক্ত তনু। শ্রান্ত পদ। গৃহমুখী মন। যাত্রা অন্তে দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর হয়ে তাদের সামনে পড়ে থাকে।

আমাদের মন কিন্তু উন্মুখ।

কাল ভোরে রওনা হতে হবে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে ঘাংরিয়া। লোকালয় নেই। ধর্মশালা আছে। সেখানে রাত্রিবাস চলে। তবে সংস্কার অভাবে জীর্ণ, অপরিচ্ছন্নও। বন-বিভাগের একটা নতুন বাংলো হয়েছে—রেস্ট হাউস্। ব্যবস্থা করতে পারলে সেখানে থাকা যেতে পারে। পথে একটি গ্রাম আছে। চৌকিদার সেইখানে থাকে। ঘাংরিয়া থেকে একদিন হেমকুণ্ড বা লোকপাল ও আর একদিন Valley of Flowers দেখে তিনদিন পরে আবার এই গোবিন্দঘাটে ফেরা। তাই, যে-জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন শুধু সেইগুলি নিয়ে যাবার আয়োজন হয়েছে।—অর্থাৎ শুধু খাওয়া, পরা ও শয্যার ব্যবস্থা। অতিরিক্ত মাল এখানেই থাকবে। নইলে, অযথা মালের বোঝা বাড়বে। খাদ্যসামগ্রীর সংগ্রহ হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর থেকে—আটা, ঘি, আলু। চাল নিয়ে লাভ নেই—অত উঁচুতে জলে সিদ্ধ হতে চায় না।

সঙ্গী কুলী বলে, ক্ষিদে হবে ওখানে খুব। কিন্তু চায়ের প্রয়োজন হবে

আরও বেশী। গুঁড়ো দুধ ও বেশী করে চিনি নিতে যেন ভুল না হয়। কেরাসিন তেলও খানিকটা টিনে করে নিতে হবে।—দেখেশুনে তারাই সব বেঁধে ঠিক করে রাখে।

রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্‌ল। বাইরে ঘরের ছাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। শিল পড়ছে নাকি?

কম্বল ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাঁড়াই। বড় টর্চটার আলো বাইরে ফেলি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। টর্চের আলো জানালার বাইরে বৃষ্টির ধারাজালে আবদ্ধ হয়। পিছনের গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়। চারিদিকে হু হু করে জলের তোড় নামছে শব্দ করে। সব ছাপিয়ে অলকানন্দার গম্ভীর গর্জন।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর বিছানায় শিশিরবাবুর মুখে ফেলি। পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে আছেন। বলেন, জেগে আছি। সব দেখছি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। সকালেও থাম্‌বার আশা দেখি না। জল না থামলে যাওয়া সম্ভব হবে?

বলি, সম্ভব না হলে যাবও না। এখন ঐ নিয়ে ভাবতে বসলেও তো বৃষ্টি থামবে না।

অতএব, আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া। অবিশ্রান্ত বারিধারার মেঘমল্লার সুরের সঙ্গে অনিশ্চয়তায় মন দুল্‌তে থাকে।

কখন রাত্রি ভোর হয়েছে জানা নেই। বেলা আটটা বাজে। এখনও চারিদিক অন্ধকার। নিশীথ-রাতের নিবিড় আঁধার তরল হয়েছে মাত্র। বৃষ্টি তেমনি চলেছে। শ্রাবণের ধারার মত। অক্লান্ত, অঝোরে।

পথে একটিও যাত্রী নেই। দলে দলে ভেড়াছাগলের আনাগোনাও নেই। পশু-পক্ষী-জন-মানব-হীন জগৎ। চারিদিকে শুধু জল, জল। জলেরই কেবল কল্‌কল্ ছলছল শব্দ।

কম্বল-গায়ে সঙ্গী কুলী এসে বসল। বলে, বলুন, কি করা যাবে।

হেসে বলি, চল, যাবে না? এতক্ষণ তো পাঁচ-ছ মাইল পথ চলে যাবার কথা।

সে-ও হেসে জবাব দেয়, আমরা সব সময়েই তৈরী আছি। হুকুম হলেই বার হতে পারি।

জানি, এটা তাদের মুখের কথা নয়। সত্যই তারা পারে। এতো বড় নিঃস্বার্থ নির্ভরযোগ্য সঙ্গী জগতে দুর্লভ।

তারপর আবার হেসে বলে, আমাদের কষ্টের ভয় নেই, ক্ষতিরও ভাবনা নেই। পাহাড়ের ঝড়-জল আমাদের সঙ্গী, 'ডর্' করি শুধু গরমকে। কিন্তু, এই জলে বেরুলে আপনাদের কষ্ট হবে, জিনিসপত্রও সব ভিজে যাবে। এ-বৃষ্টিতে বর্ষাতিতে কোন কাজই দেবে না। যা বলবেন তাই হবে।

হবে আর কি? যা দেখছি আজ সারাদিনই এখানে কাটবে।

অতএব, গরম গরম চা আনাই। তাদের দিই, নিজেরাও খাই।

বাইরে বেলা গড়িয়ে যায়। তবুও আকাশের আলো খোলে না। নিবিড়কালো নিশ্ছিদ্র নিখিল।

৫

নীচে থেকে শিখ-ভদ্রলোকটি এসেছেন খবর নিতে। তিনি এখানকার সব দেখাশুনা করেন। একটা কমিটি আছে। তারা টাকাকড়ি তুলে ধর্মশালা তৈরী করছেন। সরকারের সহযোগিতায় পথঘাটেরও সংস্কার হচ্ছে।

হেমকুণ্ডের তীরে গুরুদ্বার তৈরী হয়ে গেছে, ঘাংরিয়ার ধর্মশালাটিও নতুন করে করার প্রস্তাব আছে। অমায়িক ভদ্রলোক। নিজেই বাড়ি-তৈরীর দেখাশুনা করেন। প্রচুর উৎসাহ।

বলেন, একাই এইসব করেছি। করছিও। কারও এতদিন সাহায্য পাই নি। এবার কাজ এগিয়েছে। লোকে এখন কর্তৃত্বের লোভে আসতে শুরু করছে।

এ-রকম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হেমকুণ্ডের পথে এগিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি জানালেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সৎ-পরামর্শ যিনি দিতে পারেন, তিনি আজ দিন তিনেক হল এখানে এসে গেছেন। এখনই আসছেন ওপরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর কাছেই সব জানতে পারব।

একজন শিখ সাধু। 'ডাক্তার' নামেই এখানে খ্যাত হয়তো পূর্বাশ্রমে

চিকিৎসা করতেন। সংসার ছেড়ে এখন তিনি বেশির ভাগ হিমালয়ে থাকেন। সম্প্রতি ছয় সপ্তাহ একটানা হেমকুণ্ডে ছিলেন।

সাধুটি এলেন। অতি সাধারণ বেশভূষা। গেরুয়া নয়। শিখদের মত পরনে লম্বা ঝোলা পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। একমুখ সাদা দাড়ি গোঁফ। সৌম্য মূর্তি। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। ধীর শান্ত কথা বলার ভঙ্গী। হিন্দী ইংরাজি দুই জানেন।

বললেন, আপনারা এসেছেন, ভালই। যান, দর্শন করে আসুন। এ ভাবে বৃষ্টি হলে পথে কষ্ট হবে ঠিকই, হয়তো কোথাও পাহাড়ের ধস্ নেমে পথ ভেঙে গেছে দেখবেন। তবে যাওয়া অসম্ভব নয়। অসুবিধা হতে পারে, এই পর্যন্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে বৃষ্টি এভাবে চললেও আপনি যেতে বলেন?

মৃদু হেসে জবাব দিলেন, আমি বলার কে? মনে বিশ্বাস যদি থাকে, বেরিয়ে পড়লে কোন ভয় নেই বলেই মনে করি। আর, বৃষ্টির কথা ভাবছেন? কাল সকালে জল থেমেও তো যেতে পারে।

বললাম, যে রকম ঘনঘটা মেঘ, কাটার কোন লক্ষণই তো নেই।

তিনি বললেন, এখন দেখে কিছু বুঝবেন না। বিকেলে দেখবেন, যদি একবারও মেঘ ছিঁড়ে সূর্যের আলো ফোটে, কাল সকালে আকাশ একেবারে নির্মেঘ হয়ে যাবে।

বাইরে মেঘের প্রলয়-আঁধার, সাধুজির ভাষায় আশার আলো।

তাঁর কাছে হেমকুণ্ডের বর্ণনা শুনি। তাঁর অভিনব জীবনের কয়দিনের বিচিত্র কাহিনী।

কুণ্ডের ধারে যে ধর্মশালা, তাতেই থাকতেন। নিঃসঙ্গ। পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। কচিৎ কখনও যাত্রী গেলে লোকমুখ দর্শন হত। আহার্যের কোনই আয়োজন নেই। কাছে থাকে শুধু 'চানা'। ফুরিয়ে গেলে উপবাসী থাকতেন। যাত্রী গেলে আবার দিয়ে আসত। শুধু ছোলাই। হ্রদের জল—সুশীতল, সুস্বাদু। বলেন, সে-ও তো পুষ্টিকর।

শান্তকণ্ঠে বলতে থাকেন, দেবতাত্মা হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে অতি-পবিত্র এসব তীর্থ-স্থান। হিন্দু বলুন, শিখ বলুন—ধর্মের মূল কথায় কারো প্রভেদ নেই। ধর্ম নির্বিশেষে দেবতাত্মার সঙ্গে পরিচয় করবার এসব প্রকৃষ্ট পরিবেশ। চারিদিকে প্রকৃতির কি প্রশান্ত রূপ! আত্মস্থ হবার প্রকৃতই

অনুকূল আবেষ্টনী। রাত্রিদিন আসনে থাকতাম। আপনা হতেই ধ্যান আসে। চক্ষের পলকে রাত্রির আঁধার, দিনের আলো যেন কোথায় মিলিয়ে যেত। সত্যিই সেখানে—'দিনানি যত্র গচ্ছন্তি ক্ষণপ্রায়াণি দেহিনাম্'! চারিদিক নিস্তব্ধ নিস্পন্দ। মৌনী প্রকৃতিরও যে ভাষা আছে, এক একদিন তাই যেন শুনতে পেতাম। গভীর রজনী। অকস্মাৎ শব্দ শুনে আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। কে যেন কথা কয়। অথচ কোথাও কিছু নেই। বাতাসও নেই। শব্দের কারণের কোন নিদর্শন পাই না। ভাবি, মনের ভুল? কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রেই তো আছে—

ভগবানপি তত্রৈব তেষামানন্দমাবহন্।
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ স্বয়মায়াতি মজ্জনে॥

সকলে সত্যিই বিশ্বাস করে—গহনরাতে দেবতারা আসেন হেমকুণ্ডের তীরে—

কথার মাঝে হঠাৎ থেমে যান। ধীরে ধীরে বলেন, থাক্ ওসব কথা। ওসব বলবারও নয়, বোঝাবারও নয়। অনুভূতি-সাপেক্ষ। সেটা প্রমাণও নয়।

কোন কিছু প্রশ্ন করি না। চুপ করে শুনি।

তখন সহজ কণ্ঠে বলেন, হেমকুণ্ডে পৌঁছবার কিছু আগে পথে খানিকটা বরফ পাবেন। এখন গলতে শুরু করেছে। সেই জায়গায় পথ ছেড়ে সাবধানে পাহাড়ের একটু ওপরে উঠে সেইখানের বরফের ওপর দিয়ে পার হবেন—বরফ সেখানে এখনও শক্ত আছে। পথ ধরে গেলে সেখানে যে বরফ আছে—তা ভেতরে গলে গিয়ে এখন বিপজ্জনক হয়ে আছে। আপনাদের সঙ্গে যে লোক যাচ্ছে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো। কোন ভয় নেই আপনাদের।

কল্প-লোকের মানুষ যেন মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন। মানুষের দরদী-হৃদয় রুদ্ধ দুয়ার খোলে।

এঁকে দেখেছিলাম তার পর আর একদিন। ক্ষণিকের দেখা। তবুও, মনের পটে চির-ভাস্বর রেখা এঁকে দিয়েছে।

হেমকুণ্ড দর্শন করে ফিরে এসেছি। গোবিন্দঘাটে রাত্রি কাটাচ্ছি। ভোরে উঠে নেমে যাব যোশীমঠে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্নার আলো এসে কম্বলের উপর পড়েছে। ঘড়িতে দেখি, রাত দুটো। শয্যা ছেড়ে বাইরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

জ্যোৎস্না-প্লাবিতা ধরণী। তুষার-মৌলী শৈলশিখরের রজতদীপ্তি। গিরিরাজ হিমালয় যেন ধ্যান-মৌনী। শুধু আনন্দোচ্ছল অলকানন্দার জলধ্বনি। স্তব্ধ হয়ে দেখি, কান পেতে শুনি। হঠাৎ চমক লাগে নদীর তীরে একটি মূর্তি দেখে। জলের ধারেই প্রকাণ্ড উঁচু পাথর। তারই উপর সমাসীন মানুষ-মূর্তি। ধ্যানমগ্ন। নিশ্চল, নির্বিকার। যেন পাথরেরই একটা অংশ। বিরাট হিমালয়ের অঙ্গে যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতি নগণ্য ধূলি-কণা। তবুও, সেই বিরাট-এরই অংশ।

সেই যোগাসীন মূর্তিকে অলক্ষ্যে প্রণাম করে চলে এলাম। কি জানি, আমার হৃদ্‌স্পন্দনের ক্ষীণ ধ্বনিতেও যদি তাঁর ধ্যান-স্তব্ধতায় বিঘ্ন আনে!

হঠাৎ মনে পড়ে সক্রেটিস্-এর জীবনের একদিনের কাহিনী।

এথেন্সবাসীরা যুদ্ধরত। সেনাদলে সক্রেটিস্ও আছেন। তাঁর এক সঙ্গী সৈনিকের মুখ দিয়ে প্লেটো বর্ণনা করছেন সেদিনের কথা: ভোরে উঠে দেখি সক্রেটিস্ তাঁবু থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একাগ্রমনে গভীর চিন্তা করছেন। দুপুর হল, তিনি তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। বিকাল গেল, সন্ধ্যা হল, রাত্রিও এল—তিনি তবুও সেই একই ভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন। আত্মস্থ। তার পর-দিন ভোরেও দেখা গেল তাঁর সেই একই ধ্যানস্তিমিত যোগমূর্তি। নিশ্চল, নিস্পন্দ। তারপর, প্রাতঃসূর্য উঠল। তাঁরও ধ্যান ভাঙ্‌ল। সূর্যবন্দনা করে তিনি ধীরচরণে চলে এলেন।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। এক মহামানবের সাধন-চিত্র। পাশ্চাত্য এথেন্সে। ভাবি, দেশ-কাল অতিক্রম করে আত্মসমাধির সেই চিরন্তন রূপ কি এখনও তেমনি রয়েছে!

৬

দ্বিপ্রহরের আহার সাঙ্গ করে কম্বল গায়ে ধর্মশালায় শুয়ে আছি। বাইরে এখনও বাদলের তেমনি মাতন চলেছে।

হঠাৎ শিশিরবাবু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি?

আবিষ্কারকের আস্ফালনে বলেন, ধরেছি! ঠিক ধরেছি এবার। বিস্কুটের টিনটা বার করুন। ঐটেই যত নষ্টের গোড়া। এতবার হিমালয়ে ঘুরেছি, বৃষ্টিতে তো এমন করে কখনও আটক করে রাখে নি। বুঝেছি, ঐ বিস্কুটের টিন-এর জন্যেই সে-ভদ্রলোকদের লোকপাল যাওয়া হল না। এখন আমাদের ঘাড়ে চেপে আমাদেরও বিঘ্ন ঘটাচ্ছে!

বললাম, অতএব কি করতে বলেন?

তিনি বলেন, টিন খুলে এখনি তার সৎকার করৎ। ভয় নেই, কিছু বাঁচিয়ে রাখব প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্যে।

কথামত কাজও করেন। ভোগের ভাগও পাই।

বিকালবেলা।

চা খেয়ে কম্বল-শয্যায় বসে ছ'জনে বই পড়ছি, আবৃত্তি করছি। সংস্কৃত স্তব। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও।

মধুময় লাগছে।

অকস্মাৎ তির্যক ভাবে একটি সূর্যরশ্মির স্বর্ণ-ফলক এসে কবিতার পাতায় বিঁধল।

দু'জনে ছুটে বাইরে এলাম।

আকাশের পশ্চিমকোণে মেঘ ছিঁড়েছে। অস্তমান সূর্যের রাঙা আবিরে মেঘের ঝালর রক্তিম হয়ে উঠেছে।

বর্ষণ-মুখরা প্রকৃতি ক্ষান্ত শান্ত হয়েছে।

আকাশের আলো মনে আশার দীপ জ্বালাল।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, দেখুন, ঠিক ধরেছিলাম কিনা?

বলি, অকাট্য প্রমাণ! এ নিয়ে একটা থিসিস্ লিখুন!

৭

এই গোবিন্দঘাটে এর পরের বছর একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল।

সেবার এসেছিলাম একা। তবুও, এখানে পৌঁছে একান্তে নির্জন স্থান পেলাম না। সেটা জুন মাস। যাত্রার সময় সবে শুরু হয়েছে। যাত্রীর

প্রথম জোয়ার—বেশ ভিড়। বদরীনাথের যাত্রীরাও এসে আশ্রয় নিচ্ছে। গুরুদ্বারটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই লম্বা টানা দালান-ঘরটির একপাশে আশ্রয় নিয়েছি। সারি সারি অন্য যাত্রীদের বিছানা পাতা। তারই একটির উপরে এক শিখ ভদ্রমহিলা পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করছেন। সুশ্রী চেহারা। গৌর বর্ণ। টানা চোখ। টিকল নাক। মুখে স্নিগ্ধ দীপ্তি। উজ্জ্বল কান্তি ক্লান্তিতে ঈষৎ ম্লান হয়েছে। বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমাকে অভিবাদন করলেন, নমস্তে বাবুজি, কোথা থেকে আসছেন? হেমকুণ্ডে যাবেন বুঝি?

বললাম, ইচ্ছা আছে।—প্রকাশ করলাম না যে এ-পথ আমার অজানা নয়।

তিনি সেইদিনই সেখান থেকে অল্প আগে ফিরেছেন। অপরিসীম ক্লান্ত। বললেন, পথ বড় কঠিন। বরফও এখন অনেক রয়েছে। চলে যান, কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু মন ভরে যে আনন্দ নিয়ে এলাম তাতে শরীরের এ-কষ্ট কিছুই মনে হয় না, মনে থাকেও না। সত্যিই, এ-সব দেবতার স্থান। আমার ঐ দেবতাকে নিয়ে দর্শন করিয়ে এলাম।—বলে জানালার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

দেখি, জানালার কাছে—তাক্-এর মত জায়গাটিতে—ছোট একটি বাঁধানো ছবি। শ্রীকৃষ্ণের। ত্রিভঙ্গমুরারি, বংশীধারী। কাগজে রঙীন্ ছাপানো ছবি; কিন্তু মূর্তিটি সুন্দর। বাঁধানো কাঁচের উপর চন্দনের ফোঁটা।

ছবির নীচে ছোট পুষ্পপাত্রে কয়টি ফুল। পাশেই ধূমায়িত সুগন্ধি ধূপ।

বললেন, দেখছেন বাবুজি—কি হাসিভরা মুখখানি! কানাইয়া আমার সন্তোষ পেয়েছেন যে!

চুপ্ করে সেই ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। কপোল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে।

ভক্তিবিগলিত ধারা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, সুন্দরতর কে? ঐ ছবির দেবতা, না এই মানুষ-ভক্ত? অথবা, দুয়েরই মধ্যে একেরই প্রকাশ?

কিন্তু, আশ্চর্য। শিখ-মহিলা—শ্রীকৃষ্ণের ছবি কেন?

প্রশ্ন করব কিনা ভাবছি এমন সময় তাঁরই এক সঙ্গী উপস্থিত হলেন। গেরুয়াবাস একটি সাধু। সঙ্গে আরও কয়েকটি মহিলা-যাত্রী। সম্ভবতঃ সবাই পাঞ্জাবী হিন্দু—শিখ নয়। সাধুটি এসেই বললেন, মাতাজি, কত

আগে একলা চলে এসেছেন আপনি! আমি এঁদের নিয়ে পেছিয়ে পড়েছিলাম। বাঃ, আপনি তো গুছিয়ে বসে গেছেন!

মাতাজি মৃদু হেসে বলেন, একলা কোথায়? আমার কানাইয়া আমার হাত ধরে নিয়ে চলে এল। এখন ওঁকে বিশ্রাম করাচ্ছি। দুদিন পথে কষ্ট হয়েছে কম?

ভাবটা এমনি যেন শ্রীকৃষ্ণের সজীব পদযুগল পেলে এখনি সব ফেলে পদসেবা করতে বসেন!

অন্যান্য যাত্রী এসে হাজির হয়। প্রায় সবই বদরী-যাত্রী। ধর্মশালার শিখ ভদ্রলোকটি এসে আমাকে বলেন, চলুন, আপনার এই ভিড়ের মধ্যে অসুবিধে হবে, নীচের একপাশের ঘরটিতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে এলাম।

বুঝি, আমার অসুবিধার কথা নয়, অন্য যাত্রীদেরও স্থান দেওয়ার প্রয়োজন। চলে আসি।

ঘন্টা দুই পরের কথা।

সেই সাধু যাত্রীটি ত্রস্ত হয়ে এসে জানান্, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। মাতাজির কাছে শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি ছিল—সেটি পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্য হয়ে বলি, সে ছবি তো আমাকেও তিনি দেখাচ্ছিলেন—তাঁরই বিছানার ধারে জানালার কাছে রেখেছিলেন। সেখান থেকে যাবে কোথায়, নেবেই বা কে?

তিনি বলেন, এই একটুকু আগে আমরা নীচে এসেছিলাম—সব মুখ হাত ধুতে। আধ ঘণ্টাও হবে না। ফিরে গিয়ে দেখি—সবই ঠিক আছে, নেই শুধু সেই ছবিখানি।

জিজ্ঞাসা করি, ওখানে তখন আর কেউ ছিল না?

বলেন, অপর যাত্রী কয়েকজন ছিল,—কিন্তু তারা ছবি সম্বন্ধে জানে না বলে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনি।

তিনি বলতে থাকেন, মাতাজি কেবলি কাঁদছেন, কোনও সান্ত্বনাই তাঁকে দিতে পারছি না। আমরা জানি, এ-মূর্তি যে তাঁর প্রাণ-স্বরূপ। কি করা যায় বলতে পারেন? সব জায়গায়, সবার কাছে অনুসন্ধান করছি—কেউই কিছু বলতে পারছে না।

আমিই বা বলব কি, বুঝি না।

তবুও উপরে যাই তাঁর সঙ্গে। সেখানে নতুন যাত্রীর জনতা দেখি।

সেই জানালার কাছে দেখি, সবই তেমনি আছে। নেই শুধু ছবিটি। আর, সেই ধূপশিখাটিও নেই, নিবে ছাই হয়ে গেছে।

একটি ছোট্ট ছবি—কিন্তু কি বিরাট যেন শূন্যতা রেখে গেছে!

মাতাজির মুখের দিকে অতি সঙ্কোচভরে তাকালাম,—মনে হচ্ছিল, যেন সদ্য পুত্রহারা জননীর মুখের দিকে তাকাতে যাচ্ছি। কিন্তু, এ কী অপরূপ রূপ! শয্যা-প্রান্তে বসে জানালার সেই শূন্যস্থানের প্রতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন—যেন পাষাণ-মূর্তি। অঙ্গের কোথাও কোন স্পন্দন নেই। আকুল ক্রন্দন নেই। শুধু দুই নয়ন থেকে অবিরল ধারা নেমে আসছে, যেন ধ্যানস্তব্ধ হিমাচলের বুকে তুষার-গলা ঝরণার ধারা।

পরদিন, সাধুজির কাছে আবার খবর নিয়েছিলাম। ছবির সন্ধান মেলে নি; মাতাজিও জলস্পর্শ করেন নি।

ভাবি, হৃদয়-ভরা অত প্রেম, তবুও এ-রিক্ততার অনুভূতি কেন?

কিন্তু, এ-তো এক নারীর কথা!

দেখেছিলাম, এক সত্যিকার সাধুকে এমনি আর এক পরিস্থিতিতে।

গঙ্গাসাগর চলেছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেজদাদাকে কেন্দ্র করে বড় একটি দল হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র স্টীমারেরও আয়োজন হয়েছে। মেজাদাদার যে-বন্ধুটি স্টীমারের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি এসে জানালেন, একজন সাধুও যেতে পারেন সঙ্গে। গত বছর এই বন্ধুটি কৈলাস-মানস-সরোবর গিয়েছিলেন, সেইখানে তিব্বতের পথে এই সাধুটির সঙ্গে তাঁর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়—দু-একটি অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল সেই সময়ে। এখন তিনি কলকাতায় এসেছেন গঙ্গাসাগর দর্শনের উদ্দেশ্যে।

সকলেই বললাম, ভালই তো। সত্যকার সাধু-সঙ্গ। সৌভাগ্যের কথা।

স্টীমারেই প্রথম পরিচয়। নাগা সন্ন্যাসী। মাথা-ভরা জটা। রুক্ষ রূপ। কিন্তু মুখ-ভরা হাসি। হাতে একটি শঙ্খ। বয়স বেশী বলে মনে হয় না। শহরে এসেছেন, তাই কৌপীন পরা। গঙ্গাসাগরের প্রসিদ্ধ শীত, তবুও গায়ে কিছু নেই। নেমে এসেছেন হিমালয় থেকে। নেপালের এক নিভৃত

অঞ্চলে তুষার-রাজ্যে গুম্ফায় থাকেন। বলেন, সে-ও এক অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কুম্ভকর্ণ পর্বত্। দুর্গম কঠিন পথ।

তারপর, ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি টেনে বলেন, চলো, দেখে আসবে। হিমালয়ের মধ্যে অমন স্থান কমই আছে। প্রকৃত শিবক্ষেত্র।

স্টীমারে দুদিনের মধ্যেই বেশ আলাপ হয়। স্বল্পভাষী। সরল মন। শিশুর হাসি। সস্নেহ ব্যবহার। অথচ, সর্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, উদাসীন। খাওয়া-পরা-শোওয়া—কোন কিছুরই যেন প্রয়োজন নেই। সারাক্ষণই ধ্যান চলেছে। বেশ লাগে তাঁর সঙ্গ-সুখ। কাছে গিয়ে বসলে, কেন জানি না, মনে একটা তৃপ্তি বোধ হয়—যেন গঙ্গায় অবগাহন করে উঠছি।

তাঁর নির্বিকার ভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম, গঙ্গাসাগরে পরবর্তী একটি ছোট ঘটনায়।

আমাদের সঙ্গে আর একজন হিমালয়বাসী সাধু ছিলেন। তিনি বাঙালী। গেরুয়াবাস। আচারনিষ্ঠ। সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ। বিধিমত জপতপ পূজাদি শুদ্ধভাবে পালন করেন।

গঙ্গাসাগরে একদিন এই দুই সাধু সাগরের চরে রয়েছেন;—আমরা সেদিন স্টীমারে আছি। দুপুরে তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হয়েছিল এক সেবা-কেন্দ্রের উপর।

সন্ধ্যাবেলায় স্টীমারে ফিরে এসে বাঙালী স্বামীজি গল্প করছিলেন। এক সময়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজ একটা মজা হয়েছে। আপনারা বুঝি আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন? আজ তীর্থ-উপবাস, তাই আমি কিছু গ্রহণ করি নি। তীর্থে এসে এ-সব নিয়ম মানা উচিত। কিন্তু নাগা সাধুটিকে খাইয়ে দেওয়া গেছে—শুধু খাওয়ানো নয়—একেবারে অন্ন-পাক—খিচুড়ি! তিনি প্রথমে বলেছিলেন, তাঁর এ-সবের কিছুই দরকার নেই;—খেতেও চান নি। কিন্তু সেবা-কেন্দ্রের ভদ্রলোকটি বিশেষ পীড়া-পীড়ি করতে লাগলেন—আমিও তাতে যোগ দিয়ে দিলাম। নাগা স্বামীজি তারপর আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অম্লানবদনে খেয়ে নিলেন। —তীর্থে এসে একেবারে অন্নভোজ!—বলে উচ্ছ্বসিত হাসতে থাকেন।

পরিষ্কার বুঝি, এই খাওয়া না-খাওয়ায়, তীর্থক্ষেত্রে এ-সব বিধি-নিয়ম পালনে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু, বাঙালী স্বামীজির দৃষ্টি-ভঙ্গী আমার অন্তরে কোথায় যেন ব্যথা জায়গায়।

গঙ্গাসাগরে পৌঁছুবার কিছু আগে হঠাৎ স্টীমার দাঁড়িয়ে গেল। জল কম। অথচ, চারিদিকেই দেখি, শুধু জল আর জল। সারেঙ্ বলে, এই জলের অল্প নীচেই চর পড়েছে। জল না বাড়লে এগুনো যাবে না! অতএব, দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

মেজদাদা সাধুজিকে বলেন, স্বামীজি, কই আপনার শাঁখ কই? জোরসে বাজান, গঙ্গায় জল আনিয়ে দিন। স্টীমার আটকে গেল যে! ভগীরথের কথা মনে আছে তো?

হাসিভরা মুখ নিয়ে সাধু সত্যিই উৎসাহিত বালকের মত উঠে দাঁড়ান। দেখি, শাঁখ হাতে স্টীমারের উপরে খোলাছাদে গিয়ে ওঠেন। একটা পা একটু এগিয়ে দিয়ে আর এক পা একটু পিছনে রেখে বুক চিৎ করে দাঁড়ান। মাথা পিছন দিকে কাত করে আকাশের দিকে মুখ একটু তোলা। দুই হাতের মুঠোয় শাঁখ ধরা। শাঁখে ফুঁ দিলেন। শঙ্খধ্বনি উঠল। গভীর, গম্ভীর। একটানা। চারিদিকে গঙ্গার বিস্তীর্ণ বারিরাশির উপর, দিক্‌দিগন্তে, আকাশের প্রান্তে প্রান্তে সে-ধ্বনি ছুটে চলে; চারিদিক শঙ্খনিনাদে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।—সারা বিশ্ব যেন শুধু একটা জমাট ধ্বনি-রূপ! মনে পড়ে, হিমালয়ের হিম-রাজ্যের উচ্ছল চঞ্চল নির্ঝরিণীর হঠাৎ যেন জমে স্তব্ধ বরফ-হয়ে-যাওয়া!

সাধু হাসিমুখে ধীরে ধীরে নেমে আসেন।

দেখতে দেখতে গঙ্গার জল বাড়ে, স্টীমার দোলে। সারেঙ্ জানায়, জোয়ার এসেছে!

সহজ-বুদ্ধিতে সবই বুঝি। গঙ্গায় জোয়ার আসে, ভাঁটা পড়ে। দৈনন্দিন ঘটনা। তবুও, অকারণেই মনের শুষ্ক বেলাভূমিতে একটা অনাবিল আনন্দ-স্রোতের ঢেউ খেলে যায়।

গঙ্গাসাগরের মেলা।

সেদিন যোগের স্নান। বিপুল জনতা।

মেলার একপ্রান্তে দুটি হোগলার ঘরে আমাদের আশ্রয়-স্থান। সকালেই স্নান সেরে মন্দিরে দর্শনাদি হয়েছে। এখন যাত্রীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরছি; ঘুরে ফিরে মন্দিরেও আবার দর্শন করে যাচ্ছি।

সঙ্গে সাধুজি আছেন। তাঁকে সাবধান করে দিয়েছি, দেখবেন, যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। এই ভিড়ে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাব না।

মনে মনে হাসি পায়। সাধু,—সর্বস্ব-ত্যাগী! তাঁরও আবার হারিয়ে যাবার আশঙ্কা করি!

হারালে ক্ষতি নেই জানি। কিন্তু দায়িত্ব আছে—কলকাতায় তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

হঠাৎ একটা ভীষণ ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি; প্রকাণ্ড জনতার এক বিপুল স্রোত এসে পড়ল; যারা দল বেঁধে একসঙ্গে যাচ্ছিলেন, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেন। কোনমতে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। সাধুজিকে দেখতে পাই না। একধারে একটু উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে তাকাতে থাকি। নজরে পড়ল,—ঐ যে! মাথার উপর একরাশ জটার ভার, একটুকরা কাপড়ে বাঁধা আছে—যেন সাদা শিরস্ত্রাণ, ছোটখাটো সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকেই খুঁজছেন। কোন রকমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। কাছে যেতে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরেন। যেন, কতকালের ছাড়াছাড়ি! হেসে বলেন, আর হাত ছাড়ছি না। এমনি করেই দু'জনে যাব।

ভাবি, কত দূর? কোথায়?

সাধু বলেন, চলো। আবার একবার মন্দিরে যাব; একটু প্রয়োজন আছে।

মন্দিরের কাছে এসে বলেন, না, ওদিকে যাত্রীদের সঙ্গে নয়—ভেতরে যাব।

একটি প্রকাণ্ড চাতালের উপর কপিল ঋষির মূর্তি। যাত্রীরা সকলে সেই চাতালের নীচে সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করছে। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়,—ঠেলাঠেলির মধ্যে যতটুকু দাঁড়ানো সম্ভব! একটা প্রবহমান প্রবল জনস্রোত।

সকালে দর্শনে যখন এলাম, মেজদাদা সঙ্গে ছিলেন। ব্যবস্থা-মত পিছন দিক দিয়ে চাতালের উপর উঠে ভাল ভাবে একান্তে নিশ্চিন্ত মনে দর্শনাদি হয়েছিল।

কিন্তু, এখন সেখানে প্রবেশ করব কি করে ভাবি। কর্তৃপক্ষের একজনকে সাধুর উদ্দেশ্য জানালাম। কি জানি কেন, পথ ছেড়ে দিলেন, বললেন, দেরি করবেন না, চট করে দর্শন করেই চলে আসবেন।

চাতালের উপর উঠে দাঁড়িয়েছি। নীচে যাত্রীদের উন্মত্ত কলরোল চলেছে। ফল-ফুল ইত্যাদি সবলে নিক্ষেপ করে মূর্তির দিকে ফেলছে।

পুষ্প-বৃষ্টি জানি, ফল-বৃষ্টি এই প্রথম দেখলাম। পুরোহিতদের নিষেধ মানে না। অঞ্জলি ও নৈবেদ্যের প্রকাণ্ড স্তূপ জমছে,—মূর্তি প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। দু'জন পূজারী সারাক্ষণ সেই সব এক পাশে সরিয়ে ফেলছেন,—আবার দেখতে দেখতে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। অবাক হয়ে দেখছি, ভক্তি-বিহ্বল যাত্রীর সে কি উগ্র ভক্তি-নিবেদন; মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড নারকেল পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলছে।

কোনরকমে আত্মরক্ষা করে সাধুজিকে বললাম, চলুন, এবার নেমে পড়ি।

তিনি একজন পূজারীকে ইঙ্গিত করে কাছে ডাকলেন, কি বললেন, কোলাহলে তাঁর কথা আমার কানে এল না। শুধু দেখলাম, মাথার জটা-বাঁধা কাপড়টুকু খুলে একটি শিলাখণ্ড বার করে পূজারীর হাতে দিলেন। শিলাটির আকৃতি অনেকটা কৈলাস-শিখরের মত;—লিঙ্গাকৃতি, মাথার উপরে স্বর্ণাভ, অপর অংশ কৃষ্ণবর্ণ—সর্বাঙ্গে চক্রাকার রেখা।

পুরোহিত শিলাখণ্ডটি নিয়ে মূর্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়ে সেখানেই রেখে দিলেন।

যাত্রীর ভিড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। পূজারীরা সকলেই তাদের পূজার্চনা নৈবেদ্যাদি নিয়ে শশব্যস্ত।

সাধুজিকে বলি, চলুন, এবার নেমে যাই। আর দাঁড়ালে নারকেলের আঘাতে মাথা ফেটে যাবে।

তিনি আবার সেই পূজারীকে ডাকেন, বলেন, কই? আমার ওটা ফেরৎ দিন্!

পুরোহিত আশ্চর্য হন; ফেরৎ? সে-কথা তো বুঝি নি। এখন আর ঐ ছোট্ট শিলাটুকু ওখান থেকে কি করে পাওয়া যাবে? ওর ওপর যে বিরাট স্তূপ জমে গেছে!

সাধুর অনেক অনুনয়ে মূর্তির কাছে তিনি ফিরে যান; প্রায় এক কোমর ফুল-ফলের স্তূপের মধ্যে হাতড়াতে থাকেন। এদিকে ফল-ফুলের অবিরাম বৃষ্টি চলেছে। সেখানে দাঁড়ানোই অসম্ভব। তিনি ফিরে আসেন, বলেন, ও-আর পাওয়া সম্ভব নয়। উনি এখানেই থাকুন।

সাধুর মুখ ম্লান হয়ে যায়। হাতের মুঠা থেকে আরও একটি শিলাখণ্ড বার করে বলেন, না, তা হবার নয়। রাখতে চান তো এইটে রেখে দিন। ওটা আমার ফেরৎ চাই-ই। ও যে আমার শিউজি আছেন। নিয়ে আসুন আপনি।

পূজারী অক্ষমতা প্রকাশ করেন, ব্যস্ত হয়ে বলেন, অন্য কাজ রয়েছে আমার, দেখছেন না? আমার কাজ করতে দিন। আপনারা আর দাঁড়াবেন না, মাথায় আঘাত লাগবে—নেমে যান—ও আর পাওয়া যাবে না।—তিনি তাঁর কাজে চলে যান। না গিয়ে উপায়ও নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। কিন্তু, মিথ্যা আশা,—ঐ ছোট্ট শিলাখণ্ডটুকুর উদ্ধারের কোন উপায় বা সম্ভাবনাই দেখি না। সাধুজির হাত ধরি। বলি, চলুন, নেমে যাই।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখি, চক্ষুদুটি লাল হয়েছে, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। কি নিদারুণ করুণ মূর্তি!

একরকম জোর করেই হাত ধরে তাঁকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এলাম।

তিনি কঠিনকণ্ঠে বললেন, আমার শিউজিকে না নিয়ে আমি যাব না। কৈলাস থেকে নিয়ে এসেছিলাম, গঙ্গাসাগরে স্নান ও স্পর্শ করিয়ে আমার কাছে রাখব বলে। তুমি চলে যাও—আমি ওকে ছাড়ব না।

চমকে উঠি। এ যে শোনা কথা—'আমি ওকে ছাড়ব না, কখনই ছাড়ব না—তোমরা চলে যাও, চলে যাও!'

মনে পড়ে, এক নিঃস্ব বিধবার একমাত্র সন্তানকে তাঁর বাহুপাশ ছিঁড়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম,—এ যে সেই আকুল বিলাপ-ধ্বনি!

সাধুর হাতখানি হাতের মধ্যে চেপে ধরি। অনুভব করি, অবরুদ্ধ রোদনে তাঁর সারা অঙ্গ কেঁপে উঠছে।

মনে মনে ভাবি, এত বড় সাধু, সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী, কঠোর তপস্বী—তাঁরও হারাবার ধন আছে, ব্যথা পাবার অন্তর আছে!

কি বোঝাব বুঝি না। তবুও অকরুণ তর্ক তুলি, আপনার শিউজি কি শুধু ঐ শিলাখণ্ডেই আছেন? নাই বা রইল ওটা আপনার কাছে—তাতে দুঃখ করবার কি আছে?

তিনি অশ্রুভরা চোখে আমার পানে তাকাতে থাকেন। সত্যই, দেখে দুঃখ হয়। প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, বলি, আপনি তো সব কিছু করেছিলেন, মাথায় বয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনিই তো আপনার কাছে রইলেন না। আমার কি মনে হয় জানেন? শিউজির ইচ্ছা ছিল—আপনি তাঁকে শুধু এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবেন—হিমালয়ে না থেকে তিনি সাগর-সঙ্গমেই থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে-ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করেছেন। তাঁর

যদি আবার সাধ যায় হিমালয়ে ফিরে যেতে—আপনারই কাছে ঠিক তিনি ফিরে যাবেন। এ বিশ্বাস কি আপনি রাখেন না ?

তিনি নির্বাক্। চোখ দুটি শুধু সাক্ষ্য দেয়—অন্তরে কি গভীর বেদনার আলোড়ন চলেছে।

মেজদাদাকে গিয়ে ঘটনাটি বলি। সাধুজি তাঁকেও করুণভাবে জানান, ওটি আমার ফেরৎ চাই-ই।

গঙ্গাসাগর ছাড়ার আগে, কর্ত্তৃপক্ষদের মেজদাদা বিশেষ করে অনুরোধ করে এলেন, তাঁরা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যদি শিলাটির পুনরুদ্ধার হয়।

স্টীমারে ফেরার পথে সাধুজি সারাক্ষণই ধ্যানরত থাকতেন। তাঁর সেই হাসিভরা মুখে এক নিদারুণ বেদনার ছায়া দেখতাম।

কলকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল। স্টীমার সেখানে থামল। প্রণাম করে বিদায় নিলাম, হাত ধরে বললাম, এখনো তো তিন-চারদিন এদিকে থাকবেন, একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে ? এর মধ্যে হয়তো গঙ্গাসাগর থেকে খবরও এসে যাবে।

তিনি ম্লান হেসে বলেন, চেষ্টা করব। তুমি চলে এসো কুম্ভকর্ণে।

দু'দিন পরেই শিলাখণ্ডটি ফিরে এল।

সাধুজিকে তখনই সানন্দ-সংবাদটি পাঠান হল।

কিন্তু সংবাদ পেয়েও তিনি আর এলেন না। কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন !

৮

ভোর হতেই গোবিন্দঘাট ছাড়লাম। এখান থেকে ঘাংরিয়া সাত মাইল।

ধর্মশালা থেকে বার হয়েই অলকানন্দার উপর পুল। লোহার তারে ঝোলা পুল। সংস্কারের অভাবে অবস্থা শোচনীয়। পায়ের তলায় কাঠগুলি জীর্ণ, কয়েক জায়গায় খসে পড়েও গেছে ;—ফাঁক দিয়ে পনেরো-কুড়ি হাত নীচে নদীর উদ্দাম স্রোত চোখে পড়ে, দেখে মাথা ঘোরে। দু'দিকে রেলিঙ্ নেই, পুলের দুইদিকের ঝোলা তার ধরে অতি সাবধানে পার হতে হয়। চলার সঙ্গে সঙ্গে পুলও দুলতে থাকে। সতর্কতা আমাদেরই, পাহাড়ীরা

নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে পার হয়। প্রকাণ্ড বোঝা নিয়েও। অভ্যাসে সবই হয়।

পুল পার হয়ে খানিকটা চড়াই। Zigzag করে পথ উঠেছে। কুলীরা পাকদণ্ডী অর্থাৎ 'শর্ট-কাট্' করে দেখতে দেখতে উঠে যায়। আমরা পথ ধরেই চলি, কেননা জানি, অনভ্যস্ত চরণে পাকদণ্ডী দিয়ে ওঠায় অযথা ক্লান্তি বোধ হয়। যেটুকু সময় বাঁচে, পাকদণ্ডী-শেষে দম্ নিতে সে-সময় নিঃশেষ হয়।

চড়াই-এর উপর থেকে নীচে অলকানন্দা ও ভুন্দর নদীর সঙ্গম সুন্দর দেখায়। দূরে অলকানন্দার অপর পারে বদরীনাথের যাত্রাপথ। পাহাড়ের গায়ে কে যেন সরল রেখা এঁকে গেছে। তারই উপর সচল যাত্রীর দল। দলে দলে চলেছে—যেন পিপীলিকা-সারি।

চড়াই-শেষে সোজা পথ। দেখতে সোজা হলেও ধীরে ধীরে পথ উঠেছে—চলার মধ্যে ধরা পড়ে। তবে, চলার কষ্ট নেই। নতুন-তৈরী প্রশস্ত পথ। ভয়েরও কোন কারণ নেই।

দুই মাইল এসে একটি গ্রাম।

বেলা হয়ে গেছে। দু'দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। সকালের সোনালী রোদে বনস্থল ঝল্‌মল্ করে।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। গ্রামের নাম পুগ্‌গাঁও। শিশিরবাবু মন্তব্য করেন, নিশ্চয় পুণ্যগ্রাম। গ্রামের মধ্যখানে পাথর-বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বর। তার চারিদিকে—পথের দুইপাশে—সারি সারি বাড়ি। অথচ, কোথাও কারো সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুরী। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকে না, মুরগী পর্যন্ত ঘোরে না।

শিশিরবাবু বলেন, দু'দিন বৃষ্টির পর আরামে বোধ হয় সব ঘুমুচ্ছে।

আশ্চর্য লাগে। একটা লোকেরও দেখা নেই! একটা ছোট ছেলেও কাঁদে না!

এ কি! দরজায় যে সব বাইরে থেকে শিকল-টানা!

সঙ্গের পাহাড়ী সঙ্গী সমস্যার সমাধান করে। বলে, এ-গ্রামে এখন কেউ নেই। চার মাইল ওপরে আর একটা গ্রাম আছে, পথেই পড়ে। এখন গ্রামসুদ্ধ সবাই সেখানে আছে। দিন কয়েক পরে আর একটু শীত পড়লে আবার সবাই এখানে নেমে আসবে। তখন ওপরের গ্রামের ঘর-বাড়ি সব বন্ধ থাকবে। গ্রাম দুটি, কিন্তু গ্রামবাসী এক। একটা গ্রীষ্মাবাস, অপরটি শীতাবাস।

বেশ লাগে। মানুষ নেই, অথচ মানুষের ছেড়ে-যাওয়া সব জিনিস-পত্র।

ঘর-বাড়ি, উঠানে ধান-ভাণার উদূখল, ঘরের চালে লতার জালি—বড় বড় লাউ, কুমড়া, ক্ষেতে ফসল,—আলুর চাষ। গাছে শিম্ ঝুলছে, লেবু গাছে ফল ধরেছে। জন-মানবের সাড়া নেই, অথচ চারিদিকেই জীবন্ত মানুষের সাক্ষ্য। তার আহারের আয়োজন, বসবাসের ব্যবস্থা।

হঠাৎ নজরে পড়ে, উঠানের এককোণে চটা-ওঠা ভাঙা ছোট্ট একটি রঙীন কাঠের খেলনা। ধূলি-মলিন অবহেলিত।

নগণ্য নির্জীব। তবুও, মনের পটে কি জীবন্ত ছবি-ই না আঁকে!

মনে পড়ে, ক'দিন আগেকার এক ছবি।

সাঁওতাল পরগণা। ছুটির দিনগুলি কাটাচ্ছি। দুপুর বেলা। অলস অবসর। আহার শেষে নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে এসে বসেছি। বাড়ির ছোট্ট নাতিটি সবে হামা ছেড়ে হাঁটুতে শিখেছে। টল্‌মল্ করে চলে। চলায় আনন্দ পায়। হাসির ঝলকে আনন্দ উথলে পড়ে। টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়ায়। ছোট টেবিল থেকে বই টেনে ফেলে। দোয়াত-কলম ধরতে যায়। হেসে বারণ করলে জল-ভরা গেলাসের উপর নজর পড়ে। খপ্ করে ধরে টেনে ফেলে দেয়। জলে ভিজে তার পায়ের লাল জুতা গাঢ় লাল হয়ে ওঠে। ভিজা জুতা পা থেকে খুলে তাকে কোলে তুলে নিই। জান্‌লার কাছে নিয়ে দাঁড়াই। বাইরে বাগানে রঙ্-বেরঙের ফুল দেখাই। অমনি বাইরে যাওয়ার বায়না ধরে। ফুল, ফুল, ফুল—চাই। বিছানায় বসিয়ে বই-এর ছবি দেখাই। গল্প করি—'নদী, গাছ, পাখী, পাহাড়, বরফ—তুমি চলেছ ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ করে, আমি চলেছি পায়ে হেঁটে—লাঠি হাতে—চলেছি, চলেছি—অ-নে-ক দূ-র—'

মুখের পানে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে শোনে। চোখের পাতা কাঁপতে থাকে—ধীরে ধীরে চোখ ভরে ঘুম নামে। তন্দ্রা-কাতর শান্ত ক্ষুদ্র দেহখানি শয্যা 'পরে এলিয়ে পড়ে।

কিছু পরে তার মা এসে কোলে তুলে নিয়ে যান।

একা চুপ করে শুয়ে আছি। হঠাৎ নজর পড়ে তার ফেলে-যাওয়া জুতাটির উপর। ছোট্ট লাল 'জুতুয়া'। কচি কচি পা থেকে খুলে ফেলা। সেই টল্‌মল্ চলা। ফেলা-ভাঙ্গা চপলতা! খিল্‌খিল্ হাসি। শিশুর সৌরভ!

সেই সামান্য শূন্য নিদর্শনের মধ্যে নিস্তব্ধ গৃহখানি যেন আবার প্রাণময় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আজ প্রভাতে বিরাট হিমালয়ে পরিত্যক্ত গ্রামের একটি নগণ্য ক্রীড়ণকও তেমনি প্রাণ-চঞ্চল মুখর হয়ে উঠল।

গ্রাম ছেড়ে পথ এগিয়ে চলে। কখনো পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে, কখনো বা নদীর ধার ধরে, কখনো বা ছায়াশীতল বনের মধ্য দিয়ে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট লতানে গাছে স্ট্রবেরি ফলেছে। লাল রঙের ছোট্ট ছোট্ট ফল। তুলে সংগ্রহ করি—সঙ্গীদের দিই, নিজেও খাই। অম্ল-মধুর। অম্ল-রস। তবুও, পথ-ক্লান্ত পথিকের রসনায় অমৃতের আস্বাদ আনে।

নির্ঝরিণীর উপকূলে বিচিত্র উপলখণ্ড। সম্মুখে সুদূর আকাশে তুষার-ধবল গিরিশিখর। নদীর দুই তীরেই আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। পাহাড়ের মাথা থেকে বিক্ষিপ্ত পাথরের সোপান বেয়ে মাঝে মাঝে ঝরণা নেমেছে, ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিলিত হতে।

চার মাইল এসে আবার একটি গ্রাম। ভুন্দর নাম।

গ্রামে প্রবেশ করবার পুর্বেই লোকালয়ের পরিচয় পেলাম।

প্রকাণ্ড ভুটিয়া কুকুর তারস্বরে আতঙ্কময় অভ্যর্থনা জানাল। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে পথের পাশে গাছের আড়ালে থম্‌কে দাঁড়াল। সকৌতুক, সলজ্জ দৃষ্টি। সারা পৃথিবীর সমগ্র শিশু জাতির সেই চিরন্তন স্বভাব-সুলভ কৌতূহল।

গ্রামের ভিতর পথ অতীব অপরিচ্ছন্ন, বিকট দুর্গন্ধে ভরা। গত দু'দিন বৃষ্টির ফলে পথের কাদায় ও মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনায় নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির চারিদিকের এত অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে মূর্তিমান অসুন্দর।

হিমালয়ের শুধু এই গ্রামখানিরই এই বিকৃত পরিচয় নয়। পাহাড়ী গ্রাম-মাত্রেই সাধারণতঃ অতীব অপরিচ্ছন্ন। প্রতি গ্রামে প্রবেশ করেই দুঃস্থ গ্রামবাসীদের দুর্বহ জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখে যেমন মনে দুঃখ জাগে, তেমনি চোখে ঠেকে তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মজ্জাগত অপরিচ্ছন্নতা। সাধারণতঃ পাহাড়ীদের সুশ্রী চেহারা। কিন্তু সারা অঙ্গে নোংরা-মাখানো। ছোট ছেলে-মেয়েগুলির চোখ-ভরা পিচুটি জমে আছে, নাক বেয়ে ধারা নেমে আসছে। তবুও তারই মধ্যে নজরে পড়ে টুক্‌টুকে লাল ফোলা ফোলা গাল—যেন কাদা-মাখা ডালিম ফল।

বেশভূষা—যত স্বল্পই হোক না কেন—অত্যন্ত মলিন। যেমন শরীরের

তেমনি বেশভূষারও জলের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক। স্নান করা—একটা বিশেষ অনুষ্ঠান-পর্ব। অনেক জায়গায়—বিশেষতঃ যেখানে শীত বেশী—কল্পনার অতীত।

বেশ মনে পড়ে, সে-বছর কৈলাস-মানস-সরোবর থেকে ফেরার পথে তিব্বতে তাক্‌লাকোট গ্রামে এসে পৌঁছেছি। গাঢ় নীল আকাশ ভরে চন্‌চনে রোদ উঠেছে। তবুও কন্‌কনে হাওয়া বইছে। ক'দিন তিব্বতের নিদারুণ শীতে—এক মানস-সরোবর ছাড়া—আর কোথাও স্নান করা হয় নি। রৌদ্রের উত্তাপ দেখে রোদে বসে ভাল করে তেল মাখলাম ; ঝরণার অতি-শীতল জলে স্নান শুরু করলাম।

আমাদের স্নান দেখতে চারিদিকে তিব্বতীদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা ! যেন শ্রীক্ষেত্রে স্নান-যাত্রা-দর্শনের সমারোহ ! আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে, এমনি অবাক্ হয়ে দেখে, মনে হয়, ভাবে,—এরা করে কী !

সে তো শীত-প্রধান দেশে স্নানের কথা। জল-আতঙ্ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু, এই গ্রামবাসীদের অপরিচ্ছন্ন জীবন-যাত্রার কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব। অর্থের অনটন এর মূলগত হেতু নয়। অপরিচ্ছন্ন ধনীও দেখেছি, আবার দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব দেখেছি। নির্ধন সাঁওতালদের গ্রামগুলি তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এখানেও হিমালয়ে তার প্রমাণ পাই সর্বত্যাগী শিক্ষিত ব্রহ্মচারী বা সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র কুটিরে। ঘরের মেঝেতে ধূলা জমে নেই ; সামান্য অঙ্গাবরণ, একটি কমণ্ডলু, লোটা, কম্বল—ঘরের মাঝখানে ধুনি—সবই নির্মল, পরিচ্ছন্ন। নিত্যস্নাত তনুও স্নিগ্ধোজ্জ্বল। দেবতার মন্দিরের মধ্যেও তো দেখেছি জল-ধৌত মার্জিত বিশুদ্ধ পরিবেশ, মানুষেরই যত্নে ও প্রচেষ্টায়। অথচ, মন্দিরের বাইরেই সেই মানুষেরই আবাস-গৃহে কি জাল-জঞ্জাল-ভরা কলুষ মূর্তি ! যেন মানুষের গৃহে দেবতার স্থান নেই, মানুষের দেহে দেবতার মন্দির নেই !

হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রামগুলির এই অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্নতা মনকে পীড়া দেয়।

আজ সকালে কিন্তু এই গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া অনুভব করলাম। কেউ কথা বলে না, প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না। কেমন যেন থম্‌থমে ভাব। আশ্চর্য ! এমন তো আর কোথাও দেখি নি !

পাহাড়ী সঙ্গীদের কাছে কারণ জানলাম। কাল রাত্রে তাদের এক বার্ষিক উৎসব গেছে। সারারাত্রি নাচ-গান-মাতন হয়েছে, এখনও তার জের চলেছে।

এখন বুঝতে পারলাম, পথের পাশেই একটা ঘর থেকে কেন এত লোক বেরুচ্ছে মুখ মুছতে মুছতে !—স্খলিত চরণে, রক্তচক্ষু নিয়ে।

ভুন্দর এই পথের শেষ গ্রাম গ্রামের কিছু নীচে, যাবার পথে, ডান দিকে আর একটি পার্বত্য নদী ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিশেছে। সেই নদীর উপত্যকার শেষদিকে বরফ-ঢাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ে। ২২,০৭০ ফিট। নাম, হাতী পর্বত। হাতী মেলে না, হাতীর আকৃতির সঙ্গে পাহাড়টির সাদৃশ্য আছে বলে প্রসিদ্ধি আছে।

ভুন্দর গ্রাম থেকে ঘাংরিয়া এক মাইল।

কিছু দূর নদীর ধার দিয়ে পথ। এই পথে পরের বছর জুন মাসে এক জায়গায় অনেকখানি বরফ পড়ে ছিল। শীতকালে পড়া বরফ; কখনো বা পাহাড়ের উপর থেকে জমা-বরফের এক-একটা স্তূপ নীচে উপত্যকায় গড়িয়ে নেমে আসে, তুষার-আবরণ দিয়ে পথ ঢেকে রাখে এবং সূর্য-কিরণের খরতাপ যেখানে কম লাগে সেখানে শীতের পরও অনেকদিন জমেও থাকে। তার পর বর্ষা নামে ও ক্রমে ক্রমে বর্ষার পর নিম্ন প্রদেশের এইসব বরফ গলে নিশ্চিহ্ন হয়।

গ্রাম ছেড়ে আসার মাইল খানেকের মধ্যে ছোট এক পুলে ভুন্দর নদী পার হতে হয়। পুল অর্থে—দুটি লম্বা পাইন গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি শুইয়ে রেখে দুই পাড়ের সংযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্ষায় এসব পুল ভেসে যায়। পুলের হাত তিন-চার নীচে নদীর দুরন্ত স্রোত প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, যেন যাবার পথে সহস্র তরঙ্গের বাহু তুলে আহ্বান করে।

পুল পার হয়ে অল্প গিয়ে চড়াই শুরু। সঙ্গী পাহাড়ী বলে, আর এক মাইল পথ। এই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু, চড়াই-এর পথ যেন শেষ হতে চায় না। প্রতিবারেই পাহাড়ের বাঁক ঘুরে মনে হয়, এইবার হয়তো দেখব যাত্রা-শেষের আশ্রয়স্থল। কিন্তু কোথায় বাংলো? ঘুরে ঘুরে পথই চলেছে—এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেই চলেছে। মন ডুবে যায় প্রকৃতির রূপ-তরঙ্গে। চারিদিকে বড় ছোট নানান্ ফুলের গাছ। নানান্ রঙের ফুল

ফুটে রয়েছে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের মাথায় বরফ-ঢাকা; কোথাও বা জল-প্রপাত নামছে—জলকণার ওড়না উড়িয়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতি-ধ্বনির ঝঙ্কার তুলে।

ঘাংরিয়া পৌঁছুবার আগে পথের শেষ ভাগে এক নিবিড় অরণ্য। চতুর্দিকে বিশাল বনস্পতি। অতিবৃদ্ধ বৃক্ষ সব। আদিম অরণ্যানী। যেন, উদ্ভিদ্-জগতের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য স্বরূপ বিরাজ করছে। বিরাট-দেহ তরুশ্রেণী। বিপুল-বিস্তীর্ণ শাখা-বহুল। অঙ্গ-ভরা প্রাচীনতার চিহ্ন। শুষ্ক শৈবালে আকীর্ণ। বার্ধক্য-জীর্ণ বল্কল। কোথাও চরিদিকে ঝুরি নেমেছে; ডালে ডালে লতানে গাছে জাল বুনেছে। যেন চারিপাশে মহা-স্থবির ঋষিগণ ধ্যানে বসেছেন। শুষ্ক লোল চর্ম। জটাজূটধারী। স্থানীয় পাহাড়ীদের বিশ্বাস—এঁরা সত্যই বৃক্ষরূপী প্রাচীন মহর্ষি। এঁদের যুগ-যুগান্তের তপস্যা অনন্তকাল-ব্যাপী।

পথ চলতে কোথাও বা দেখি উৎপাটিত-মূল পতনোন্মুখ বিরাট এক বৃক্ষ। সঙ্গী গাছগুলি তাকে হেলানো অবস্থায় যত্নভরে বুকে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে—যেন বন্ধুর কোলে অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছে। অনুভব করি, চারিদিকে যেন শুষ্ক অথচ সুন্দর মরণের সস্নেহ স্পর্শ।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশের অরণ্যগুলির সঙ্গে প্রায় দশ হাজার ফিট উপরে এই সব অঞ্চলের অরণ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে।

নীচের জঙ্গলগুলিতেও প্রকাণ্ড গাছ আছে—নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ অন্ধকারও আছে। কিন্তু, সে-সব বন সজীব, প্রাণময়, চঞ্চল, মুখর। সেখানে উজ্জ্বল সবুজের স্নিগ্ধতা—যৌবনের দীপ্তি। চারিদিকে গিরি-নির্ঝরিণীর উচ্ছলিত জল-কল্লোল। গাছে গাছে শাখে শাখে বিচিত্র রঙের পাখীর সুমধুর কাকলী। পাতায় পাতায় বাতাসে মর্মর-ধ্বনি তোলে। বনের পশু আচম্বিতে ছুটে যায়,—দূরে উচ্চ রব তোলে, বনস্থল কেঁপে ওঠে। সারাক্ষণই ঝিল্লিরবের একটানা সকম্পন গুঞ্জরণ। প্রাণ-চঞ্চল বনানী। প্রফুল্ল সজীবতা।

হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশের এই সব অরণ্যের, কিন্তু, সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে চারিদিকের অতি-বিশুষ্ক বিরস রূপ। সবুজের সজীবতা নেই, জীবনের চঞ্চলতা নেই। চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। ঝরণার কলধ্বনি নেই,—সারা অরণ্য জলহীন, রুক্ষ, শুষ্ক। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের

কোন নিদর্শন নেই, তাই প্রাণের চঞ্চলতাও নেই। বাতাসও স্তব্ধ হয়ে আছে—তাই মর্মর-ধ্বনিও নেই। এক বিরাট নিস্তব্ধতা সারা বনস্থলটিকে যেন পরিপূর্ণ ভরাট্ করে রেখেছে। চলতে গিয়ে নিজের পদধ্বনিতে নিজেই চমকে উঠি। প্রচণ্ড কোলাহলে যেমন কানে তালা লাগে, এই নিস্তব্ধতাও ঠিক তেমনি কানে বধিরতার ভাব জাগায়। অনাদি কালের আদিম অরণ্যানী—শব্দ নেই, ভাষা নেই, বর্ণের বৈচিত্র্য নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই। জীবনোত্তর লোকে মহা-স্থবির সন্ন্যাসীর বিভূতি-বিভূষিত উষর কান্তি। ধ্যানস্তিমিত, নিশ্চল, নীরব মূর্তি।

মনে হয়, তুচ্ছ জীবন-মৃত্যুর পরপারে অনন্ত কালের এক মহা অরণ্য-রাজ্যে এসে পৌঁছেছে এক অতি-ক্ষুদ্র নগণ্য মানব-শিশু।

৯

ঘাংরিয়া।

জায়গার নাম। লোকালয় নয়। বনের এক প্রান্তে বড় বড় কয়েকটা গাছ কেটে খানিকটা খোলা জায়গা। মাটির বুকে কাটা-গাছের গুঁড়ির অংশগুলি যেন অস্ফুট বেদনায় মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

অতি সুন্দর একটি নতুন বাংলো। বন-বিভাগের বিশ্রাম-কুঠি, রেস্ট-হাউস্।

পাথরের বাড়ি। কাঠের মেঝে। শ্লেট্ ও করোগেটের ছাদ। কাঁচের জানালা। দুইটি ঘর। ঘরের ভিতর চেয়ার, টেবিল, খাট,—আগুন-জ্বালাবার আয়োজনও। পাশেই স্নানাগার।

ঘাংরিয়ায় পৌঁছেই অমরনাথের সঙ্গে দেখা। এই প্রথম পরিচয়। 'Forest Officer—সরকারী পরিদর্শনে এসেছে। আমাদের একটু আগেই পৌঁছেছে। সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। যেন কতকালের জানাশুনা। এমনি অনাবিল আনন্দ। বলে, চলে আসুন। এই বাংলোতেই থাকবেন। একটা ঘর আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি। আমি পাশের ঘরেতে থাকব। ধর্মশালায় থাকা আপনাদের চলবে না—অতি অপরিষ্কার। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারও। দিনের বেলায়ও রোদ যায় না। এখানে রোদ-পোয়ানোর আরাম আছে।

চাপরাশিকে দিয়ে বাঙ্লোর বাইরে খোলা জায়গায় চেয়ার বার করিয়ে

দেয়। চা তৈরি করে আনায়। রৌদ্রে বসে চা-পান করি। ভাণ্ডারী শিশিরবাবু তাঁর বাড়ি থেকে আনা নিম্‌কি, গজা ঝুলি থেকে বার করেন, সবাইকে বিতরণ করেন, তারপর নিজে কামড় দিয়ে বলেন, এখনও কেমন মুচ্‌মুচে রয়েছে. দেখুন!

হেসে বলি, শুধু মুচ্‌মুচে কেন? স্বাদে সুদূর বাংলার স্মৃতি জাগায়।

অমরনাথ জানায়, ভাগ্যে সে এসেছিল—তাই চৌকিদারও নীচে গ্রাম থেকে তার সঙ্গে এসেছে, এখানে কেউই থাকে না। এইসব বন-বিভাগের বাংলোতে থাকতে হলে পৌড়ী থেকে কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ District Forest Officer-এর অনুমতির প্রয়োজন হয়। তারপর হেসে বলে, অবশ্য স্থানীয় চৌকিদারের সঙ্গে কেউ যদি বিশেষ ব্যবস্থা করে ব্যবহার করে তো স্বতন্ত্র কথা। এ-বাড়ি মাত্র দিন দশ-বারো হল শেষ হয়েছে। এই প্রথম আমরা এখানে বাস করছি। গৃহ-প্রবেশ বলতে পারেন। আপনারা এলেন, ভালই হল। দল বেঁধে আনন্দ-উপভোগ করা যাবে!

বনে-জঙ্গলে কর্তব্যের তাড়নায় তাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। তাই, পথের পথিককে ক্ষণিকের সঙ্গী ভাবে পেলেও আত্মীয়তা সূত্রে বেঁধে ফেলে।

ঘাংরিয়া উঁচু জায়গা। ১০,০৮৮ ফিট্। তাই রৌদ্রের উগ্রতা নেই। স্নিগ্ধ, মনোরম। চারিদিকের অতি-শীতল আবহাওয়ার আবরণ ভেদ করে সূর্যের যে রশ্মিটুকু নেমে আসে শীতকাতর অঙ্গে তা সত্যই আরাম-প্রদ।

বাংলোর সামনে বসে দুইদিকের গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের একটি চূড়া দেখা যায়। ম্যাপ খুলে নাম পাই—বাম্‌নি ধর্—Bamani Dhaur; ঐ দিকেই Valley of Flowers-এর পথ। ভুন্দর নদীর উপত্যকা ধরে। বাংলো থেকে নদী দেখা যায় না। কিছু নীচেও বটে, জঙ্গলের গাছেও দৃষ্টি রোধ করে। কিন্তু জল-স্রোতের নিরন্তর শব্দ ভেসে আসে।

বিকেল বেলা। একটি যুবক এল। কোট-প্যান্ট পরা। সঙ্গে এক পাহাড়ী, তার পিঠে একটা বেতের ঝুড়ি। Valley of Flowers দেখে ফিরছে। ঝুড়ি-ভরা একরাশ ফুল সংগ্রহ করে এনেছে। বল্লে, ফুল ঝরে গেছে অনেক, গত দু'দিন বৃষ্টির ফলে। এখন মাত্র প্রায় চল্লিশ রকম ফুল দেখতে পেলাম।

হেসে বলি, আর সেগুলি ঝুড়ি ভরে তুলে নিয়ে এলে? আমরা এখানে বসে Basket of Flowers দেখব বলে?

সে লজ্জিত হয়। বলে, ফুল না তোলা ভালো—ঠিকই। কিন্তু, আমার প্রয়োজন আছে। তবে, এই কয়টি মাত্র ফুল সেখান থেকে তুলে আনা কিছুই নয়। যেন, সাগর থেকে এক ফোঁটা জল তোলা, অথবা এই হিমালয় থেকে একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নেওয়া। দেখবেন গিয়ে সেখানে কত রকম ফুলের কত রঙের বাহার!

নবাগতের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম বিপুলানন্দ। গাড়োয়াল শ্রীনগরে বাড়ি। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বটানি-তে এম্, এস্-সি পাশ করেছে। এখন এই ভুন্দর-ভ্যালির ফুল সম্বন্ধে গবেষণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা।

বলে, বিদেশ থেকে সাহেবরা এসে এখানকার ফুল সম্বন্ধে বই লিখছেন, কত তথ্য আহরণ করছেন; তা করছেন তাঁরা করুন, কিন্তু আমরা করি না কেন? অথচ, এরই তো কত কাছে আমরা থাকি। চলুন, এবার ফেরবার পথে শ্রীনগরে আমাদের বাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে যাবেন। আমার বাবা রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসর, সেখানে আছেন। ভাল লাগবে আপনাদের।

তার শ্রীনগরের বাড়ির বর্ণনা শুনে তখনই চিনতে পারি। শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, শহরের এলাকার বাইরে পাহাড়ের ওপর সাদা দোতলা বাড়িটা তো? সামনে দুদিকে সবুজ-রঙের রেলিঙ্-ঘেরা বারান্দা আছে? বহুদূর থেকে বাস্-এ বসেও সকলেরই চোখে পড়ে। আমরা আসার সময় বলছিলাম—কি চমৎকার জায়গায় সুন্দর বাড়িটি! ভালই তো,—কাটিয়ে যাব তোমাদের সঙ্গে ক'দিন। কিন্তু, এখন আপাততঃ তুমি তো এসে থাক আমাদের ঘরেতে! আর একসঙ্গে যখন হওয়াই গেল, চল আমাদের সঙ্গে আবার Valley of Flowers-এ ও লোকপালে;—লোকপাল তো তোমার এখনও দেখা হয় নি?

বিপুল আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়। তার ঝুড়ি নিয়ে আমাদের ঘরটিতে আশ্রয় নেয়। একই সঙ্গে সকলের আহারের আয়োজনও হয়।

অমরনাথ চৌকিদারকে ডাকে। বলে, তোমাকে তো একবার এখনি গ্রামে যেতে হবে দেখছি। যে তিনদিন আমরা এখানে আছি, গ্রাম থেকে একটা লোক যেন রোজ দুধ দিয়ে যায়। আলুও কম পড়তে পারে দেখছি, কিছু এনে রাখা ভাল।

শিশিরবাবু বলেন, আলু আমরা সঙ্গে এনেছি। মিল্ক পাউডারও আছে।

অমরনাথ জানায়, আপনাদের আলু, আটা, ঘি—সব খুলে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে আনা সামগ্রীও আছে। কিন্তু, এখন লোক সংখ্যায় বেড়েছি—আরও কিছু আনিয়ে রাখা ভাল। টাট্‌কা দুধেরও যখন সেইসঙ্গে ব্যবস্থা হতে পারে—তাও করিয়ে নেওয়া যাক্। কাল চৌকিদার আমাদের সঙ্গে Valley of Flowers-এ যাবে, তাই আজই গিয়ে কাজ সেরে আসুক।

চিন্তিত হয়ে বলি, এতখানি চড়াই-উৎরাই-এর পথ—গ্রামে গিয়ে ফিরতে তো ওর সন্ধ্যে হয়ে যাবে! সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে আসা, দরকার কি? এখন তো ব্যবস্থা রয়েছে,—কাল পরশু না হয় দেখা যাবে।

অমরনাথ হেসে ওঠে। বলে, এটুকু পথ ওদের কাছে কিছুই নয়—চড়াই-উৎরাই করতেও ওরা কাবু হয় না। জঙ্গল দিয়ে আসতে জানোয়ারের ভয়ও ওদের বিশেষ নেই—হাতে একটা লাঠি থাকলেই হল। অন্ধকারের জন্যে অবশ্য একটা লণ্ঠন দিতে হবে।

শিশিরবাবু বলে ওঠেন, লোকগুলির তো আশ্চর্য রকম সাহস ও শক্তি!

অমরনাথ হাসতে হাসতে বলে, আশ্চর্য বটে! তবে সাহসের পরিচয় পাবেন এখনি।

চৌকিদারের সঙ্গে অমরনাথের কথা হতে থাকে। প্রস্তাব শুনে পথের দুর্গমতার কোন কথাই চৌকিদার তোলে না, হিংস্র জন্তুরও উল্লেখ করে না, শুধু আপত্তি জানায় এক কারণে—ফিরতে অন্ধকার হলে ভূতের ভয় আছে!

অমরনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, দেখলেন তো, এদের সাহসের দৌড়? এখন এ-ভয় ভাঙবে কি করে? লাঠিতেও ভাঙবে না, লণ্ঠনেও দূর হবে না—যুক্তি-তর্কতে তো ঘুচবেই না। এ-ভয় যে এদের মজ্জাগত সংস্কার। দেবতাতেও যেমন অটুট ভক্তি ও বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-অপদেবতাতেও তেমনি নিদারুণ ভয়। দেখেন নি? গ্রামে গ্রামে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় যেমন দেব-দেবীর মন্দির উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে অপদেবতাদের পরিতুষ্টির জন্যে গাছের ডালে নিশান উড়ছে, ছেঁড়া-কাপড়ের টুক্‌রো ঝুলছে, পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে ছোট ছোট স্তুপ গড়েছে!

চৌকিদারকে অবশেষে যেতে রাজী হতে হয়। ভূতের ভয়ের চেয়ে, বোধ করি, তার কাছে সরকারী অফিসরের ভয় আরও বেশী! তবে, তার সঙ্গে আরও অন্ততঃ একজনকে যেতে হবে!

রাম-নাম অগতির গতি। কিন্তু, বাস্তব জগতে ভীরু নির্বোধ মানুষের কাছে মানুষের সঙ্গ মনে সাহস সঞ্চার করে।

শিশিরবাবু অমরনাথকে বলেন, দু'জনে যাচ্ছে, যাক্। কিন্তু সাবধান করে দিন্—যেন সহজ অবস্থায় ফেরে, গ্রামে যা মত্ত হাওয়ার গন্ধ পেয়ে এলাম!

অমরনাথ উত্তর দেয়, সতর্ক করেও লাভ নেই। ও-স্বভাব কি আর নিষেধ করে আট্‌কানো যায়? সুযোগ পেলেই খাবে,—এই শীতে না খেয়েও ওদের উপায় নেই, তবে সহজে মাতাল ওরা হব না—এই ভরসা!

বাংলোর পাশেই বন। বিপুল জানায়, এর মধ্যে Himalayan Silver Fir, Spruce, Yew, Maple ও Cedar গাছই বেশী। বনের মধ্যে দুইটি ধর্মশালা। একটি কালীকমলি-ক্ষেত্রের, অপরটি শিখেদের। আমাদের সঙ্গের লোকজনেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গল থেকে গাছের বড় বড় ডাল কেটে এনেছে। আগুন জেলেছে। রান্নার কাজ চলেছে, শীত-নিবারণের ব্যবস্থাও হয়েছে।

ধর্মশালার অল্প দূরে বনের শেষে উন্মুক্ত প্রান্তর। তারই উপর দিয়ে নৃত্যভঙ্গে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণকায়া পার্বত্য নির্ঝরিণী। তুষারশীতল জলধারা। সুনির্মল।

প্রান্তরের কোন এক প্রান্তে ভেড়া-ছাগল চরছে। দৃষ্টি-পথে আসে না, সচল জীবগুলির গলায় বাঁধা ঘন্টার ধ্বনি শ্রুতিপথে জানিয়ে যায়। নীচের গ্রাম থেকে পাহাড়ীরা এখানে চরাতে আসে। গরমের কয়মাস থাকে।

অমরনাথ বিপুলের কাছে সংবাদ নেয়, ওপরে ভ্যালিতে ভেড়া-ছাগলের দল দেখলেন নাকি?

বিপুল জানায়, না। সেদিকে দেখি নি।

অমরনাথ মন্তব্য করে, তাহলে ঠিক আছে। কয়বছর থেকে ঐ অঞ্চলে চরানো নিষেধ হয়েছে—ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে যায় বলে। চারিদিকে নোঙরাও হয়। প্রতি দলে ভেড়া-ছাগল কম থাকে না—হাজার খানেকের ওপর হবে। এক এক অঞ্চলের সব গ্রামগুলির পশুগুলিকে এক সঙ্গে চালিয়ে গ্রামের কয়েকজন নিয়ে আসে! পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে থাকে প্রকাণ্ড বড় বড় ভুটিয়া কুকুর। ভীষণ আকৃতি। গলায় ঘন্টা বাঁধা। পাহাড়ের নিম্ন প্রদেশে যখন গ্রীষ্মকাল—পাহাড়ের মাথার উপর এই সব স্থানে তখনও বেশ

শীত এবং সবুজ কচি ঘাসে ভরা। পাহাড়ের অতি উচ্চে এই ধরণের অঞ্চলকে বলে 'বুগিয়াল্'।

শিশিরবাবু প্রশ্ন করেন, যারা চরাতে আসে তারা থাকে কোথায়, খায় কি ?

অমরনাথ বলে, তাদের অতি কঠোর জীবন। তবুও সানন্দে বহন করে। পাহাড়ের গুম্ফার মধ্যে বাস; কোথাও বা পাথর সাজিয়ে ছোট্ট একটি ঘর তোলে। পরনে মোটা কম্বলের আলখাল্লা—ঐ সব ভেড়া-ছাগলের লোম থেকে নিজের হাতেই বোনা। খাদ্যের মধ্যে গ্রাম থেকে সঙ্গে আনা আটা ও ক্ষেতের আলু। ক্বচিৎ কখনো হরিণ মারতে পারলে কয়দিন ভুরি-ভোজের আনন্দ-লাভ করে। জীবন-যাপনের জন্যে স্বল্পই তাদের প্রয়োজন, তাই অল্পই তাদের আয়োজন। যেটুকু আছে তাতেই পরিতুষ্ট; যা নেই, তার জন্যে অভাব বোধ করে না, অভিযোগও করে না।

অমরনাথ হঠাৎ হাতের ঘড়ি দেখে। বলে, আমি কিন্তু এখন অভিযোগ করছি—চা খাবার সময় হয়ে গেছে।

অতএব, বাংলোয় ফিরি। অমরনাথ চায়ের ব্যবস্থা করে। বলে, আপনাদের আনা দার্জিলিং-এর চা এখন থাক। পরে খাওয়া যাবে। এখন এখানকার স্থানীয় চা খান।

জিজ্ঞাসা করি, কই, এখানে তো কোথাও চা-বাগান দেখি নি, আছে বলেও তো শুনি নি ?

সে বলে, চা-বাগানের চা নয়। এখানে জঙ্গলে এক রকম বড় গাছ হয়। থুনির। তারি শুকনো ছাল। গরম জলে দিলে চা-এর মত রঙ্ হয়, কষা কষা স্বাদও হয়, একটু সুগন্ধও আছে। এখানকার পাহাড়ীরা চা বলে তাই ব্যবহার করে।

দুধ, চিনি দিয়ে সেই চা-ই তৈরি হয়। মুখে দিয়ে দেখি, বিচিত্র আস্বাদ! অভাবে কেমন লাগে জানি না। অভ্যাসে যে-স্বাদের সঙ্গে পরিচয় আবার গরম জল আনিয়ে সেই দার্জিলিং-চায়েরই ব্যবস্থা হয়।

ঘরের মধ্যে বিপুল বাতি জ্বেলে মেঝেতে বসেছে। চারিদিকে ছড়ানো ফুল। ঝুড়ি থেকে নামিয়ে সাজিয়েছে। সামনে খানকয়েক *Illustrated Weekly*-র মত বৃহৎ-আয়তন পুরানো পত্রিকা। একটা বাঁধানো খাতা,

হাতে। তাতে প্রতিফুলটির বর্ণনা লিখছে; পরিচিত হলে তার নাম লিখছে। নাম না জানা থাকলে একটি মোটা বাঁধানো বই দেখে নাম বার করার চেষ্টা করে। বইখানি R. Strachey-র প্রসিদ্ধ *Catalogue of the Plants of Kumaon and Adjacent Portions of Garhwal and Tibet*। নাম সম্বন্ধে অমরনাথের সঙ্গে আলোচনাও করে। দুই জনে এক মত হলে সহজেই মিটে যায়। মতভেদ হলে তর্ক-আলোচনা হয়। তাতেও সিদ্ধান্তে না পৌঁছুলে খাতার মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন সংযুক্ত হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে ফুলগুলি একে একে সযত্নে রেখে দেয়। বলে, ফুলগুলি এভাবে রাখলে নষ্ট হবে না। শুকিয়ে ঠিক চেপে থাকবে। তার পর ল্যাবরেটারিতে যথারীতি এদের রাখার ব্যবস্থা হবে।

কবে, কোথায়, উপত্যকার বা পাহাড়ের ঠিক কোন্ স্থানে, কি অবস্থায়, কোন্ মাসে ও দিনে এগুলি সংগৃহীত তারও বিবরণী রাখে।

বিপুলের ধারণা, কয়েকটি নতুন ফুল ও চারাগাছ সে পেয়েছে—যা এখনও অজ্ঞাত। কোন বইয়ে তার উল্লেখ নেই। অমরনাথ বিজ্ঞের মত সাবধান করিয়ে দেয়, অত চট করে আবিষ্কারক হাবার আশা করা ঠিক নয়। ভাল করে অনুসন্ধান করবেন ফিরে গিয়ে। Smythe-এর *Valley of Flowers* বইখানি আপনার সঙ্গে নেই—তাতেও ভাল করে দেখবেন।

ফুলগুলির আকার, রঙ্, পাতা, পাপ্ড়ি, শিরা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দু'জনে বিচার করে; প্রতি ফুলটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে। মশগুল হয়ে দু'জনে আলোচনা চালায়। ঘরের মধ্যে বসে ফুল ছিঁড়ে ফুলের চুল-চেরা বিচার চল্তে থাকে।

বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রমাণ-বিচার-সাপেক্ষ তাদের বিজ্ঞান-জগৎ। তাতেই তাদের আনন্দ। বিজ্ঞানই তাদের কাছে সর্ব-শক্তিমান্।

আমি অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে আসি। বারান্দায় ইজিচেয়ারে কম্বল গায়ে আরামে বসি। দেখি, সামনের উপত্যকায় দুই-পাশের গিরিশ্রেণীর মধ্যে রাত্রের আঁধার নিবিড় হয়ে ওঠে,—যেন কোন্ এক বিরাটাকার মসীকালো দৈত্য প্রসারিত দীর্ঘ দুই বাহুর মধ্যে জমাট অন্ধকার ধরে রেখেছে। দিনের আলোয় দেখা বনের বড় বড় গাছগুলির শাখা-প্রশাখা সেই ঘন-কালো অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। শুধু জেগে আছে বাম্নি ধর্—বহু-দূরের সেই তুষার-ধবল গিরিশিখরটি। অন্ধকারের কোন্ এক গোপন-পথে

রজনীতে সে যেন অতি নিকটে চলে এসেছে। সাদা বরফের, দিনের-আলোয়-দেখা উজ্জ্বল দীপ্তি, রাত্রের অন্ধকারে আরও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়—চূড়াটি থেকে থেকে যেন কাঁপছে!

হঠাৎ মনে পড়ে, দিনের-বেলা-শোনা চৌকিদারের মুখের কাহিনী, 'বাবুজি, দূরে ঐ যে হিমালয় দেখছেন, রাত্রে দেখবেন ও জেগে ওঠে, কাছে আসে, জ্যোতি দেখায়। ও-যে দেওতা আছে!—আর নীচে ঐ যে জঙ্গল দেখছেন—রাত্রে ভরে যায় দানোতে!'

বিদ্যা-বুদ্ধিহীন অন্ধ-বিশ্বাসীর চোখে দেখা আর এক হিমালয়!

আবার ভাবি, রাত্রিশেষে দিবালোকে কালই তো যাব ঐ সুদূর অঞ্চলে। তুষার-শীর্ষ গিরিরাজের পাদদেশে। কল-কল্লোলিনী গিরি-নির্ঝরিণীর উপকূলে। কত পাখীর গানে ভরা, কত ফুলের রঙে রঙীন প্রকৃতির সেই প্রকৃত লীলাভূমি।

সৌন্দর্য-পিয়াসী পর্যটকের চোখে দেখা সে-ও তো এক হিমালয়!

আবার মনে হয়, ঐদিকেই তো আর এক অঞ্চলে লোকপাল। যেখানে হেমকুণ্ডের তীরে বসে সেই শিখ-সাধু সাধনা করেছিলেন! শিখ-গুরু সিদ্ধ হয়েছিলেন। আঁধার-ঘেরা ঐ সুদূর হিমগিরির অলক্ষ্য কন্দরে এখনও হয়তো কোথাও সাধু-সন্ত এই গভীর রাতেও একান্তে ধ্যান-নিবিষ্ট রয়েছেন। লোকচক্ষুর আগোচরে, দিবা-রাত্রির নির্বিচারে, তাঁদের দীর্ঘ তপশ্চর্যার অশ্রুত পুণ্যকাহিনী চিরকাল অজানাই থাকে। সাধনা-লব্ধ তাঁদের জ্ঞান। অটুট তাঁদের বিশ্বাস। তাঁদের চোখে, বোধ করি, এই নগাধিরাজ—সত্যই দেবতাত্মা হিমালয়।

অসীম, অনাদি, অনন্ত!

হঠাৎ চমকে উঠি।

রাত্রের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে এক বন্য পশুর আর্ত রব ওঠে।

কান পেতে শুনি। নদীর ওপারে নীচের জঙ্গলে কাকর-মৃগ ডাকছে—Barking deer!

এ-পারের পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ওঠে। ক্রমে কাছ থেকে দূরে—

আরও দূরে শব্দ সরে যায়। স্বরের সূত্র ধরে বেশ বুঝতে পারি—গভীর দূর বনের মধ্যে হরিণ ছুটে চলে যাচ্ছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শব্দ মিলিয়ে যায়। তবুও বহুক্ষণ তার অনুরণন বাজতে থাকে।

যেন, সুপ্ত বনানীর আচম্বিত নিদ্রা-ভঙ্গের পর সহজে তন্দ্রা আর আসে না!

তার পর, আবার চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ।

ক্ষণিকের জাগ্রত বাস্তব হিমালয় আবার কল্প-লোকের চিরন্তন রহস্যে আবৃত হয়।

১০

ঘাংরিয়া থেকে Valley of Flowers প্রায় আড়াই মাইল। এ পথে দুরূহ চড়াই নেই। বাংলো ছেড়ে বনের মধ্যে ধর্মশালার পাশ দিয়ে এসে সেই প্রশস্ত প্রান্তর। তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট পার্বত্য নদী। এখানেও দুইটি গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি রেখে সাময়িক পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে। নদী পার হয়ে অল্প দূর আসার পর পথ দুইদিকে চলে গেছে। ডান হাতের অর্থাৎ পূর্ব-দিকের সরু পথটি লোকপাল বা হেমকুণ্ডের পথ। আর সামনের অর্থাৎ উত্তরমুখী পথটি Valley Of Flowers-এর পথ। মাইলখানেক সেই পথে ভুন্দর নদীর ধার দিয়ে এসে নদীর উপর কাঠের পুল। খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। প্রতি পদক্ষেপে নদীর জলধারা নীচের দিকে নেমে চলেছে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, সহস্র জলকণার ফোয়ারা সৃষ্টি করে। নদীর ধারাপথে কত ছোট বড় জলপ্রপাতই না চোখে পড়ে!

পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ। সম্মুখ-পথের একসঙ্গে বেশী দূর দৃষ্টি চলে না। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই পথের সামনে দেখি একটি অতি-সুন্দর পাখী। ময়ূরের মত রঙ্। কিন্তু ময়ূর নয়। বৃহদাকার মোরগ জাতীয়। আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চমকে ওঠে, স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণিক তাকায়। তার পরই ডানা মেলে সৌন্দর্যের ছটা ছড়িয়ে পাশের জঙ্গলে ছুটে পালায়—যেন ত্রস্ত, সলজ্জ সুন্দরীর নীল শাড়ির ঘোমটা টেনে সরে যাওয়া!

চৌকিদার উত্তেজিত হয়ে বলে, একটু আগে জানতে পারলে ধরে ফেলতাম। মুনিয়াল পাখী। বনের রাণী। হিমালয়ের শুধু এই সব উঁচু

জায়গায় থাকে। কি সুন্দর রঙ্ দেখলেন? এইসব পাখী সাহেবরা ধরে নিয়ে যেত, মেরে ঘর সাজিয়ে রাখবে বলে।

মুনিয়াল্! নাম শুনে মনে পড়ে কুলু উপত্যকায়ও এর কথা শুনেছিলাম, রঙীন্ পালকও দেখেছিলাম এক পাহাড়ীর টুপিতে। সেখানকার শৌখীন লোকের টুপির উপর এরই দু-একটা পালক লাগাতে পারা অতি বড় সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। এক শিকারী সাহেবের টুপিতে সব সময়েই এর পালক থাকৃত বলে নামই হয়েছিল মুনিয়াল সাহেব।

আজ হঠাৎ সেই পালকের জীবন্ত অধিকারিণীকে দেখে আনন্দ হল।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, দেখুন না, বোধ হয় ঐ গাছগুলির আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদেরই দেখছে—একটা ফটো তুলে আনুন, কলকাতায় গিয়ে দেখানো যাবে!

হেসে উত্তর দিই, শহরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবেন, এখানে এসে রাজ-দরবারে রাজ্ঞীর যেন চাক্ষুষ দর্শন করে যান।

নদীর দুই দিকে পাহাড়ের গায়ে—জলের কিনারায় নানান্ ফুলের গাছ। অনেক ফুল এখন সেপ্টেম্বরের শেষে শুকিয়ে গেছে, কোথাও বা ঝরেই গেছে, কতক বা গাছে ঝুলছে। তবুও, পাহাড়ীরা সাবধান করে দেয়, বেশী কাছে গিয়ে গন্ধ নেবেন না, মাথায় চক্কর দেবে, মূর্ছাও যেতে পারেন!

নদী-পারে সামান্য চড়াই। তারপর, আবার নদী ধরে পথ চলেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে বরফ-গলা জলের ধারা নেমেছে। পারাপারের পুল নেই। এ সময়ে জল কম, তাই ঝরণার জলের মধ্যে মাথা-তোলা পাথরগুলির উপর পা রেখে পার হই। জল কোথাও বেশী থাকলে জুতা মোজা খুলে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাই। কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল। এর পরের বছর জুন মাসে এ পথে আবার এসেছিলাম। সে সময়ে এই সব ঝরণার উপর অনেক জায়গায় বরফের আচ্ছাদন ছিল—সেই বরফের উপর দিয়েই তখন পার হতে হয়েছিল। সাবধান হয়ে—কেন না, তলার বরফ গলে কোথাও পাত্‌লা হয়ে আছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। মে-জুনে নদীর জলের উপরও অনেক জায়গায় বরফে ঢাকা দেখেছিলাম। এখন সেপ্টেম্বরে পথের বা নদীর উপর সে-সব বরফ নেই। আবার অক্টোবর-নভেম্বরে বরফ দেখা দেবে।

ধীরে ধীরে পথ সামান্য উঠেছে। তার পরেই মনে হয় যেন পথের শেষ—সম্মুখেই এক উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাচীর। সেই দিক থেকে একটি ছোট নৃত্যশীলা ধারা নেমে এসেছে,—ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিশছে। দেখি, তিনদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা,—শুধু ডান দিকে ভুন্দর নদীর এক সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা। সেই অংশেরই Smythe নাম দিয়েছিলেন Valley of Flowers। পাহাড়ীরা কেউ বলে কাণ্ডোলিয়া সেইন্, কেউ বা বাম্‌নি ধর্ গিরিশিখরের সঙ্গে নামযোগ করে।

পাহাড়ে ঘেরা এক সুরম্য প্রান্তর। প্রায় আড়াই মাইল দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তীর্ণ, পূর্ব-পশ্চিমেও ব্যাপ্তি এক মাইলের উপর। উত্তরে দূরে প্রান্তর-শেষে বরফের পাহাড়। রাটাবান্ গিরিশিখর। ২০,২৩০ ফিট উঁচু। তার কিছুদূরে নীলগিরি পর্বত,—২১,২৪০ ফিট। এই সব শিখর পাশে রেখে সম্মুখের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে গেলে বদরীনাথের নর-পর্বতের উপর পৌঁছানো যায়। এই উপত্যকাও নর-পর্বত গিরিশ্রেণীর অংশবিশেষ। উপত্যকার অপর দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকেও বরফের পাহাড়। সেদিক দিয়ে গিরিশ্রেণী অতিক্রম করলে বদরীনাথের পথে হনুমান চটীতে নামা যায়।

শিশিরবাবু মন্তব্য করেন, সে হনুমান্‌জিরই সম্ভব, আমাদের মত অক্ষম মানুষের জন্যে ও পথ নয়!

এই বিস্তীর্ণ ময়দানের মাত্র কয়েক স্থানে ভূর্জপত্রবৃক্ষের ছোট ছোট বন। নইলে তিনদিকে গিরিশ্রেণীর পাদদেশ অবধি উন্মুক্ত সমতল ক্ষেত্র। ঘন সবুজ ঘাসে ভরা। তারই ভিতর অগণিত ফুলের চারা। যেন চারিদিকে নানান্ রঙে রঙীন্ কার্পেট বিছানো।

অমরনাথ বলে, আগষ্ট মাসে একবার ইন্‌স্‌পেক্‌সনে আস্‌তে হবে। তখনি এখানকার সবচেয়ে বেশী রূপের জৌলুস। সে সময়ে, শুনেছি, গাছে ফুল, ঘাসে ফুল, মাটির কোলে ফুল, পাহাড়ের কোণে ফুল, নদীর তীরে ফুল, জলের ভিতরে শিকড়ে ফুল। শুধু ফুল-ময় জগৎ।

বটানিস্ট বিপুল তার সঙ্গে সায় দেয়। বলে, শীতকালে সাদা বরফের মোটা লেপ গায়ে এ উপত্যকা ঘুমিয়ে থাকে। নদী, মাঠ—সর্বত্র বরফে ঢেকে একাকার হয়ে থাকে। তারপর শীত শেষ হলে মে-জুন মাসে চারিদিক আবার জেগে ওঠে। নদীর বরফ-গলা জল কল কলরবে আবার ছুটতে থাকে। চতুর্দিকে ফুল ফুটতে সুরু হয়। কিন্তু সবচেয়ে বাহার খোলে জুলাই-আগষ্টে বর্ষার জল পাবার পর। তারপর, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আবার ফুল ঝরার পালা।

শিশিরবাবু বলেন, আশ্চর্য লাগে ফুলগুলি সাজানোর ভঙ্গী দেখে। অনেক জায়গায় মনে হয় যেন সাজানো ফুলের বাগান। ঐ দেখুন না, ওদিকে শুধু সাদা ফুলই ফুটেছে। আবার এদিকে তাকান, সব গোলাপী ফুল। ঐ পাথরটার পাশে একরাশ বেগুনী রঙের ফুলই শুধু ফুটেছে। আবার, এইখানে দেখুন, লালফুলের ছড়াছড়ি—কে যেন রক্ত-চন্দনের অজস্র ফোঁটা ছড়িয়ে গেছে! ফুল-বিশেষে স্বতন্ত্র 'বেড্'। মনে হয়, কোন নিপুণ রূপদক্ষ মালীর হাতে অতি যত্নে তৈরী ও সাজানো বাগান! ভগবানের কি অপরূপ সৃষ্টি।

বিপুল বৈজ্ঞানিক। অতএব, তার কাছে এ সব সুন্দর হলেও বিস্ময়কর নয়।

সে গম্ভীর হয়ে বলে, বিজ্ঞানে জানা যায়, ফুলেরও জাতিভেদ আছে, জাতিগত ধর্ম আছে, তাই স্বতন্ত্র জন্ম ও বাসও আছে। যে-জায়গায় যে-আবহাওয়ায় বা যে-পরিবেষ্টনে যে-ফুলের জন্ম হওয়ায় কথা—সেখানে শুধু সেই ফুলই হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঐ দেখুন, খোলা ঢালু জায়গায় Cassiope Fastigiata ও Gaultheria Trichophylla জন্মায়, তাই ঐখানে ফুটেছেও। Sedum Trullipetalum হয় পাথরের কাছে, হয়েছেও তাই এইখানে। আবার, ঐ নদীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, Epilobium Roseum—যাকে Willow Herb বলে—জন্মায় জলের ধারে, তাই জন্মেছেও ঐদিকে। তা ছাড়া কয়েক রকম ফুল আছে সর্বত্রই ছড়িয়ে ফোটে,—ঠিক যেমন এক শ্রেণীর লোক আছে সর্বত্র ঘোরে ফেরে,—যেমন দেখছেন হল্দে রঙের ফুলগুলি Geum Elatum—এখানে কিছু, ওখানে কিছু, চারিদিকে ছড়িয়ে ফুটেছে। এ ছাড়া, Aster, Inula, Coryalis, Polygomus, Blue Bell, Potentilla—এসব তো রয়েছেই। জুন মাসে এলে হল্দে ও লাল দুই রঙ্-এরই Potentilla দেখবেন, হল্দে Anemone পাবেন—তার আবার সাদাও হয়, সাদাগুলি যেখানে ফুটে থাকে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন তাজা বরফ পড়ে রয়েছে। Primula-গুলিরও রঙ্-এর বাহার আছে, লাল থেকে সুরু করে গোলাপী—এমন কি নীল, বেগুনীও হয়। বেগুনী Geranium-ও তখন ফোটে। বরাস্—Rhodorendron তো আপনাদের এইসব অঞ্চলের অতি পরিচিত ফুল। Sausuria—যাকে ব্রহ্ম-কমল বলে—এখানে এখন সব ঝরে গেছে; কাল লোকপালের পথে সে-ফুল দেখতে পাবেন।

কথার স্রোতে হঠাৎ বাধা পায়। একদৃষ্টে মনোযোগের সঙ্গে মাঠের এক

অংশে তাকিয়ে থাকে। ত্বরিত গতিতে সেই দিকে যায়। একটি মাত্র ফুল তুলে হাতে ধরে দেখতে দেখতে ফেরে, উৎসাহিত হয়ে বলে, এ নীল ফুলটি Blue Poppy—এ-সময়ে এই একটি মাত্র ফুটেছে দেখছি। নিঃসঙ্গ কোথা থেকে জন্মাল কে জানে!

বৈজ্ঞানিকেরও এবার বিস্ময় জাগে!

কেন জানি না, ফুলগুলির নাম, ধাম, গোত্র, রূপ-বৈচিত্র্যের এত জ্ঞানলব্ধ পরিচয় এই দিব্য পরিবেষ্টনের মধ্যে নিরর্থক ও তুচ্ছ বোধ হয়।

আমি বলি, চল গিয়ে খানিক বসা যাক্ ঐ পাথরটার ওপর। স্থির হয়ে বসে এই শান্ত আব্‌হাওয়া উপভোগ করা যাক্।

মাঠের মাঝে মাঝে কালো বড় ছোট পাথর পড়ে আছে। কোন কোনটি ঠিক বেদীর মত—সমতল, মসৃণ।

সেই দিকে এগিয়ে যাই। পা ফেলতে সঙ্কোচ লাগে। চারিদিকেই ফুল। না মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তবুও, যেতেই হয়। আলগোছে সন্তর্পণে পা ফেলি। এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাই। দেখি, কয়েকটি ফুল পায়ের চাপে পিষে গেছে, দেখে মনে ব্যথা লাগে। কয়েকটি বা ভূ-শায়িত হয়েও ডাঁটির ভরে আবার মাথা তোলে, স্প্রিং-এর মত দুল্‌তে থাকে—দেখে আবার আনন্দ জাগে!

একটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে সকলে বিশ্রাম করি।

কি প্রশান্ত আবেষ্টন!

উপরে মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। চারু চন্দ্রাতপ।

চারিদিকে গিরিপ্রাচীর। উন্নত মহান্।

দূরে সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-শিখর। সুনির্মল, জ্যোতির্ময়।

কুসুমাকীর্ণ ধরণীর দেহ।—'দিব্যবৃক্ষ-বনাচ্ছন্ন।' 'দিব্যপুষ্প-বিশোভিত।'

রূপে গন্ধে বর্ণে পুলকিত দশদিক্।

নিঃশব্দে ব্যজন করে স্নিগ্ধ সমীরণ।

এই অসীম সৌন্দর্যরাশির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে ফেলি।

হঠাৎ মানুষের স্বরে চম্‌কে উঠি।

অমরনাথ বলে, সঙ্গে ফ্লাস্কে চা এনেছি; রুটি ও আলুর সব্‌জিও আছে। এবার বার করতে বলি।

মানুষের দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অশরীরী মনকে সজাগ করে তোলে।

কিন্তু এই পরিবেষ্টনে সব কিছুই—সামান্য আহার্যও—মধুময় মনে হয়।

অল্পদূরে মাঠের মধ্যে এক জায়গায় এক সময়ে তাঁবু ফেলার সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও রয়েছে। তাঁবুর চারিদিকে চাপা দেবার জন্য ব্যবহার করা পাথরগুলি এখনো তেমনি চতুর্দিকে লাইন্‌ করে সাজানো আছে! তাঁবুর চারিপাশে জল-নিকাশের নালাগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান। নিশ্চয়, এখানে কারা তাঁবু ফেলে তার মধ্যে কয়েক রাত্রি বাস করে গেছে। কি সুন্দর ও শান্ত দিনগুলি তাঁদের কেটেছিল, কল্পনা করি।

ভাবি, এবার আমরা তাঁবু আনব।

১১

অমরনাথ চৌকিদারকে ডাকে। বলে, চল, সেই মেমসাহেবের কবর কোথায় দেখি।

১৯৩৯ সালে এক ইংরাজ মহিলা কুসুম-সন্ধানে এখানে আসেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ 'কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেন' থেকে। একাকিনী। রূপপিয়াসিনী। মালিনীর রূপে।

তাঁর সঙ্গে দুইটি পাহাড়ী অনুচর ছিল। তাঁবু ফেলে এখানে থাকতেন। ফুল সংগ্রহ করতেন। বিলাতে পাঠাতেন। বীজ সংগৃহীত হত।

একদিন উপত্যকার পাশের পাহাড়ের অল্প উপরে উঠে ফুল তুলতে গিয়ে মহিলা অকস্মাৎ পড়ে যান। পাহাড়ী সঙ্গীরা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। এসে দেখে, প্রাণহীন দেহ। মুঠি-ভরা ফুলের গুচ্ছ। ফুলের রাজ্যে ফুলশয্যায় শেষ শয়ান।

এখন সেখানে পাথরে খোদাই করা একটি স্মৃতি-ফলক আছে, শুনি।

তাই দেখতে চলি।

মাঠের মধ্যে গভীর খাদ কেটে একটা বড় ঝরণা নেমেছে। সাবধানে পার হই। তার পর, কোমর উঁচু ফুলগাছের জঙ্গল ভেদ করে নদীর দিকে নেমে চলি সেই স্মৃতি-স্তম্ভের কাছে।

স্তম্ভ নয়। দূর থেকে দেখাও যায় না। আশপাশের গাছে, ঘাসে, ফুলে আড়াল করে রাখে। কবরের ভূমিখণ্ডের উপর বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পাথর ফেলা। সেই পাথরগুলির গায়ে ভর দিয়ে রাখা একটি চতুষ্কোণ শ্বেতপাথরের স্মৃতি-ফলক। তাতে লেখা—

In Loving Memory
of
Joan Margaret Le;ge

February 21st 1885
July 4th 1939

I will lift up mine eyes unto the Hills
From whence cometh my help.

শেষ চরণ দুটির অক্ষরগুলি চোখের উপর ভাসতে থাকে।

কানে যায় চৌকিদারের বলা কাহিনী।

দুর্ঘটনার পরই এখান থেকে লোকে ছুটে গিয়ে নীচের গ্রামে খবর দেয়, যোশীমঠেও তখনি লোক যায়। ডাক্তার, পুলিস, অফিসর সাহেবরা আসেন। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে। কিন্তু, শেষে এখানে রাখাই ঠিক হয়। এইখানে নদীর কাছে মাটি খুঁড়ে কবর হয়। কবরের উপর প্রথমে শুধু কয়েকটা পাথর সাজানো ছিল। কয়েক বছর পরে এক সাহেব এই লেখা সাদা পাথরটি এখানে রেখে যান।

নির্বাক্ হয়ে শুনি।

কেন জানি না, এই অকস্মাৎ-মৃত্যুর করুণ কাহিনী মনে বেদনার ছায়াপাত করে না। প্রকৃতির এই বিরাট ও মহান্ রূপরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদ বোধও যেন লুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয়, জন্ম-মৃত্যু—সে যেন এক অবিচ্ছিন্ন-সুরের খেলায় বিভিন্ন সপ্তক মাত্র। পরস্পর-বিসম্বাদী নয়, একের রেশ অপরের মধ্যে সহজেই মিলিয়ে যায়। সুরের অনন্ত খেলা চলতে থাকে।

এই মরণের মধ্যে সমাপ্তির ইঙ্গিত নেই, জীবনের ক্ষয় নেই, হারানোর ভয় নেই। হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ কোলে এই মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়—সুন্দর, মহান্।

অল্প কিছুক্ষণ আগেকার কথা মনে পড়ে। কয়েক দিন তাঁবু খাটিয়ে এখানে কাটালে কি সুন্দর হয়!

এখন আবার ভাবি, এখানে মৃত্যুতেও কি আনন্দ নেই?

কে জানে?

কবরের দিকে তাকাই। তখনই মনে হয়, জীবিত সেই সুন্দর দেহখানি এতদিনে সুনিশ্চিত পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে।

মানুষের মাটির শরীর পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশে যায়। দেহের জলকণা ঐ নদীজলে লুপ্ত হয়। জীবিত মানুষের শেষ নিঃশ্বাস গিরিরাজ তাঁর স্নিগ্ধ বাতাসে গ্রহণ করেন। শবদেহ-ধাত্রী ধরণী উর্বরা হয়ে ফুল্ল-কুসুমিত হন। নব নব রূপে গন্ধে প্রাণহীন সেই দেহ আবার সঞ্জীবিত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

ফুল ফোটে, ঝরে; আবার ফোটে, আবার ঝরে। নদীর জল বরফ হয়; আবার গলে, আবার জমে। চক্রাকারে জীবন-মৃত্যু নিরন্তর ঘুরতে থাকে।

ভাবি, কোথায় তার শেষ, কোথায় তার শুরু—কে তার সন্ধান রাখে?

মনে পড়ে আসিসির St. Francis-এর উক্তি: 'It is in dying that we are born to eternal life.'

হঠাৎ বাতাসে উড়ে এসে কবরের উপর পড়ে একটি সাদা ধবধবে ফুল। যেন গিরি-দেবতার আশীর্বাণী।

ফুল দেখেই মনে পড়ে আমার মায়ের হাসি-ভরা মুখখানি। মালা হাতে পূজা করেন। যাত্রা-কালে প্রণাম করতে যাই। পূজা করা ফুলের একটি তুলে নেন্। আমার নত-শিরে ও হৃদয়ে হাত রেখে ধ্যান-নিমীলিত নয়নে জপ করেন, আশীর্বাদী ফুল হাতে দেন। যাত্রা-পথে সঙ্গে রাখা মায়ের সেই আশীর্বাদী ফুল বই-এ-পড়া অক্ষয় কবচের মত অজানা কোন্ শক্তির বলে মনে সাহস ও বিশ্বাস আনে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সিন্ধুপারে এক প্রশান্ত আনন্দ-রাজ্যে নিয়ে যায়।

মায়ের হাতে দেবতারই আশীর্বাদ।

হিমাঞ্চলের এই দেবভূমিতে আমরাও অঞ্জলি ভরে ফুল আনি। কবরের উপর অনাদি-অনন্তের পূজার অর্ঘ্য সাজাই।

ভিন্ন পথ লোকপালের। কিন্তু, প্রকৃতির ভিন্ন রাজ্য নয়। একই গিরি-শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ, তবে এ-পথে দুরূহ চড়াই-ওঠার ক্লান্তি আছে।

ঘাংরিয়া থেকে লোকপাল বা হেমকুণ্ড, শুনি, প্রায় পাঁচ মাইল। কিন্তু মনে হয়, তারও কম। ঘাংরিয়া বাংলো থেকে বার হয়ে মাঠের মধ্যে সেই ঝরণা পেরিয়ে একটু এগিয়ে এসে ডান হাতের বা পূর্ব-দিকের পথটি ধরতে হয়। সেদিকে আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। সর্পিল গতিতে পথ উঠে গেছে একেবারে পাহাড়ের মাথায়।

ঘাংরিয়া ১০,০৮৮ ফিট। সামনের চড়াই-পথ পাহাড়ের মাথায় তুলেছে বোধ করি প্রায় ১৫,০০০ ফিট-এ। মাইল তিন-চারের মধ্যে এই প্রায় হাজার পাঁচেক ফিট উঠতে হয়। পাহাড়ের শিখর-দেশে পৌঁছে অপরদিকে নামতে হয়। সেইখানে হেমকুণ্ড—১৪,২৫০ ফিট উঁচুতে।

লোকপালের চড়াই শুরু হবার আগে পথের ডান দিকে এক সুদৃশ্য জলপ্রপাত দেখা যায়। যেন স্বর্গ থেকে এক বিপুল ধারা ধরায় নামছে। যেমন গতির বেগ, তেমন গম্ভীর গর্জন। হেমকুণ্ড-নিঃসৃত এই নির্ঝরিণী।

বার্চ গাছ বা ভূর্জ-বৃক্ষের বনের মধ্যে দিয়ে প্রথম খানিকটা পথ। ভুজ গাছের সাদা ডাল, ধূসর পাতা। মাঝে মাঝে অন্য ফুল গাছেরও বাহার আছে।

ঘাংরিয়া থেকে হাজার দুই ফিট উঠলে তরু-রাজ্যের সীমা শেষ হয়। তখন শুধুই ফুল। চারিদিকে ফুলগাছের চারা। মাটিতে ও ঘাসেও ফুল।

যেমন Valley of Flowers-এ। তবে এ-পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত উঠেছে,—উপত্যকার মধ্য দিয়ে নয়; তাই পথের আশেপাশে ভ্যুন্দর-ভ্যালির মত সমতলভূমির বিস্তৃতি নেই।

চড়াই-এর শেষভাগে—পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবার কিছু আগে—পথের বাঁ দিকে পাহাড়ের দুই চূড়ার মধ্য থেকে বরফের একটা লেলিহান জিহ্বা বার হয়ে নেমে এসেছে। পথ-রেখা গ্রাস করেছে।

গোবিন্দ-ঘাটের সেই শিখ স্বামীজির সতর্ক-বাণী স্মরণ হয়।

পথের কাছে বরফ গলছে। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। জলের ধারা বয়ে চলেছে। সেখানে পার হওয়া বিপজ্জনক। উপর থেকে বোঝা যায় না,

কতখানি পুরু বা শক্ত বরফ। হয়তো, সামান্য ভারও সইবে না। তাই পথ ছেড়ে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠি। সেখানে অপেক্ষাকৃত জমাট বরফ। সঙ্গী পাহাড়ীদের নির্দেশমত সাবধানে সেইখানে পার হই। পায়ে সাধারণ টেনিস্ জুতা। পাহাড়ে হাঁটার ফলে তলার রবার মসৃণ হয়েছে। বরফের উপর পিছল লাগে। পাহাড়ীরা হাত ধরে। সদা-সতর্ক তাদের দৃষ্টি।

পরের বছর জুন মাসে এখানে অনেকখানি বরফ ছিল। সঙ্গী পাহাড়ীরা সঙ্গে কুড়ুল এনেছিল। তাই দিয়ে বরফের উপর কেটে কেটে পা রাখার জায়গা—steps তৈরি করে দিয়েছিল। বছরের সে-সময়ে এ-পথে আরও কয়েক জায়গায় বরফ পেয়েছিলাম। সেপ্টেম্বরে বরফ সবচেয়ে কম থাকে। অক্টোবরের পর থেকে আবার নতুন বরফ পড়তে শুরু করে।

বরফ পার হয়ে নজর পড়ে পথের দুইদিকে প্রকাণ্ড সাদা সাদা ফুল। দুই হাতের মিলিত মুঠা ভরে ধরা যায় এক একটি ফুল। মাটি থেকে শুধু একটি ডাঁটি —তিন-চার হাত উঁচু; লম্বা পাতা—ক্যানা গাছের মত। তারই ডালে একটি করে সাদা ফুল। অপূর্ব সুন্দর। তীব্র সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়েছে।

এই-ই ব্রহ্মকমল।

বৃহদাকার শ্বেত পদ্মের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

লোকপালে-হেমকুণ্ডে পূজার জন্য সকলে কমলফুল তুলি।

পাহাড়ীরা জানায়, সেখানে কুণ্ডের ধারেও অজস্র পাবেন।

ভাবি, এই-ই তো দেবতার পূজার ফুল। দিব্যকান্তি, দিব্যগন্ধী, শুচি-শুভ্র।

শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে কমলফুলে শ্রীকেদারনাথেরও পূজার প্রথা আছে। কেদারনাথের উপরে পাহাড়ের মাথায় বাসুকী-তালের পথে কমল ফোটে। প্রতিদিন তখন সেখান থেকে ফুল আনা হয়।

কেদারনাথে গতবার ভাদ্র-আশ্বিনে গিয়েছিলাম। লোক পাঠিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝুড়ি ভরে কমলফুল আনানো হয়েছিল। শ্রীকেদার-নাথের পাষাণময় লিঙ্গমূর্তি সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে সাদা ফুলের আবরণে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিলাম। আপন হাতে দেবতার মূর্তি সাজানোর অসীম আনন্দের স্বাদ সেদিন সত্যই উপভোগ করেছিলাম। আবার মনেও হয়েছিল, দেবতার গড়া মানুষ, দেবতার সৃষ্ট ফুল,—সেই মানুষই স্বকল্পিত দেব-মূর্তিকে তাঁরই রচিত ফুলে সাজাবার ভরসা রাখে! গঙ্গার জলে গঙ্গার পূজা করে।

কমল হাতে শিশিরবাবু বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকাতে থাকেন, বলেন, ভগবানের কি আশ্চর্য সৃষ্টি! ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি—চোখেও দেখেছি—কমল ফোটে চিরকাল জলে। স্থলপদ্ম স্থলে হয় বটে, কিন্তু কমলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কই! এখানে দেখছি—পাহাড়ের ওপরে কমল ফুল! ভাল কথা, মানস-সরোবরে পদ্ম ফুটতে দেখেছিলেন?

উত্তর দিই, ফোটে বললে হয়তো স্বাভাবিকই শোনাত, কেন না, সরোবরেই তো পদ্ম ফোটার কথা। আর আমাদের মনে মানস-সরোবরের নামের সঙ্গে পদ্মফুলের স্মৃতি যেন জড়িয়েই থাকে। কালিদাসও বর্ণনা করেছেন, 'হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্য',—অথচ, স্বর্ণপদ্ম তো দূরের কথা, কোন পদ্মই সেখানে দেখা যায় না। পুরাকালের কথা জানি না। আমরা তো সেখানে ফুটতে দেখি নি, কেউ দেখেছেন বলে শুনিও নি, অভিজ্ঞ পর্যটকদের বই-এও উল্লেখ পাই নি।

মানস-সরোবরে পদ্ম নেই!

শিশিরবাবু আশাহত হন।

যুক্তি দেখিয়ে বলি, তবে একটা কথা। সরোবর নাম হলেও প্রকৃত সরোবর তো নয়। হয়তো দেবতাদের সরোবর, কিন্তু মানুষের কাছে সমুদ্র! মানস-সরোবরের ব্যাপ্তি হল প্রায় দু'শত বর্গমাইল! প্রতিদিন একটু বেলা হলেই তিব্বতের সে-অংশে ঝড়ের মত বাতাস ওঠে, মানসের জলে ঢেউ তোলে। সমুদ্রের মতনই কূলে ঢেউ ভাঙে।—সমুদ্রে তো পদ্ম ফোটার কথা নয়!

কমল হাতে শিশিরবাবু মনোমুকুরে মানস-সরোবরের ছবি দেখেন।

হঠাৎ কলকাতার বন্ধুদের কথা তাঁর স্মরণ হয়। বলেন, ফেরার পথে যেন মনে রাখবেন তাঁদের জন্যে কমল তুলে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

ফেরবার পথে একরাশ সংগ্রহ করে সঙ্গে নেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু কয়দিন পরেই ফুলগুলি অলকানন্দার জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। হিমরাজ্যের কমল, নিম্নপ্রদেশের প্রখর উত্তাপ সইতে পারে না। ম্লান হয়ে নষ্ট হয়।

পাহাড়ীরা বলেন, রৌদ্রে ভাল করে শুকিয়ে রাখলে অনেকদিন থাকে। থাকে বটে, দেখেছিও। কিন্তু সাদা রঙ্ বিবর্ণ হয়—বালির কাগজের ফুলের মত মনে হয়। মন্দিরে অর্ঘ্য দেওয়া ফুল ঐভাবেই তুলে রাখে, পাণ্ডারা যাত্রীদের দেনও।

আর অল্প একটু চড়াই। পথ এঁকে-বেঁকে উঠেছে। ঘাড় তুলে শিশিরবাবু দেখেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত পাথর। প্রকৃতির কঠোর রূপ। তারিই মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে—কে যেন চুন লেপে দিয়েছে। কোথাও বা বরফ-গলা জল ঝরণার আকারে পাথরের গা বেয়ে নেমে চলেছে। বরফেরই মত ঠাণ্ডা জল।

চড়াই শেষে পাহাড়ের মাথার উপরে পৌঁছে, দাঁড়াই। যে-পথ দিয়ে উঠে এলাম সেদিকে ফিরে তাকাই। বহু নীচে পাহাড়ের কটিদেশে ঘন বনের সবুজ মেখলা। তার উপরে পাহাড়ের অনাবৃত অঙ্গ। শুধু পাথর। এত দূর থেকে সেখানকার ফুলের বাহার চোখে পড়ে না। শুধু বড় বড় ঝরণার উচ্ছৃঙ্খল ধারাগুলি দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে আঁকা সাদা খড়ির রেখার মত মনে হয়। আমাদের ছেড়ে-আসা পথের সুদীর্ঘ চিহ্নটিও দেখা যায়। যেন, কালো শ্লেটে ধূসর একটা ক্ষীণ লাইন্। এখান থেকে দেখে মনে হয়, অত সরু পথে এলাম কি করে? অথচ আসার সময় দেখেছি এমন কিছু সঙ্কীর্ণ নয়, ভয়াবহও নয়।

পাহাড়ের অপর দিকে তাকিয়ে দেখি। পথ আবার ধীরে ধীরে নেমে গেছে। সেদিকে চারিপাশে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। নীচে শিখরগুলির পাদমূলে একটি সুন্দর হ্রদ। স্বচ্ছ সবুজ জল। শিখরদেশ থেকে কোথাও বা হিমবাহ (glacier) নেমে হ্রদের জলে পড়েছে। একদিকে কুণ্ডের জল থেকে ক্ষীণকায়া একটি নদীর ধারা বেরিয়েছে। পাহাড়ীরা বলে, লক্ষ্মণগঙ্গা। ভুন্দর নদীর অপর নাম। আসার পথে এরই ধারাকে পাহাড় থেকে উদ্দাম বেগে নামতে দেখেছিলাম—জলপ্রপাত রূপে। Valley of Flowers থেকে নেমে-আসা ভুন্দর নদীর অপর ধারাটির সঙ্গে ঘাংরিয়ার নীচে উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে।

পাহাড়ী সঙ্গীরা উত্তর-পূর্ব দিকের বরফের পাহাড় দেখিয়ে বলেন, ঐ হল সপ্তশৃঙ্গ শিখর। আর দক্ষিণ-দিকের ঐ পাহাড়ের চূড়ার কাছে কাক-ভূষণ্ডী। ভুন্দর গ্রামের কাছে কাক-ভূষণ্ডী গঙ্গা;—তার উপত্যকা দিয়ে যেতে হয় ওখানে। তিন-চার দিনে ঘুরে আসা যায়। বরফের মধ্যে সেখানেও হ্রদ। হেমকুণ্ডের মত।

জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুরাণের সেই অমর কাকের দেখা পাওয়া যায় নাকি? শুনি, এরা কেউ সেখানে যান্ নি। অতি দুর্গম পথ। সাধু-সন্ন্যাসীরাও ক্বচিৎ কখনো যান্।

হ্রদের দিকে নামতে শুরু করি। এতক্ষণ চড়াই ওঠার শারীরিক ক্লান্তি ছিল। পাহাড়ের উপর একটু দাঁড়াতেই সে-ক্লান্তি দূর হয়। হিমাঞ্চলের হাওয়ার এমনি স্নিগ্ধ প্রভাব। নবীন উৎসাহে নেমে চলি। অল্পই পথ। খানিকটা নামতেই সঙ্গী পাহাড়ীরা জানান, এবার পায়ের জুতা খুলতে হবে। এ তো মানুষের গড়া মন্দিরে প্রবেশ নয়। সবটাই দেবতার স্থান। তাঁর অন্দর-মহল। এই পাথরগুলির পর আর জুতা চলে না ; হ্রদের চারিপাশে এর পর আর কোথাও অপরিষ্কার করাও চলে না। সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউ কখনো এখানে থাকলে তাঁরাও প্রয়োজন-মত এ-এলাকার বাইরে চলে আসেন। জলও অপরিষ্কার হবার উপায় নেই। কাছে গিয়ে দেখবেন। যদি কখনো কিছু —ঘাসপাতাও—বাতাসে উড়ে এসে পড়ে—কোথা থেকে পাখীও উড়ে আসে, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। দেবতার অদ্ভুত লীলা।

হ্রদের কিছু উপরে একটা উঁচু টিলার উপর গভর্ণমেণ্টের আবহাওয়া বিভাগের যন্ত্রপাতি। টেবিলের মত উঁচু-করে রাখা কাঠের বাক্সের মধ্যে সাজানো। বরফ ও বৃষ্টিপাত এবং তাপমান ইত্যাদির মানযন্ত্র। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপরাজ্যে দৃষ্টিকটু লাগে।

অমরনাথ দেখে বলে, কয়েকটি যন্ত্র কাজ করছে না, খারাপ হয়েছে দেখছি। অথচ নিয়মিত রিপোর্ট বোধ হয় চলেছে অফিসে। নীচে থেকে একজন মাঝে মাঝে এসে রিপোর্ট পাঠায়। এখন সন্দেহ হয়, আসে কিনা!

এই অঞ্চলের নাম লোকপাল। হ্রদের নাম হেমকুণ্ড।

প্রায় গোলাকৃতি হ্রদ। আধ মাইলের উপর চওড়া। পরিধি এক মাইলের বেশী।

আবহাওয়া-বিভাগের টিলা থেকে নেমে কুণ্ডের ধারে শিখদের গুরুদ্বার। নতুন গৃহ। পাথর গেঁথে তৈরী। পরিষ্কার একখানি বড় ঘর। হ্রদের দিকে মুখ করা। ঘরের ভিতর গুরুগোবিন্দ সিং-এর ছবি, গ্রন্থ-মহারাজও আছেন। ঘরের বাইরে হ্রদের তীরে পতাকা-স্তম্ভ। গোলাকৃতি একটি পাথরের বেদী, তারই মধ্যে প্রকাণ্ড লম্বা কাঠের খুঁটি। কাপড় দিয়ে সবখানি জড়ানো। মাথার উপর নীল পতাকা। স্তম্ভমূলে বেদীর উপর যাত্রীদের রেখে যাওয়া ব্রহ্মকমলের গুচ্ছ। আমরাও সেখানে ফুল সাজাই।

হ্রদের ধার দিয়ে বাঁ দিকে অল্প গিয়েই লক্ষ্মণগঙ্গার উৎপত্তি। হ্রদের

জলের এই একটি মাত্র নিকাশ পথ, শুনলাম। হ্রদের জলরাশি স্থির শান্ত। নদীর উৎস-মুখে গতির বেগ, মুক্তির আনন্দ। চারিদিকে ছড়ানো পাথরের উপর খেলা করে জল ছোটে—ছলছল কলকল। যেন মার কোল থেকে নেমে টল্‌মল্‌-করে-চলা শিশুর প্রাণখোলা মধুর হাসি। ধারার উপর কাঠ ও পাথর সাজিয়ে ছোট পুল। অল্প জল—পড়ার ভয় নেই, পড়লেও ক্ষতি নেই।

ধারার ধারে ধারে চারিদিকে ফুল। নানারকম চারাগাছও আছে।

পাহাড়ীরা জানায়, জড়ি-বুটি সব। এর মধ্যে নানা রকম ওষুধ তো আছেই, এমন কি মরা-মানুষও বাঁচে এমন শেকড়ও আছে।—উৎসাহের সঙ্গে মাটি খুঁড়ে শিকড়-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

অমরনাথ সাবধান করিয়ে দেয়, ভাল গুণ আছে অনেক শিকড়ের, ঠিকই। কিন্তু তেমনি আবার প্রচণ্ড বিষাক্তও আছে। মুখে লাগলে আর বাঁচবার কোন উপায়ই থাকে না। ভাল ভাবে জানা না থাকলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে—বাইরে থেকে দেখতে অনেক সময় একই রকম লাগে। এই যেমন এই চারাটা দেখছেন—এর শিকড়ের ভাল গুণ আছে, ঐ যে চারাটা—একই রকম দেখতে মনে হয়—কিন্তু কোথায় কি তফাৎ আমি জানি—ওটা বিষাক্ত।

বটানিস্ট বিপুলও সম্মতি জানায়,—চারাটির নাম বলে।

অমরনাথ বলে চলে, কিন্তু ক'টা গাছই বা আমরা এর মধ্যে চিনি? আমাদের স্বাধীন দেশে এখন এইসব জড়ি-বুটি সম্বন্ধে ভাল ভাবে রিসার্চ হওয়া উচিত। অনেক নতুন ওষুধ বার হবে, মানুষের উপকার হবে।

শিশিরবাবু বলেন, হনুমান তো এসেছিলেন এই হিমালয়ে বিশল্যকরণীর সন্ধান করতে এবং শেষ পর্যন্ত গন্ধমাদন পর্বতই তুলে নিয়ে গেলেন। বদরীনাথের এইসব গিরিশ্রেণী সেই গন্ধমাদনের অংশ শুনি!

পাহাড়ী সঙ্গীরা গল্প করে যান, হিমালয়বাসী কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসীরা এখনও এইসব জড়ি-বুটি সম্বন্ধে খবর জানেন। নিজেরা ব্যবহারও করেন, তাই দীর্ঘজীবীও হন। একবার এই অঞ্চলে কোথায় কোন এক সাধু এক মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন একটা শেকড় ব্যবহার করে। তার পর আর এক জন লোক সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে অমরত্বের লোভে শেকড় তুলে খান, ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক জিনিস চিনতে পারেন নি!

অমরনাথ বলে, সেইজন্যেই তো সাবধান করছিলাম। তবে তোমরা অবশ্য আমাদের চেয়ে বেশী চেনো এই সব গাছ।

কাছেই হ্রদের ধারে ধর্মশালা। পাথরের তৈরী লম্বা একখানি ঘর। ঘরের ভিতর অনেকগুলি চেরা কাঠ রয়েছে। তক্তাও জড়ো করা আছে। ধর্মশালার দরজার বাইরে দু'দিকে মাটিতে পাথরের উপর দেখি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আমাদের কুলী দুটি। বদরীনাথের দু' মাইল উপরে মানাগ্রামে এদের ঘর। এবার যখন শতোপন্থ যাই, তখন আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। সেখানে পাহাড়ের নিম্নদেশের লোকেরা বরফের উপর মাল বইতে পারে না। সেখান থেকে ফিরে আসার পরও এই মানাগ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজী হল না। বলে, আপনাদের তো মাল নিয়ে যাবার জন্যে লোকের দরকার হবেই। আমরাই নিয়ে যাব। আপনাদের সঙ্গে লোক-পালও আমাদের দেখা হয়ে যাবে। তার পর পিপুলকোটি পর্যন্ত গিয়ে আপনাদের বাস্‌-এ তুলে দিয়ে ফিরব।

প্রতি লোক দৈনিক চার টাকা হারে নেয়। তাদের কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিপুলকোটি যাওয়া হয় নি। যোশীমঠ থেকেই ফিরতে বাধ্য হয়। পাহাড়ের নীচের দিকের গরম সহ্য করতে পারে না। অথচ আমাদের কাছে যোশীমঠ ঠাণ্ডা জায়গা!

প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের স্বভাব, শক্তি গড়ে উঠে। শুধু মানুষই বা কেন? কমলফুলগুলিও তো নীচের গরমে নষ্ট হয়ে যায়।

ঘুমন্ত কুলী দুটির ছবি তুলতে যাই। পায়ের শব্দে জেগে ওঠে। এক জন চোখ বুজেই মুচ্‌কে হাসতে থাকে। অপরটি রোদ আটকাবার জন্যে চোখের উপর হাত রেখে আড়াল দিয়ে দেখে। সে-ও হাসে।

কঠিন পাথরের উপর ধূলি-শয্যা। তুষার-রাজ্যে রৌদ্রের স্নিগ্ধ প্রলেপ। প্রকৃতির সহজ সামান্য দান। কিন্তু কি অসামান্য আনন্দ আনে এই অতি সাধারণ, স্বল্প-তুষ্ট মানুষগুলির মনে! নিবিড় শান্তিময় প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি।

ভাবি, শহর-সভ্যতার অত ধন-সম্পদ; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অত আড়ম্বর। তবুও সেখানে মনের এই অনাবিল সহজ শান্তির সন্ধান মেলে কই?

ধর্মশালার সামনে জলের ধারে ছোট একটি পাথরের মন্দির। লোক-পালের। ভিতরে একদিকে কালো পাথরের একটি ছোট মূর্তি। পূজারত। জটাজূট। এক হাত হাঁটুর উপর রাখা, অপর হাতে জপমালা। প্রবাদ, শ্রীরাম-সহোদর লক্ষ্মণজির মূর্তি। হেমকুণ্ডের তীরে তিনি দীর্ঘ তপস্যা

করেছিলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের নামের সঙ্গেও যোগা-যোগের জনশ্রুতি আছে। অথচ, মূর্তিটি প্রাচীন বলে মনে হয় না। মন্দির বা মূর্তির মধ্যে চারুকলার সুন্দর নিদর্শনও পাওয়া যায় না।

মন্দিরের অপর কোণে ছোট ছোট আরও দুটি মূর্তি আছে। গণেশ ও লোকপাল। সে-ও প্রাচীন নয়। কিন্তু, স্থানটির প্রাচীনতা সম্বন্ধে পুরাণে প্রমাণ দেয়। নামকরণেরও কারণ পাওয়া যায়।

শিব-শঙ্কর আত্মজ কার্তিকেয়ের কাছে বদরিকাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করছেন। বহু তীর্থ-প্রতিষ্ঠার পবিত্র কাহিনী। নারায়ণ বিষ্ণু এসে বদরী-ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেছেন। নর-পর্বতে সুমেরু-শিখরে ভ্রমণ করেন। একদিন ভ্রাম্যমান শ্রীহরির কাছে ঋষিরা এসে অভিযোগ জানান যে লোকপালগণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন, তাই তাঁদের স্বতন্ত্র বাস প্রয়োজন, তাঁদের সান্নিধ্য তপস্যার বিঘ্ন ঘটায়। শ্রীহরি তখন লোকপালগণের অধিষ্ঠানের জন্যে নর-পর্বতের এক রমণীয় প্রান্তে এই পরম-তীর্থ স্থাপনা করেন। তারপর শৈলদণ্ডের আঘাতে পর্বত-ভূমি খনন করে সুমনোহর ক্রীড়া-পুষ্করিণী নির্মাণ করেন। দণ্ড-পুষ্করিণী। চারিদিকে তার সুরম্য উদ্যান।

'বনানি কুসুমামোদ রম্যাণি।'

পুরাণ-কাহিনী। সত্যাসত্যের প্রমাণ নেই। কিন্তু ভাবি, হিমালয়ের এই নর-পর্বতের নিভৃত অঞ্চলের অপূর্ব পুষ্পরাজ্যের ও হ্রদটির সংবাদ পুরাণকার রাখলেন কি করে? তখনও কি তীর্থযাত্রীর যাত্রা চলেছিল এই দুর্গম তীর্থে?

যুগ-যুগান্তরের কুসুম-শোভা। পুরাণ-কাহিনীর সৌরভ-ভরা। শাশ্বত, সুন্দর। কলির কালক্ষেপেও এখনও, অম্লান। তাই দেখি, অতি-আধুনিক যুগেও সুদূর পাশ্চাত্যদেশের বহুদর্শী বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টিতেও এখনও বিপুল বিস্ময় আনে এই অঞ্চলের পুষ্প-সমারোহ।

মানুষের গড়া নয়,—দেবতার সাজানো বাগান—শুকানোর কথা নয়।

মন্দিরের পিছনেই হ্রদ। তীরের কাছে জলের মধ্যে ছোট বড় নানা আকারের পাথর। তারই একটির উপর একান্তে বসি।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলরাশি। পরপারে চারিদিকে বিশাল গিরিশ্রেণী। তারই উপর হংস-শুভ্র তুষার আবরণ। মে-জুন মাসে হ্রদের জলেও কোন কোন অংশে বরফের আচ্ছাদন দেখেছি। পাহাড়ের কোথাও বা তুষার-মুক্ত অনাবৃত

অভ্রের রুক্ষ ধূসর বর্ণ। উপরে গাঢ় নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া অচল হিমাচলের সাদা বরফের উপর মায়া-জাল ফেলে বিচরণ করে। চারিদিক নীরব, নিশ্চল, গতিহীন। শুধু এই আলো-ছায়ার শব্দহীন সঞ্চরণ গতির ছন্দ জাগায়।

আসার সময় পাহাড়ের উপর থেকে জলের রঙ্ চোখে লেগেছিল সবুজ। এখন বিস্মিত হয়ে দেখি, হ্রদের জলে কি অপরূপ বর্ণ-বিন্যাস! প্রকৃতি-দেবী যেন জলমুকুরে তাঁর রূপসজ্জা দেখছেন। আকাশের গ ভীর নীল, পাহাড়ের ধূম্র কালো রঙ্, তুষারের শুভ্র রূপ—হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

যেন, কোন্ এক বিরাট শিল্পী সজল পটভূমিতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক অতিকায় বহুবর্ণ চিত্র এঁকে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

হঠাৎ মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। বাড়িতে দুর্গাপূজা। বিজয়া দশমী। সকালে পূজা-শেষে দর্পণে প্রতিমা-নিরঞ্জন হয়। প্রতিমার পায়ের কাছে জল-ভরা একটি বড় গামলা। তার ভিতর ভাসানো একটি দর্পণ। সেই দর্পণে দশভূজার চরণ-দর্শন হয়। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সকলের সে কি উৎসাহ! মেঝের উপর মাথা নত করে দর্পণে মায়ের চরণ সন্ধান। ঐ যে সিংহের পিঠের উপর রাখা চরণখানি দেখতে পাওয়া যায়! কিন্তু আর একটি? আর একটি কই? অসুরের কাঁধে রাখা চরণখানি? ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে ফিরে দর্পণের আশেপাশে খুঁজি। ঐ যে দেখেছি! আলতা-মাখা মায়ের সেই চরণখানিও—সবুজ-বরণ অসুরের কাঁধে-রাখা রক্ত-রাঙা যেন রাঙাজবা!

আজ প্রকৃতির এই সলিল-দর্পণে জগজ্জননীর সেই অলক-রঞ্জিত চরণের সন্ধান দেবে কে, তাই ভাবি।

সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টারে ফিরি খুঁজিয়া।

কাঠের লম্বা টানা বারান্দা। সামনে কাঠের রেলিঙ্। উপরে করোগেটের ঢালু ছাদ। দোতলার বারান্দায় চেয়ার বার করে বসি।

সুমুখে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। মাথায় তার বরফের আবরণ।

নীচেই অলকানন্দা নদী। তুষার-রাজ্যের রাজকন্যা। গিরি-প্রাসাদের সোপান বেয়ে ছুটে নেমে আসে। উচ্ছলিত কলোচ্ছ্বাস। যাত্রাপথে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পথরোধ করে। রোষদীপ্তা স্রোতস্বিনী ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত সহস্র ফণা তুলে আঘাত করে। চকিতে কলহাস্যের বিপুল রোল তুলে পাথরের পাশ কেটে ছুটে নেমে যায়। পিছনে ধেয়ে নামে অচ্ছেদ্য অনুচরী অগণিত জলের ধারা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ছুটে চলে। নিমেষে অদৃশ্য হয়। আবার নতুন ধারা নামে। ছল্ছল্ কল্কল্ ছুটে যায়। এ-নামার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। যুগ-যুগান্তরের যাত্রা-কাহিনী।

নদীর সেই চিরন্তন যাত্রা-পথের পাশেই তীর্থ-যাত্রীর যাত্রা এসে সাঙ্গ হয়। সে-যাত্রারও স্রোত চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

বদরিকাশ্রম।

'বদর্য্যাখ্যং মহাপুণ্যং ক্ষেত্রং সর্ব্বার্থসাধনম্।'

সর্বার্থসাধন অতি-পবিত্র বদরীক্ষেত্র।

সুন্দর, সুসজ্জিত, পাথরের বাড়ির বারান্দায় বসে ভাবি, এই সেই তীর্থক্ষেত্র!

'ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।'

শুধু তাই?

ক্ষেত্রস্য স্মরণাদেব মহাপাতকিনো নরাঃ।
বিমুক্ত কিল্বিষাঃ সদ্যো মরণান্মুক্তিভাগিনঃ॥

এই তীর্থের শুধু স্মরণমাত্রেই মহাপাতক মানুষও অচিরে পাপমুক্ত হয়। মৃত্যুভয় দূর করে মুক্তিভাগী হয়।

আরও আছে।

অন্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ পরমদারুণম্।
তৎসমা বদরীযাত্রা মনসাপি প্রজায়তে॥

অন্য তীর্থে কঠোর তপশ্চর্যার যে ফল, শুধু মনে মনে বদরী-যাত্রা চিন্তা করলেও তার সমতুল ফল লাভ হয়।

অতএব,—

বহূনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে।
বদরীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী-তুল্য তীর্থ হয়নি, হবেও না।

স্কন্দ-পুরাণের তীর্থ-মাহাত্ম্য-কাহিনী। শাস্ত্র-বাচন।

এখন সেখানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর তলায় বসে পুরাণ-কাহিনী পড়ি। ভাবি, কোথায় সে-বদরী-বৃক্ষ, কোথায়ই বা সে-আশ্রমের শান্তি!

যতো দুরূহ তীর্থ, ততোই তীর্থ-মাহাত্ম্যের গরিমা। তাই, হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়, ছোট বড় শত সহস্র মন্দির। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নিভৃতে স্বতন্ত্র বাস। দুর্গম,—অতএব দুর্লভ। দুর্লভ, তাই লাভে মহান্ পুণ্য।

কিন্তু, এখন সভ্যতার যান চলাচলে দুর্গম সুগম হয়েছে, তাই দুর্লভও সহজলভ্য হয়েছে। যাত্রী চলেছে দলে দলে—সহস্র সহস্র। বদরী-নারায়ণের ছোট সহর জন-কলরোলে মুখরিত। সহরের সভ্যতা-সম্পদে সমৃদ্ধ। এখন এ-যাত্রাপথে হারিয়ে গেছে কষ্ট স্বীকার করে দুর্লভকে পাওয়ার মনের অসীম আনন্দ।

ওপারে সরকারী হাসপাতাল, জেলখানা, ডাকবাংলো ছাড়িয়ে এসে অলকানন্দার উপর লোহার পুল। পুল পার হয়ে এ-পারে সহর সুরু। পাথরে-বাঁধানো সোজা সরু পথ। দুইদিকে সারি সারি বাড়ি। পোষ্টঅফিস্, দোকান, ধর্মশালা। পথের দক্ষিণে বাড়িগুলির পিছনে অল্প নীচে নদী। বামে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উঁচু স্তর উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে বাড়িও উঠেছে। কিছুদূর এসে পথের উপর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একপাশে নদীর দিকে পাথরে-বাঁধানো বসবার জন্যে লম্বা জায়গা। পাহাড়ের দিকে মন্দিরের সোপান উঠেছে। সোপান-শেষে প্রকাণ্ড তোরণ। কারুকার্যখচিত।

দক্ষিণে নদীর দিকেও সোপানের আর এক ধারা নেমে গেছে। অলকানন্দার ঘাটে ও তপ্তকুণ্ডে। মন্দির ছাড়িয়েই পথের ডানদিকে সুন্দর একটি বাড়ি। মন্দিরকমিটির অতিথি-শালা।

তারই একটি ঘরেতে থাকি।

সেক্রেটারী সাদর অভ্যর্থনা করে বলেন, পথের দিকের ঘরগুলিতে যাত্রীর কোলাহল। নদীরদিকের ঘরটি শান্ত—যেখানে প্রতিবছরই থাকেন, এবারও সেই ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে।

তাই থাকিও। নদীর ধারে এই ঘরটিতে শান্তি আছে, শোভাও আছে। ভোরে উঠে বারান্দায় বসে সে-শোভা উপভোগ করি।

বদরীনাথ উঁচু জায়গা। ১০,১৫৯ ফিট। শীত থাকাই স্বাভাবিক। তবুও, ভোরে ওঠার অসুবিধা নেই। যা কিছুর প্রয়োজন, ঘরের সঙ্গেই তার সুব্যবস্থা আছে। গরম জলেরও কোন অভাব নেই। যে কোন সময় তপ্তকুণ্ড থেকে বালতি ভরে আনলেই হয়।

বারান্দার নীচে নদীর নতুন ঘাট বাঁধানো হচ্ছে, দেখি। তপ্তকুণ্ডের কাছ থেকে লম্বা টানা সেই ব্রহ্মকপালীর শিলা পর্যন্ত। যাত্রীদের বেড়াবার, বসবার রম্যস্থান হবে। ভাবি, নদীর দুর্দান্ত স্রোতে রাখবে তো? না রাখলেই বা ক্ষতি কি? নদীর কূলে প্রকৃতির ছড়ানো পাথরগুলির উপর বসার আনন্দ কি কম?

ওপারে ছোট ছোট কয়েকটি কুটি! বদরিকাশ্রমে যে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী এখনও একান্তে থাকেন, ঐ-পারে তাঁদের বাস। প্রতি বছর এ-পারে বারান্দায় বসে তাঁদের দেখতে পাই। কেউ নামছেন নদীর তটে, কেউ বা চলেছেন উপরে এক ঝরণার ধারে। কারো গেরুয়া বাস, কারো বা কৌপীনসার। এ-পারে বসেও ও-পারের শান্ত আবহাওয়ার শান্তি অনুভব করি। পাহাড়ের সবুজ-অঙ্গে গেরুয়া রঙের কয়টি ফুল যেন বাতাসে দুলে যায়!

সেক্রেটারী বলছিলেন, এবার অলকানন্দার ওপর নতুন ব্রীজটা তৈরী হয়ে গেল, দেখছেন?

দেখি বটে। সুন্দর লোহার পুল। তপ্তকুণ্ডের নীচেই।

এই নতুন পুল-তৈরীর ইতিহাস আছে।

অলকানন্দার দুই তীরে দুই গিরিশ্রেণী। বামে নর-পর্বত। দক্ষিণে নারায়ণ-পর্বত। যেন, নর-নারায়ণের সম্প্রসারিত দুই বাহুর আবেষ্টনে উৎফুল্লা পার্বত্য নদী তরঙ্গ-ভঙ্গে বয়ে চলেছেন।

নারায়ণ-পর্বতের কোলে বদরীনারায়ণের মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে সহর উঠেছে। সহরের পিছনে নারায়ণ-পর্বতের উচ্চ শিখর। গ্রীষ্মকালেও স্বল্প তুষারাবৃত! তার পিছনে আকাশ-চুম্বী নীলকণ্ঠ শিখর। চির তুষার-আচ্ছন্ন। ২১,৬৪০ ফিট উঁচু। বদরীনাথ সহর থেকে এই শিখরের দর্শন মেলে না। সহরের সমীপবর্তী গিরিশ্রেণী দৃষ্টিপথ রোধ করে। নদীর অপর পার থেকে নীলকণ্ঠের অনুপম শোভা চোখ ও মন আকর্ষণ করে। হিমালয়ে এর চেয়ে আরো-উঁচু শিখর বিরল নয়। কিন্তু, এমন কমনীয় কান্তি ক্বচিৎ দেখা যায়। বিদেশী পর্যটকও এর শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেন: The Queen of Garhwal।

ভারতবাসীর কানে নীলকণ্ঠ নাম আরও মধুর শোনায়। শুভ্র জটাজুট। যোগীশ্বর নীলকণ্ঠ। ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব।

ওপার থেকে অবাক্ হয়ে দেখি। পাণ্ডাজি বলেন, চূড়ার নীচে দেখেছেন? সাদা বরফের মধ্যিখানে হঠাৎ খানিকটা কালো দাগ। নীলকণ্ঠ যে!

কালো চিহ্নটি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে অলৌকিক কোনও কারণ নেই। কেন না, বুঝি, পাহাড়ের ঐ অংশের মসৃণ অঙ্গ এমনি সোজাভাবে নেমেছে যে বরফ পড়লেও স্থায়ী হয়ে ওখানে থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। তবুও, শিখরের ঠিক কণ্ঠদেশে এমন চিহ্নটির সঙ্গে নামকরণের আকস্মিক যোগাযোগ যুক্তিবাদী মনেও ক্ষণিক আনন্দ আনে।

কিন্তু, সৌন্দর্যেরও বিপদ আছে।

সহরের ঠিক মাথার উপরে ও অতি-সন্নিকটে তুষার-শীর্ষ শিখর। শীতকালের পর যখন বরফ গলে তখন অতিকায় তুষারের ধস্ (avalanche) পাহাড়ের উপর থেকে হঠাৎ নেমে আসে। সহরের অংশ ধ্বংস করে।

১৯৫২ সালের কথা। সে-বছর যখন আসি, তার কিছুদিন আগেই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পৌঁছে দেখি, সহরের চারিদিকে ধ্বংসের লীলা। তুষার-বন্যা-বিধ্বস্ত। যেন, ভূকম্পনের পর করুণ দৃশ্য। এই অতিথিশালাটিরও এক অংশ ভেঙে গিয়েছিল। সেই সব ভাঙা অংশের

গহ্বরে তখনও বরফের স্তূপ জমে রয়েছে। তবে, বহু ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয় নি। কেন না, সাধারণতঃ যে-সময়ে এই সব বরফ গলে নেমে আসে, তখনও মন্দির খোলে না। সহরবাসীরাও এখানে তখন থাকে না।

মাঝে মাঝে এমন দুর্ঘটনা হলেও মন্দিরটির কোন কালে ক্ষতি হয় না।

স্থানীয় লোকেরা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে বলেন, নারায়ণের অসীম কৃপা!

নদীর অপর পারে নর-পর্বতের কোলে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে সেখানে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। নদী থেকে গিরিশ্রেণী বেশ কিছু দূরে। তাই, শঙ্কিত ও সাবধানী কর্তৃপক্ষের মন ঐদিকে এই বিপদ এড়ানোর উপায় খোঁজে। গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করেন,—নতুন সহর ও-পারে গড়ে তোলা হোক্। শুধু মন্দিরই থাকবে এ-পারে। দেবতাকে স্থানচ্যুত করার বাধা ও আপত্তি আছে।

সেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রথম সূচনা,—পারাপারের এই নতুন সেতু।

পূর্বে অপর পারের সাধুদের কুটিতে যাতায়াতের পথ ছিল—প্রায় আধ মাইল আগে সহরের প্রবেশ-পথের কাছে পুরান সেতুটি। সেখান দিয়ে—অর্থাৎ প্রায় মাইলখানেক ঘুরে গেলে, তবে সহর থেকে ঐ সব কুটিতে পৌঁছানো যেতো। যাত্রীদের নিত্য যাতায়াতের পথে নয়। দর্শন-প্রার্থী যাত্রীরাই শুধু যেতেন।

সেক্রেটারী নতুন পুলটি দেখিয়ে বলছিলেন, এখন কতো সুবিধে হয়ে গেল। যাত্রীরা এখন এপারে সোজা মন্দিরে এসে উঠবে। এরি মধ্যে অনেকে এ-পুল দিয়ে যেতে আসতে সুরু করেছে। ও-পারে বড় সড়কও হচ্ছে, নতুন খুব ভালো একটা ধর্মশালা তৈরীরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাতে আপনাদের সব রকম আয়োজন থাকবে।

এমন জায়গায়, এমন সুন্দর লোহার পুল করায় মানুষের বাহাদুরি আছে, স্বীকার করি। আবার প্রশ্নও করি, কিন্তু, সাধুদের হবে কি?

সেক্রেটারী বলেন, কেন? তাঁদেরও ত মন্দিরে ও তপ্তকুণ্ডে আসা কতো সহজ হয়ে গেল। এক মাইল ঘুরে আসতে হবে না। যাঁরা মন্দিরে প্রসাদ বা ক্ষেত্রগুলিতে ভাণ্ডারা নিতে আসেন—তাঁদেরও যাতায়াতের কতো সুবিধা হয়ে গেল!

হেসে বলি, সুবিধে বটে! সদর রাস্তার ওপর এখন তাঁদের কুটিগুলি

পড়ল। শুধু যে স্বতন্ত্রতা হারালো, তাই নয়, সকাল থেকে এখানে বসে দেখছি, সারি সারি যাত্রী চলেছে পুল দিয়ে অপর পারে। সাধু-সন্দর্শনে নয়, লোটা-হাতে!

সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করি, সহরের উন্নতি হচ্ছে; বড় রাস্তা খুলছে; তার ওপর সাধুদের কুটি পড়লো। এর জন্যে betterment levy বা কোন ট্যাক্স বসবে না?

সেক্রেটারী হাসেন। বলেন, ঠাট্টা করছেন আপনি। যেমন দেবতার মন্দির, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীদের বাসও তো এইসব তীর্থক্ষেত্রের গৌরব। তাঁদের ওপর কর-ধার্যের কথা ভাবতেই পারা যায় না।

আমি বলি, তা হলে এখন ভাবতে শিখুন। স্বাধীন ভারতে কোথাও কোথাও সুরু হয়েছে যে! শুনুন্ তবে উত্তরকাশীর এক সাধুর চিঠিতে-লেখা খবর।

উত্তরকাশী হিমালয়ের এক বহু প্রাচীন, অতি-শান্ত তীর্থক্ষেত্র। অনেক সাধুসন্তের সেখানে নিভৃত বাস। একান্তে সাধন-ভজন করেন। কঠোর সন্ন্যাসজীবন পালন করেন। প্রবাদ, বারাণসী কাশীতীর্থ মর্ত্যের মানুষের জন্যে, হিমালয়ের উত্তরকাশী দেবতাদের জন্যে। সেখানেও উত্তরবাহিনী ভাগীরথী-গঙ্গা, দুই দিকে বরুণা ও অসি—দুই নদী, গঙ্গার উপর দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির—সব কিছুই আছে। এমন কি, মণিকর্ণিকার ঘাট পর্যন্ত। অবশ্য কাশীর তুলনায় আয়তনে সবই ছোট। সহরও ছোট। তবে ক্রমে ক্রমে সভ্যতার শ্রী ও সম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে। বড় বড় বাড়ীও উঠছে। সেনানিবেশও বসেছে। সহরের বাইরে সাধুদের কুটি ও আশ্রমগুলি। সেবার গঙ্গোত্রী যাবার পথে উত্তরকাশীতে কয়দিন ছিলাম। এক পূর্ব-পরিচিত স্বামীজির আশ্রমেও গিয়েছিলাম। ভাগীরথীর ঠিক উপরেই অতি মনোরম শান্ত স্থান। সহরের বাইরে—একান্তে নিভৃতে। একাই থাকেন। জলের কয়েকহাত উপরেই তাঁর ভজন-কুটি। জিজ্ঞাসা করি, বর্ষায় ঘরে জল আসে না?

বলেন, এখনও তো কোন বছর আসে নি। বেশী জল নামলে—অপর পারে জল ছড়িয়ে যায়; এপারে এখানে এতদূর ওঠে না। অথচ, কি সুবিধে দেখুন, কয় হাত নামলেই গঙ্গার জল। জলের কোন অভাব নেই। সারাক্ষণই ভাগীরথী-তীরে আসন করে আছি। মনে কতো শান্তি ও আনন্দ আনে।

সেই স্বামীজিরই ক'বছর পরে এক চিঠিতে খবর পেলাম। সহরের অনেকরকম উন্নতি সাধন হচ্ছে। জলের পাইপও বসেছে। সহর থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপরের ঝরণার জল সেই পাইপ-এ আনা হয়েছে! তাই, জলের ট্যাক্সও বসেছে। নোটিশ হয়েছে সকলের ওপর—যাঁদের এলাকার সামনে দিয়ে পাইপ গেছে তাঁদেরও ধার্য ট্যাক্স দিতে হবে—তাঁরা পাইপ-এর জল ব্যবহার করুন বা নাই করুন। স্বামীজির উপরও নোটিশ হয়েছে, কেননা, তাঁর আশ্রমের কাছ দিয়ে পাইপ-লাইন গেছে। খবরটি দিয়ে স্বামীজি লিখছেন, পাইপ-এর জলের আমার কোন প্রয়োজন নেই এবং থাকতেও পারে না,—নিজের চোখেই সব দেখে গেছেন। গঙ্গামায়ের কোলের উপরই তো আশ্রয় পেয়েছি। তবুও, ট্যাক্স দেবার দায়িত্ব হয়েছে বলে দাবী করে নোটিশ দিয়েছে। অথচ, বহু বছর হয়ে গেল সব কিছু ছেড়ে হিমালয়ে চলে এসেছি। টাকাকড়ি তো দূরের কথা, পূর্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারো সঙ্গে কোন সংস্রব পর্যন্ত রাখি নি,—রাখার কথাও নয়। এখানে সব মহাত্মাদেরই সেই একই কথা। সবাই একান্তে আপন সাধনভজন নিয়ে আছেন। কোথায় পাবেন ট্যাক্স দেবার টাকা? অর্থ-জালে যদি আবার জড়াতেই হয় ত হিমালয়ে এই সন্ন্যাস-জীবনই নিরর্থক। এখন শুধু ভাবছি কোথায় আবার তিনি টেনে নিয়ে যাবেন!

ভাবি, সহর-লোকালয় ছেড়ে সর্ব-ত্যাগী হয়ে সাধুরা এলেন হিমালয়ে বনবাসে ভগবৎ-সাধনায়, কিন্তু নগর-ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত ভাবে তাড়না করে আসে এঁদেরও পিছনে—এখানেও—করের-কৃপাণ-হাতে!

২

বদরীনাথে একদিন ওপারে গেলাম স্থানীয় ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তার বলে নয়। বাঙালী। তাই, খবর পেতে তিনি নিজেই এসে আলাপ করেন। একদিন রাত্রে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যেও পীড়াপীড়ি করেন। তাতে রাজী হই না। বলি, আপনার বাড়িতে তো নিশ্চয় যাবো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নয়।

তিনি ছাড়েন না। অগত্যা চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

ওপারে হাসপাতালের পাশে তাঁর থাক্‌বার বাড়ি। সরকারী কোয়ার্টার্‌স্‌। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে যাই। সঙ্গে চলেছেন স্থানীয় আর একজন বাঙালী। সেদিনই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এখানে কাজ নিয়ে এসেছেন। কয়েকমাস থাকতে হবে। মন্দিরের কাছে একটি ঘরে থাকেন। একা। একটি পাহাড়ী ছোক্‌রা তাঁর বাড়ির কাজকর্ম করে দেয়।

ভদ্রলোক বলেন, এমনি করেই চলে যাচ্ছে দিন। ক'টা মাস কাটলে বাঁচি। দেরাদুনে জমি কিনেছি কিছু। একটা ছোট বাড়িও করেছি সেখানে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় অল্প যা কিছু আনতে পেরেছিলাম—তাই দিয়ে আবার এক নতুন জীবন সুরু করেছি। স্ত্রী আছেন দেরাদুনে, চাষ করাচ্ছেন সেখানে। ছেলে ও মেয়ে তাঁর কাছে আছে। স্কুল, কলেজে পড়ে—তাই তাদের আসার উপায় নেই। আমি একলাই পড়ে আছি এখানে।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

হেসে বলি, কেন? তীর্থ-বাস হচ্ছে। পুণ্যলাভ করছেন তো!

উত্তর দেন, প্রথম যখন আসি তাই মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু, বাধ্য হয়ে বেশীদিন থাকতে হলে ও-সব ভাব আর থাকে না। সংসারী মানুষ, মশাই!

যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করি, ডাক্তারবাবুর ওখানে প্রায় যান নিশ্চয়?

বলেন, হাঁ। বিদেশে বাঙালী। পরম আত্মীয় মনে হয়। দুটো সুখ দুঃখের কথা মাতৃভাষায় মন খুলে বলা যায়। তা ছাড়া—আরও একটা কারণ আছে।—বলে মুচ্‌কে হাসতে থাকেন। বলেন, সব্জির মধ্যে আলু ছাড়া এখানে খাদ্য তো নেই। মাঝে মাঝে মুখটা ওখানে বদলানো যায়।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, অন্য সব্জি ওঁরা পান কোথায়? নীচে থেকে আনান বুঝি?

এঞ্জিনিয়ার হেসে বলেন, সে তো দু-একরকম আনান-ই। হাসপাতালের জিনিসপত্র যখন আসে সেইসঙ্গে আনানোর কোন অসুবিধে নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রীও সঙ্গে আছেন। তিনি রাঁধেনও ভালো। হাজার হোক বাঙালী মেয়ে তো! কিন্তু সে-সব এমন কিছু নয়।—বলে, আবার মুচ্‌কে হেসে চাপা-গলায় বলেন, একটু মাছ-মাংসও চলে যে!

মাছ-মাংস! আশ্চর্য হই। জিজ্ঞাসা করি, এখানে মাছ-মাংস? এ-সব চলে নাকি?

উত্তর শুনি, চালালেই চলে। তীর্থক্ষেত্র হোল গঙ্গার দক্ষিণ কূলে—এপারে। ও-দিকটা তো বদরী-পুরীতে নয়। অপর পারে যে! ডাক্তারবাবু করিতকর্মা আছেন। বিশেষ ব্যবস্থা করে কিভাবে জোগাড় করান। অবশ্য মাঝে মাঝে। শুনেছি, পাহাড়ীরাই এনে দেয়, পয়সা পায়। তারাও কেউ কেউ খায় যে!

কোন মন্তব্য করি না। তবুও তিনি নিজেই বলে চলেন, দেখুন, ও-সব নিয়মকানুন হোল তীর্থ-যাত্রীদের জন্যে, যাঁরা আসেন পুণ্যি করতে। আর, তাঁরা আসেনও তো দু'দিনের জন্যে। খুব জোর তে-রাত্তির বাস। কিন্তু যাদের চাকরির তাড়নায় মাসের পর মাস এখানে কাটাতে বাধ্য হতে হয়—তাদের পক্ষে ও-নিয়ম চলবে কেন? এই দেখুন না, যেমন রীতি-নীতি তার সমাধানও তেমনি। এখানকার এক অফিসরের স্ত্রীর সন্তান হোল—এ-পারে পুরীতে হবার নিয়ম নেই। তাই, ওপারে একটা বাড়ী নিয়ে সেইখানে তাঁকে সপরিবার থাকতে হচ্ছে। বললাম যে, ও-পারে দোষ নেই!

চুপ করে শুনি। ভাবি, এতো কৈফিয়ৎ-এরই বা প্রয়োজন কি!

ডাক্তারবাবু আমাদের পেয়ে খুব খুশী। বলেন, আজ চায়ের সঙ্গে শুধু পাঁপরভাজা, পকৌড়ী খেয়ে গেলেন—এ ঠিক হোল না। শতোপন্থ থেকে ঘুরে আসুন—তারপর রাত্রে একদিন এখানে আহার করতেই হবে। বলে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি চুপ করে রইলে কেন? ভাল করে তুমিও বলো।

ভদ্রলোক সাদাসিদে, মনখোলা। অনেক কিছুই গল্প করেন। জিজ্ঞাসা করেন, আর একজন বাঙালী ডাক্তারবাবুও যে এখানে এসেছেন—দেখা হয়েছে নাকি? দেবপ্রয়াগে এক বছর ছিলেন। এখন বদলী হয়ে গেলেন কাশীতে। যাবার আগে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ করে যাচ্ছেন। ভালই করেছেন; আবার কবে এদিকে আসা হয় কি না হয়! তারপর একটু রাগ করেই বলেন, কিন্তু, দেখুন, ওঁর একটা আচরণ দেখে আমার আজ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, দু'এক কথা শুনিয়েও দিয়েছি। তিনি নিজে খুব ভক্ত—সারাপথ স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে এসেছেন। তা আসুন। কিন্তু, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো—সাত আট বছর মাত্র বয়েস হবে—তাদেরও সমস্ত পথ হাঁটিয়ে এনেছেন!

অমি তখনি বলি, সে ভদ্রলোক যে রয়েছেন আমাদেরই বাংলোতে,

সামনের দিকের ঘরে। আসার সময়ও তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে বারান্দায় দেখলাম। রোগা লিকলিকে চেহারা—একটার পায়ে যেন কি বাঁধাও দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বলেন, তাই থেকেই তো জানতে পারলাম। ছেলেটার পায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেছে—তবুও হাঁটিয়ে এনেছেন ; এখন এসেছেন ঘা সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি শুনেই বললাম—ঐ বাচ্চা দুটোকে এই পাহাড়ের পথ হাঁটিয়ে আনলেন কি বলে? দু'জনের জন্যে একটা কাণ্ডিও তো ভাড়া করতে পারতেন? তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন? নির্বিকার ভাব দেখিয়ে বললেন, পায়ে হেঁটে না এলে তীর্থে আসার পুণ্য ওদের হবে কি করে? জবাব শুনে আমিও দিলাম দু'কথা শুনিয়ে,—বাপ, না—

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাই বলি, চলুন, আর ঘরে বসে গল্প নয়। সন্ধ্যা হবার আগে এ-পারে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক্।

ডাক্তারবাবু উল্লসিত হন। বলেন, খুব ভাল কথা। চলুন। এ-পারটা বেশ নিরিবিলি। সাধুদের কুটিও আছে। দর্শন করে আসবেন। আমি প্রায়ই এঁদের কাছে যাই। কে জানে, কারো কৃপায় যদি কিছু পেয়েই যাই। বলা তো যায় না।

বলি, চলুন, এমনি বেড়ানো যাক্। সাধুদের নাই বা বিরক্ত করলাম।

গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি। কিছুদূরে একটি কুটি-র কাছে এক সাধুকে দেখে ডাক্তারবাবু সেদিকে যান। আমাদের ডাকেন, চলে আসুন। ওঁর একবার খবর নিয়ে যাই। কিছুদিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল। চিকিৎসা করেছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

জিজ্ঞাসা করি, কি চিকিৎসা করলেন?

বলেন, পেনিসিলিনেই কাজ হয়েছিল। বুকে যা সর্দি জমেছিল, আমি তো ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু, খুব তাড়াতাড়ি সেরে গেছেন। তবে, দুর্বলতা এখনও আছে। পথ্য তো কিছু নেই—ক'দিন আমি একটু দুধের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। এমন অসুখেও সামান্য একটা কম্বলেই এই শীতে কাটিয়ে দিলেন! আশ্চর্য!

সাধুজির কুটি-র বাইরে ছোট বাগান। সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। নানান্ রঙের মরশুমী ফুল। বাগানের এক অংশে বয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি ঝরণার জলধারার মুখ বন্ধ করে জলাধার তৈরী হয়েছে। লম্বা চওড়ায় তিন চার

হাত মাত্র হবে। অতিরিক্ত জল অপর দিক দিয়ে বার হয়ে বয়ে যাচ্ছে,—নীচে অলকানন্দার দিকে। জলের ধারে কয়েকটি সমতল পাথর। বসবার সুন্দর আসন। তারই একটির উপর স্থির হয়ে বসে আছেন।

দেখলেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। সাদা লম্বা দাড়ি গোঁফ। অঙ্গে সামান্য একটা আবরণ। সৌম্যমূর্তি। শান্ত দৃষ্টি।

সকলে প্রণাম করলাম। বসতে বললেন। সম্প্রতি রোগ-ভোগের চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পায়। বাঙালী। বাংলাতেই কথা বলেন। স্বল্পভাষী।

'কেমন বোধ করছেন ?'—ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে মৃদু হেসে আকাশ পানে হাত তুলে নমস্কার করে শুধু বলেন, তাঁরই দয়া !

প্রায় পঁচিশ বছর এখানে আছেন, শুনি। হিসাব করে বলি, মাকে নিয়ে আমিও প্রথম এখানে এসেছিলাম—১৯২৮ সালে। তখন হৃষিকেশ থেকেই হাঁটতে হয়েছিল। মার জন্য অবশ্য ডাণ্ডী ছিল—কিন্তু, তিনিও হাঁটতেন প্রায়ই। এখন বাস্ হ'য়ে যাতায়াতের অনেক সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার যাত্রার আনন্দ অন্য রকমের ছিল বলে মনে হয়। এই বদরীপুরীও তো কতো শান্ত ছিল।

হঠাৎ নতুন পুলটির কথা মনে হয়। জিজ্ঞাসা করি, এখানকার শান্ত আবহাওয়ার এতে বিঘ্ন ঘটাবে না তো ?

তাতেও তিনি মৃদু হাসেন, শান্তি তো মনে। মন যদি সুসংযত, আত্মস্থ থাকে বাইরের শতকোলাহলও সেখানে পৌছতে পারে না। তবে, তীর্থ-ক্ষেত্রের শান্তির কথা স্বতন্ত্র! এখানকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন তো ঘটছেই। এ-পুল তৈরী তার একটা সামান্য প্রকাশ মাত্র। নানান্ শ্রেণীর লোক এখন আসতে সুরু করেছে, বহুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে। স্থানীয় লোকেদেরও জীবনযাত্রার রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের মনোবৃত্তিরও বিবর্তন ঘটছে।

তারপর আরও মৃদুভাবে বলেন, যারা দু'দিনের জন্যে আসে তাদের চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু কয়েক দিন থাকলেই কত কি না দেখা যায়। এমন কি বন্দুক হাতে পাখী শীকার করতেও আসতে দেখা গেছে। বড় সহর গড়ে উঠছে, সহরের লোকের মনোভাবও দেখা দেবে, আশ্চর্য কি ? সেই সঙ্গে সহরের যা কিছু দুর্নীতি এখানেও ধীরে ধীরে মানুষের মনে বাসা বাঁধছে। কলির যুগধর্ম। এর প্রতিকারও নেই, প্রতিরোধও নেই।

চুপ করে শুনি। তাঁর কথার ভাবে, বলার ভঙ্গিমায় বেশ বুঝি, এটি অভিযোগ নয়। ভবিতব্যের স্বীকৃতিমাত্র।

আবার শান্তভাবেই তিনি বলেন, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি রক্তবীজের মত রক্তে থাকে। সুযোগ সুবিধা পেলেই সজাগ হয়ে ওঠে। লোভনীয় কিছু না থাকলে মানুষও নির্লোভ থাকে। এখন এখানে অনেক কিছুই আসছে, ঘটছে। এখানকার লোকেও দেখে শিখছে। তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা-বোধ রক্ষাকবচের কাজ করতো—এখন তার প্রভাব যাচ্ছে। মানুষের নীচ বৃত্তিগুলি খাদ্য পেয়ে এখানকার মানুষের মনেও মাথা তুলছে—তারাও মানুষ হয়ে উঠছে। মানুষ-খেগো বাঘ, শুনেছি, মানুষের রক্তর স্বাদ পাবার পরই মানুষ-খেগো হয়ে ওঠে—তার আগে নয়। এও তেম্‌নি আর কি!

একটু চুপ্ করে থেকে আবার বলেন, দুঃখ করার কিছু নেই, করেও লাভ নেই। তবে এই শরীরটাকে অন্য কোথাও নিভৃতে সরানো প্রয়োজন। তীর্থক্ষেত্রের—বিশেষতঃ হিমালয়ের এই সব অঞ্চলের—একটা বিশেষ প্রভাব আছে। কত প্রাচীন মুনি-ঋষির তপোভূমি। তাই ত বদরিকাশ্রমে এসে মন্দিরের অতো কাছে থেকেও এ-পারে দূরে থাকা!

অভিযোগ শুনেছিলাম আর এক সাধুর কাছে।

ইনিও বাঙালী। বছর ত্রিশের উপর এখানে আছেন। হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। গেরুয়া বেশভূষা। বৃদ্ধ হলেও সক্ষম সবল দেহ। গোল মুখখানি সাদা-কালো দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। অভ্যর্থনা করে বসতে বললাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনি এখানে ক'বার এসেছেন শুনেছি, কিন্তু কোনবারই আলাপ হয় নি। আমার কথা আপনাকে পুরী নিশ্চয় বলেছেন?

মনে পড়ল, কলকাতা ছাড়ার আগেই এক স্বামীজি এঁর কথা বলেছিলেন বটে।

বললাম, হাঁ। তা আপনি নিজেই কষ্ট স্বীকার করে এসে গেছেন!

তিনি বলেন, মন্দিরে রোজই আসি। এ-বাড়ী তো পথের ওপরেই।

তারপর সুরু করেন তাঁর বক্তব্য। স্থানীয় এক সেবাশ্রমের কর্মীদের বিরুদ্ধে অশেষ অভিযোগ।

বলেন, অনেকগুলি সাধুসন্ত সেখানে নিয়মিত ভাণ্ডারা পাচ্ছিলেন।

হঠাৎ ক্ষেত্রের সেবাকার্য এখানে বন্ধ হোল। কোন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি নেই। সাধুদের দুর্দশার কথা কেউ একবার ভাবলেনও না। শুধু তাই নয়। সাধুদের দান করার উদ্দেশ্যে যে-সব কম্বল এসেছিল, সেগুলি বাজারে বিক্রী হয়েছে। ক্ষেত্রের পুস্তকাগারে যেসব ধর্মগ্রন্থ ছিল তা ওজন-দরে বিক্রী করেছে। এখনও বাজারে গেলে দেখা যাবে তাতে ঠোঙা তৈরী করে জিনিস বিক্রী হচ্ছে !

স্তম্ভিত হয়ে শুনি। তিনি উত্তেজিত হয়ে আরো অনেক কিছুই জানান্। ক্ষমাহীন চক্ষু ক্রোধে জ্বলতে থাকে। মন্তব্যের মধ্যেও আগুন ছোটে! বলেন, গেল, সব গেল—ধর্মের আর কিছুই রইল না ;—পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। যাবে, নিশ্চয় যাবে। মহামায়ার খেল্ দেখবেন তখন।

ভাবি, গেরুয়াবাস তো নয়, যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। মূর্তিমান্ অভিশাপ।

সব শুনে আশ্বাস দিই, ফিরে গিয়েই কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করে জানাবো।

তাতে তিনি নিরস্ত হন্ না। তাঁদের উপরও তাঁর বিশ্বাস নেই। উত্তেজনাবশে আবার অভিযোগগুলির পুনরুক্তি করতে বসেন।

চুপ্ করে বসে থাকি। বাইরে তাকাই। চোখে পড়ে, অলকানন্দার উদ্দাম স্রোত। চিরন্তন। মঙ্গলময়। কর্ণকুহরে বেঁধে স্বামীজির ক্রোধোন্মত্ত বাক্যবাণ। সুতীক্ষ্ণ। বিষময়।

স্বামীজি বলেন, আমার কাছে তো শুনছেন, আমি এখানকার আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসব, তাদের মুখেও শুনবেন। বাজারেও আপনাকে নিয়ে যাবো—নিজের চোখে দেখবেন—যা কিছু বলছি সত্যি কিনা।

আমি প্রমাদ গণি। তৎক্ষণাৎ বলি, আর সকলে এসে নতুন কিছু বলবেন না তো ? যা জানবার আপনার কাছেই ত জানলাম।

তাতে সন্তুষ্ট হন্ না। বলেন, অন্য লোকের কাছেও শুনুন। সত্যাসত্য নিজেই যাচাই করে দেখুন – যখন এসেছেনই এখানে।

বিনীতভাবে জানাই, ও-জন্যে ত এখানে আসা নয়। তবে খবরগুলি আপনি জানাতে চেয়েছিলেন, জানিয়েছেনও। আমার দ্বারা যেটুকু করবার নিশ্চয় করবো। অন্য লোকের মুখে আবার শোনার প্রয়োজন নেই।

তবুও, ছাড়েন না। সবাইকে দল বেঁধে আনতে চান্।

ভাবি, অভাব-অভিযোগ-অপকীর্ত্তি সে-সব তো আছেই; এখানে এসেও সেই অশান্তির দুর্ভোগ! স্বামীজিকে বলি, দেখুন, আপনি প্রাণ খুলে সব জানিয়েছেন, এবার আমিও মন খুলে একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না। এখানে এইসব আলোচনা আমার কাছে রুচিকর নয়। তবুও সব শুনেছি, যা করবার নিশ্চয় করবো। আর, সত্য-যাচাই-এর কথা বলছেন? আপনার কথায় যদি বিশ্বাস করে থাকি, অপর লোকের কাছে যাচাই করার কথা ওঠে না। আর আপন।র কথায় যদি সন্দেহ থাকে, অপরের কথাতেও যে সে-সন্দেহ থাকবে না, কে বলতে পারে? অতএব, ও-প্রসঙ্গ আর না।

তিনি হেসে ওঠেন। বলেন, আচ্ছা, থাক্, ও-নিয়ে আর নয়। অবশ্য বলে রাখি, আমার নিজের লাভ-ক্ষতি ওতে কিছু হয় নি। কয়েকটি অসহায় সাধুর দুরবস্থা দেখেই মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল। আর লোকগুলির তীর্থক্ষেত্রেও আচরণ দেখে। কিন্তু, যাক্ ও-সব। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি হরেনকে চেনেন তো? হরেন—আমাদের হরেন গো!

ভাবি, কয়েকটি হরেন-নাম-ধারীকে তো চিনি। এঁর হরেনটি কে?

প্রশ্ন করে বুঝতে পারি। বলি, ওঃ! তার কথা বলছেন? আসার আগের দিনও দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তার সঙ্গে যে প্রায় রোজই দেখা হয়।

স্বামীজি বলেন, তা আমি জানি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তার মেয়ের বিয়েটা এখনও দিলে না কেন? বুড়ো বাপ এখনও রয়েছেন, এই বেলা দিয়ে দেওয়াই ভাল। সব দিক দিয়েই সুবিধে—তা সে বুঝবে না।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হরেনের চিন্তা ও চেষ্টার কথা জানা ছিল। তাই বললাম, সে চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও কোথাও যোগাযোগ হয় নি। পাত্র পছন্দ হয় ত কুষ্ঠি মেলে না, কুষ্ঠি মেলে তো পাত্র পছন্দ হয় না।

তিনি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলেন, না—নাঃ! ওর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাপ থাকতে থাকতে কোথায় নিজের মেয়ের বিয়ের দায়িত্বটা কাটিয়ে নেবে, তার মর্ম ও বোঝে না। আমার নাম করে তাকে আপনি বলবেন।

এরপর তাঁর সঙ্গে যে ক'দিনই দেখা হয়েছে, হরেনের মেয়ের বিবাহের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তা প্রতিদিনই প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি, যেদিন ফিরে আসি সেদিনও তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে

চলেছেন। সিঁড়ির উপরে মন্দিরতোরণের কাছ থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, আমরা নীচে রাস্তা দিয়ে চলেছি। দূর থেকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। হাসিমুখে হাত তুলে তিনিও চেঁচিয়ে বললেন, যাত্রা করলেন তাহলে! ধীরে ধীরে পথ চলবেন। বাড়ী পৌঁছে চিঠিতে পৌঁছানো সংবাদ দেবেন যেন। আর, ভালো কথা, হরেনকে বলবেন, বাপ থাকতে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দেয় যেন।

'আচ্ছা'—বলে চলতে থাকি। তাঁর কথাগুলি কানে কিছুক্ষণ বাজতে থাকে।

হিমালয়-বাসী সর্ব-ত্যাগী এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কার এক অনূঢ়া কন্যার বিবাহের জন্যে একি দুশ্চিন্তার নিগ্রহ!

আর একবারের একটি ছোট্ট ঘটনা। ছোট হলেও মনে উজ্জ্বল রেখা রেখে গেছে।

বিকেল বেলা। বদরীনাথে বাড়ীর সুমুখে পায়চারি করছি।

এক স্বামীজি এলেন। গেরুয়া-বাস। লম্বা চেহারা। দাড়ি গোঁফ মাথা কামানো। হাতে দীর্ঘ দণ্ড।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো উমাপ্রসাদবাবু?

হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনি বাঙালী দেখছি। যাত্রায় এসেছেন নাকি?

বলেন, না। এইখানেই এক কুটিতে থাকি। এখনি সেক্রেটারী মশায়ের কাছে শুনলাম, আপনি কাল এসেছেন। তাই আলাপ করতে এলাম।

বললাম, চলুন তবে, বসা যাক কোথাও। কোথায় বসবেন? আমি আছি সামনের এই বাড়ীরই একটি ঘরে, সেখানেও যাওয়া যেতে পারে, নদীর ধারে নিরিবিলি কোথাও বসা যেতে পারে। কি বলেন?

তিনি প্রশ্ন করেন, হাঁটবেন একটু? তবে চলুন না—আমার কুটিতে। না:—ওপারে নয়। সহর ছাড়িয়ে মানা-গ্রামের পথে যেতে অলকানন্দার ধারে। বেশী দূর নয়—আধ মাইলটাক হবে।

তাই চলি।

পথ থেকে ডাইনে নামতে হয় অলকানন্দার কূলে। নদীর ধারে সমতল ভূমি। সেইখানে পাথরের দেওয়াল-দেওয়া ছোট্ট একটি বাড়ি। দুইখানি

পাশাপাশি ঘর। সামনে ছোট বারান্দা। সম্মুখেই নদী। ঘরে বা বারান্দায় যেখানে বসা যাক্—গঙ্গার দর্শন পাওয়া যায়।

স্বামীজি বলেন, এইখানে সনক-আদি ঋষিদের আশ্রম ছিল। অতি পবিত্র স্থান।

ঘরের ভিতর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্র কিছুই নেই। ভূমিতে কম্বল-শয্যা। একটা কাঠের তক্তার উপর কয়েকখানি বই—সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, ইংরাজিও। সবই ধর্ম-গ্রন্থ।

স্বামীজি বলেন, নিজেও পড়ি, মাঝে মাঝে অন্য সাধু সজ্জন ব্রহ্মচারীরা আসেন তাঁদের কাছেও পাঠ করে শোনাতে হয়, আলোচনাও হয়। কেউ বা কখনো দু'একটা বই নিয়েও যান পড়তে। এই করে ও নিজের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে মনের আনন্দেই।

মনে মনে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু, আহারের ব্যবস্থাটা চলে কি করে? মন্দিরের প্রসাদ, না, ক্ষেত্রের ভাণ্ডারা? প্রশ্ন করতে হয় না। কথায় কথায় প্রকাশ পায়।

স্বামীজি বলেন, এই ঘরটায় আমি আছি। পাশের ঘরটা খালি ছিল। কয়েকদিন হোল, এক ব্রহ্মচারী এসেছেন। এখন কিছুকাল থাকবেন, বলছেন। আমার সুবিধাই হয়েছে। লোকটি ভাল। শান্ত প্রকৃতি। উন্নতি করবেন মনে হয়। আমার ভোজনের ব্যবস্থা উনি নিজেই করে দেন। আমার এখন ও-সময়টা ছুটি—অর্থাৎ নিজের কাজে একটু বেশী সময় দিই।

'ভোজন' বললেন বটে, কিন্তু, তার উপকরণটা কি তখনি জানতে পারি।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে নদীর ধারের জমিটা দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখুন আমার ক্ষেত। দেখবেন চলুন, কেমন আলু লাগিয়েছি। হচ্ছেও বেশ। এখানকার জমি যে বড় ভালো। পাহাড়ীরা এসব বোঝে না। এইখানটায় একরকম শাক এনে লাগিয়ে দিয়েছি—হবে বলে মনে হয়। আমার খাদ্য-শুধু এই আলু। লবণ ছেড়েছি আজ ক'বছর হোল। অন্ন-ময়দা-আটা এ-সবও ছেড়েছি। শুধু ফল-মূলই এখন আহার্য। কিন্তু, ফল এখানে হয় না, বড় একটা আসেও না, তাই মূল ধরেই আছি। অবশ্য দুধটা কখন-সখন কেউ দিয়ে গেলে পাই। সহর থেকে এখানে অনেকে আসেনও। তাঁর অসীম দয়া।

নদীর তটে স্থানটি মনোরম লাগে। স্বামীজির সঙ্গও ভাল লাগে

বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। গল্প করতে করতে কয়েকবারই দেখি তিনি বলেন, আপনি কাল এসেছেন, আমি একদিন পরে খবর পেলাম। পেয়েই চলে এসেছি। কাল পেলে কালই আসতাম। মাত্র আর দু'দিন থাকবেন বলছেন,—একটা দিন এর মধ্যে চলে গেল বিনা পরিচয়ে!

আমি আশ্চর্য হই। সম্পূর্ণ অপরিচিত। পথিক-জীবনে হঠাৎ পরিচয়। নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা-পাতার ক্ষণিকের তরে কূল ছুঁয়ে যাওয়া। আজকের দেখা, কালকের ভুলে যাওয়া। আবার হঠাৎ মনে-হওয়া। এতে একদিন বৃথা চলে-যাওয়ার দুঃখ ওঠে কোথায়? তার উপর সাধু-সন্ন্যাসী!

তাই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আপনি ক'বারই দুঃখ করলেন—একদিন আগে আলাপ হোল না। নাই বা হোল,—তাতে ক্ষতি কি?

হেসে উত্তর দেন, লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই, জানি। তবুও, মনে ওঠে ও-কথা। আজ প্রায় ত্রিশ বছর কলকাতা ছেড়েছি। আর যাই-ও নি ও-অঞ্চলে। যাবার ইচ্ছাও হয় না। এখানেই নিজের সাধন-ভজন নিয়ে আছি। পূর্বাশ্রমে যখন সহরে ছিলাম এবং কলেজে পড়তাম তখন আপনার পিতাঠাকুর জীবিত। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য দান ভোলবার নয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের তখনকার ছাত্ররা তাঁকে পিতার মতোই দেখতাম, ভক্তি করতাম। আজ এতোদিন পরে হঠাৎ যখন শুনলাম, তাঁরই একছেলে এসেছেন এখানে, তখনি, কেন জানি না, মনে হোল, আমার এক ভাই এসেছে। তাই, খবর পেয়েই চলে এলাম।

স্তব্ধ হয়ে শুনি। চোখে জল টেনে আনে। কঠিন কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরালে অলক্ষ্যে বয়ে-যাওয়া ভক্তি-প্রীতির ফল্গুধারা। মৃদু মধুর তার কলধ্বনি। অফুরন্ত তার উৎস। অমৃত সে-ধারা।

৩

যাত্রীদের মধ্যেও বিচিত্র প্রকৃতির লোক দেখি।

একটি যুবকের সঙ্গে একবার পরিচয় হোল। বদরীনারায়ণের মন্দিরের চারিদিকে পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উপর পরিক্রমা করছে। প্রায় সব যাত্রী—

এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও করে থাকেন। এ-পরিক্রমায় নাকি অশেষ পুণ্য আনে। একাগ্রতা যে আসে তাতে সন্দেহ নেই। তিব্বতী লামাদের হাতে যেমন 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ'—মন্ত্র-লিপি-ভরা ঘূর্ণি-চক্র ঘুরতে থাকে, এখানেও তেমনি যেন কোন এক শক্তি অলক্ষ্যে বসে মন্দিরকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের ঘোরাতে থাকেন। বন্‌বন্ করে ঘুরে চলেছেই।

ছেলেটিও তেমনি ঘুরছিল। এখানকার পুলিশ-অফিসরটি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

কালো রঙ্। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় একটা বড় রঙীন্ রুমাল ঘুরিয়ে বাঁধা—বেদুইন্‌দের মত। তারই তলা দিয়ে কপালে ও পিছনদিকে কয়েকগাছি ঘন-কালো কোঁকড়া চুল বেরিয়ে আছে। টানা চোখদুটি জলজ্বল করছে। টিকালো নাকটি চিরন্তন-জিজ্ঞাসার-চিহ্ন হয়ে আছে। গায়ে একটা লম্বা গরম কোট। পরনে কাপড়—লুঙির মতন করে। খালি পা,—মন্দিরের মধ্যে হবারই কথা। হন্‌হন্ করে ঘুরছিল চরকির মতো।

পরিচয়ে জানলাম মূর্তিমান চক্রই বটে।

পায়ে হেঁটে এসেছে বদরী-নারায়ণে—ত্রিবাঙ্কুর থেকে!

বললাম, ঘোরা শেষ হলে চলে এসো আমার আস্তানায়,—এই মন্দিরের বাইরেই।

হেসে বলে, ঘোরা আমার অতো সহজে শেষ হবে না! চলুন, এখনই আপনার ওখানে ঘুরে আসি।

সবই তার 'ঘোরা'। অদ্ভুত তার জীবন। গল্প করে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-প্রদেশে দেশ। ত্রিচুর জেলায়। গ্রামের নাম পল্লীস্শেরী। নাম শুনে বলি, বুঝেছি, ওটা আমাদের ভাষায় হবে, বোধ করি, পল্লীশ্রী। সুন্দর নাম। তোমার নিজের নামটি কি?

হেসে বলে, বলছি,—সেটি অতো সহজ বা সুন্দর নয়। মনে রাখতে পারবেন না; কাগজ দিন—লিখে দিই।

বড় বড় হরফে ইংরাজিতে লিখে দেয়—শ্রীঅবনপরম্ভুমাধোয়ম্ অনন্তকৃষ্ণম্।

একত্রিশ বছর বয়স। ১৯৫৪ সালের ৩রা জুলাই দক্ষিণ-ভারত থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করে। ভারতবর্ষের নানান্ স্থানে ঘুরেছে। ৬৯৬২ মাইল অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছে—১০ই মে ১৯৫৬ সালে।

বলে, এ আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হচ্ছে। স্কুল-কলেজে ইতিহাসের

পাতায় পড়তাম—নিজের চোখেও দেখেছি—মানুষের একটা ধর্ম ঘর-বাঁধা। যেখানেই বসবে—আশ্রয় খুঁজবে, মনোরম একটি গৃহরচনা করতে পারলেই যেন পরম শান্তি। আমার রক্তে কিন্তু বাইরের ডাক! ঘর-ছাড়া মনকে কেবলি পথে ডাকতে থাকে।

কথা বলতে বলতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর হেসে বলে, তা বলে ভাববেন না যেন ছন্নছাড়া আমার জীবন। বাপ-মার আমি আদরের সন্তান ছিলাম।

জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এখন কেউ নেই নিশ্চয় ?

আশ্চর্য হয়ে বলে, থাকবেন না কেন ? বাবা-মা-দাদা সবাই আছেন। দেশে থাকেন। ধনী না হোলেও সচ্ছল অবস্থা। আমিও কলেজ ছাড়ার পরই চাকরি পেয়ে গেলাম। কিন্তু, আমার তখন হেঁটে বেরুবার নেশা লেগেছে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, অথচ বাবা-মাকে ছেড়ে বহু দূরে বেরিয়ে পড়ার কোথায় যেন জোর পাই না, চাকরির শিকল আরও জোর করে আমায় বাঁধলো। মাসে দেড়শ টাকা মাইনে। কোন অভাব নেই,—তবুও মনে তৃপ্তি নেই। বিয়ের জন্যে বাবা-মা ধরেন। কোন রকমেই রাজী হই না। বেশ বুঝি, ও-জীবন আমার নয়। রাত্রেও স্বপ্ন দেখি, আমি যেন চলেছি—পায়ে হেঁটে—দেশ থেকে দেশান্তরে, দূর দূরান্তরে—পথের শেষ নেই—চলার শ্রান্তি নেই—আনন্দেরও সীমা নেই!

এমনি করে সে বলে যায়! কথার মধ্যেও তার চলচঞ্চল পদধ্বনি শুনি।

সে বলতে থাকে, অতৃপ্ত-বাসনার শুধু স্বপ্ন দেখেই এইভাবে ক'বছর কেটে গেল। তারপর একদিন এক জার্মান যুবক হঠাৎ এসে দাঁড়ালো আমাদের অফিসের গেট্-এ। মোটর-সাইকেল হাতে। গগল্‌স্ চোখে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সেই সাইকেল চড়ে। মুখের লাল রঙ্ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। চোখ মুখে কি উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব। কথা বলে যেন আনন্দ উছ্‌লে পড়ে। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কত দেশের কত গল্প বলে।

তার ভ্রাম্যমান জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সব। সেইদিনই সে আবার তার যাত্রা-পথে চলে গেল। কিন্তু, অজ্ঞানিতভাবে আমার শিকল ভেঙে দিয়ে গেল। তার পরদিনই আমি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কাঁধে এক ছোট্ট ঝোলা—সামান্য দুটা জামা-কাপড়। পকেটে আমার চাকরি থেকে সঞ্চিত সামান্য পুঁজি। কিন্তু, মন-ভরা অসামান্য আনন্দ।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে জানাও নি? পালিয়ে এসেছ?

আশ্চর্য হয়ে বলে, পালাবো কেন? বাবা-মাকে বলেই এলাম। তাঁরা আমাকে সত্যিকরেই চেনেন। তাই, বাধা দেন নি, আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। মা শুধু বলেছিলেন, দেখি, কদ্দিন থাকতে পারিস্!

বললাম, প্রায় দু'বছর হোল বাড়ি ছেড়েছ, তাঁদের আর খবর পাও?

হেসে বলে, পাই বই কি। এই তো আজই চিঠি পেয়েছি। দেখুন না।

বার করে দেখায়। চারপাতা তাদের ভাষায় দীর্ঘ পত্র। বলি, পড়ে শোনাও, বাবা কি লিখেছেন।

সে শোনায়। দেশের সব খবর, খুঁটিনাটি অনেক কিছু।

বলে, ওসবে আমার আগ্রহ নেই, তবুও ওঁরা প্রতি চিঠিতেই জানান। টাকা পাঠাবেন কিনা জানতে চান। জানাই, এখনও তার প্রয়োজন নেই।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, চলে কি করে তোমার?

সে হেসে উত্তর দেয়, চলি তো পায়ে, তার খরচা নেই। আর খাওয়ার খরচা? সে আর কতটুকু? যা প্রয়োজন, শুধু তাই খাই,—যেখানে যেমন পাই। তার মধ্যে শৌখিনতা নেই। যে টাকা সঙ্গে এনেছিলাম তা এখনও শেষ হয়নি। না হওয়ার আরও কারণ আছে। যেখান দিয়ে আসি, সুযোগ পেলে সেখানে কারো কোন কাজ করে দিই—ক্ষেতের কাজ, ঘরের কাজ; কখনো বা আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিই—এইভাবে কিছু আয়ও হয়। তা ছাড়া, কোথাও দেখেছি—বিশেষতঃ গ্রামে—লোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আহার্য দিয়েছে—আনন্দের সঙ্গে। পথের ছেলেকে ঘরে ডেকে খাওয়ানো—এতেই যেন তাদের তৃপ্তি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, দেখুন, ঐ যে বলছিলাম ঘর-বাঁধা মানুষের ধর্ম, ঠিক তেমনি আবার যাযাবর জীবনেরও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে—মানুষের সেটাও একটা আদিম ধর্ম। আমি সেই জাতের।

হেসে বলি, তাই বুঝি মাথার ওপর বেদুইন্দের মতো কাপড় বেঁধেছ?

সেও হেসে ওঠে। কাপড়টা টেনে মাথা থেকে খুলে ফেলে। মাথা-ভরা একরাশ লম্বা চুল চারিদিকে নেচে নেমে আসে। হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, এই জন্যেই বেঁধে রেখেছি। এ দু'বছর চুল কাটি নি। এইবার এইখানে মুণ্ডন করবো।

তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। চোখের দৃষ্টিও শান্ত হয়। যেন, আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার পর শরতের গাঢ় নীল আকাশ, রূপালী রৌদ্র।

ধীরে ধীরে বলে, এখন হিমালয়ের এই অঞ্চলে দু'বছর কাটাবো। এখানে মন্দিরের কিছু ওপরে একান্তে একটি গুহার মধ্যে এখন আছি। নিভৃতে শান্তভাবে দিন কাটে। মন্দির থেকে ধর্ম-পুস্তক নিয়ে যাই—পড়ি। সকালে সন্ধ্যায় একশো আট বার মন্দির পরিক্রমা করি। এতেও এক অনির্বচনীয় অনুভূতি!

দু'জনের কেউই কোন কথা বলি না কিছুক্ষণ।

তারপর সে বলে, দু'বছর পরে হিমালয় থেকে নামব। এখানে আসার পথে পশ্চিম ও মধ্যভারত, রাজপুতানা, কাশ্মীর ঘুরে এসেছি। নামার পর যাবো পূর্ব-ভারতে, তারপর দক্ষিণে। আপনাদের বাংলাদেশেও যাব—তখন আপনার সঙ্গে হয়তো আবার দেখা হবে।

হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে, ভাল কথা, আপনার নাম ঠিকানাটা লিখে দিন।

তার ডায়েরি বার করে হাতে দেয়। বেশীর ভাগই তাদের মাতৃ-ভাষায় লেখা, ক্বচিৎ কোথাও ইংরাজিতে। খাতাটির প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা:

"Live for Truth and die for Truth."

৪

সেই চারণিকের সঙ্গে যে পুলিস অফিসরটি আমার আলাপ করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গেও সেইদিনই আমার প্রথম পরিচয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে সাধারণ বেশে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ দেখে তাঁকে চিনলাম। মুখে পুলিসের ছাপ ছিল না, কিন্তু চেনার চিহ্ন ছিল।

কয় বছর আগে এই যাত্রা-পথে এক পাহাড়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। পোষ্টমাষ্টার। অতি অমায়িক ও সজ্জন। সকলেরই—বিশেষতঃ যাত্রীদের সাহায্য করতে সব সময়েই প্রস্তুত। নিজের দপ্তরের কাজেও, অফিসের বাইরেও।

সে বছরেও দেখা হোল পথে—শ্রীনগরে। অফিস ঘরে টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতির মধ্যে শব্দ তুলে বার্তা দিচ্ছেন, নিচ্ছেন। হঠাৎ

আমায় দেখতে পেয়ে উল্লসিত হন, আরে! আপনি এ বছরেও এসে গেছেন! বসুন, বসুন—চা আনাই।

এক জোড়া প্রকাণ্ড গোঁফের মধ্যে শুভ্র দাঁতগুলি বার করে হেসে ওঠেন। সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কুশল সমাচার নেন। যেন, পরম আত্মীয়ের সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ।

তিনিই জানান, এবার বদরীনাথে আমায় ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করবেন। সেখানে থানার চার্জে এখন আছেন।

বদরীনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাইটিকে দেখেই চিনি। সেই বিরাট গোঁফের আর এক জোড়া। মুখের আকৃতিরও সাদৃশ্য আছে।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই পরিচয় করি।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে? না হয়ে থাকে, চলুন, আমার ওখানে উঠবেন।

বলি, থানায় তো? কিন্তু, এমন কিছু তো করিনি যে ওখানে পুরবেন।

ভদ্রলোক হেসে ওঠেন। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হন! বলেন, এবার যাত্রীর যা ভিড়, জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। আমার ওখানে আশ্রয় দিতে হয় প্রায়ই। একা থাকি,—যথেষ্ট জায়গা আছে। এই শীতের দেশে বাইরে যাত্রীরা পড়ে থাকতে পারে না। যতটুকু পারা যায় তাদের সেবা করার চেষ্টা করি।

তাঁর ভাই-এর মতনই কথাবার্তা, ব্যবহারও। যদিও পুলিশ!

একপাশে দাঁড়িয়ে গল্প করি। জিজ্ঞাসা করি, একা থাকেন বললেন, বাড়ির সব আনেন নি কেন? এখন তো ক'মাসই এখানে থাকতে হবে?

বলেন, ঠাণ্ডা জায়গা। অসুবিধে হয়। কিন্তু আসল কারণটি হচ্ছে খরচা। এখানে সামান্য জিনিসপত্রেরও কি ভীষণ দাম—নিশ্চয় জানেন। একদিন দু'দিনের জন্যে ততটা গায়ে লাগে না। তা ছাড়া, যাত্রী যাঁরা আসেন তাঁরা খরচা হবেই জেনে আসেন। কিন্তু, আমাদের পক্ষে মাসের পর মাস এখানে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার।

মন্তব্য করি, কেন? এখানে থাকার জন্যে নিশ্চয় বাড়্তি ভাতা পান আপনারা।

অফিসরটি দুঃখ প্রকাশ করেন, সেইটিই তো কথা। এই দুর-দুর্গম

পাহাড়ের দেশে থাকলেও তা পাবার নিয়ম নেই। সে-আইন হোল হিল্-স্টেশনের জন্যে, আর এটা হিল্-স্টেশন নয়! সরকারের সোজা জবাব! এই নিয়ে লেখালেখি চলছে অনেক দিন থেকে। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন ভারতে একটা সুরাহা হবে। কিন্তু তাও এখন হোল কই? অথচ দেখুন, প্রতিবছর মিনিস্টার, ডেপুটি-মিনিস্টার, হোমড়া চোমড়া অফিসররা সব বেড়াতে আসছেন—আর দেশের কি টাকাটাই না খরচ হচ্ছে শুধু তাঁদের জন্যে!—যাক্, ও-সব দুঃখের কথা না আলোচনা করাই ভালো।

আমিও ভাবি, দেশের কি চরম দুর্ভাগ্য, হিমালয়ের এই দূর অঞ্চলেও এই সাধারণ মনোভাব জাগবার সুযোগ পাচ্ছে!

কথার মোড় ঘোরাই। জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি তো আপনার খালি বললেন, হাজত ঘরগুলির অবস্থা কি?

তিনি বলেন, সে-ও শূন্য। আগে কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন হোত না, শুধু শাসনের কটাক্ষ নিয়ে থাকতো। বছর দুয়েক থেকে মাঝে মাঝে এখন খুলতে হয়। যাত্রীদের সঙ্গেই দু'একজন চোর-জোচ্চোর আসতে সুরু করেছে। বাস্ হয়ে এখন আসার সুবিধে হয়েছে কি না! যাত্রীর সংখ্যাও যেমন বাড়ছে, চোরেরাও তেমনি তাদের কর্মস্থল বিস্তার করছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবার এখানে এই এক মাসে মাত্র একটি কেস হয়েছে। কিন্তু, তবু হয়েছে তো, স্বীকার করতেই হবে। হয়ত আরও হোত—খুব কড়া নজর না রাখলে।

জিজ্ঞাসা করি, কি চুরি হয়েছিল?

বলেন, জিনিস সামান্যই। তাহলেও চুরি। তপ্তকুণ্ডের ধারে কাপড় রেখে যাত্রী স্নান করতে নেমেছিল—যেমন সবাই নামে। এবার কি রকম ভিড় দেখেছেন? সেই সুযোগে তার সেই কাপড়খানি ও খুচরা কিছু পয়সা একজন চুরি করে। তারপর থেকে ওখানে পুলিশ-পাহারা দিতে হয়েছে, সাধারণ বেশেও পুলিশ ঘুরছে। এ-সব তীর্থস্থানে এমন ব্যবস্থা করার যে দরকারও হয় সেইটিই আমার কাছে লজ্জার বিষয়।

আমি তখনি সায় দিই যে এই তীর্থ-পথে নিশ্চিন্ত-মনে আসাটাই কত বড় শান্তি। চুরির ভয় নেই, ঠকবার আশঙ্কা নেই—পথ-জোড়া যেন আপন ঘর, চারিদিকে আপন জন। নিজের চোখেই দেখেছি, যাত্রী নেমেছে নদীতে স্নান করতে, তার টাকার থলিটি পাড়ে রেখে। স্নান সেরে তাড়াতাড়ি চলে

এসেছে, থলিটির কথা ভুলেই গেছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়ায় ফিরে গেছে, দেখে ঠিক তেমনিই পড়ে আছে। অনেকের হয়তো নজরে পড়েছে, কিন্তু তবুও কেউ চোখ দেয় নি।

কয়বছর আগেকার এক ঘটনা পুলিস-অফিসরের কাছে গল্প করি।

শীতকাল। কলকাতা সহর। বিকেল বেলা কাজ সেরে বাড়ী ফিরেছি। দেখি, দুজন পাহাড়ী অপেক্ষা করছে। অপরিচিত মুখ। প্রশ্ন করে জানতে পারি, যমুনোত্রীর পাণ্ডার ছেলে, অপরটি তার গ্রামবাসী। ওপরে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। অবাক হয়ে ইলেকট্রিক আলো, পাখা দেখে; ভয়-বিহ্বল হয়ে সসঙ্কোচে চেয়ারে বসে।

জিজ্ঞাসা করে জানি, দেশ ছেড়ে এই তাদের প্রথম বার হওয়া, সহরও দেখা।

অনেকে যেমন মনে করেন, সহর-সভ্যতা ছেড়ে হিমালয়ের পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক ব্যাপার, এদের পক্ষেও এখানে আসা তেমনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। প্রথমে পাহাড়ে হাঁটা-পথ,—পঞ্চাশ ষাট মাইল হলেও সেটা কিছুই নয়; কিন্তু তারপর—প্রথম বাস্-চড়া, প্রথম ট্রেনে ওঠা এবং অবশেষে কলকাতা সহর! সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বিস্ফারিত নয়নে তাদের সেই কাহিনী শোনায়। কথার স্রোতে অপরিচয়ের সঙ্কোচভার ভেসে যায়।

বলে, দু'দিন আগে কলকাতায় পৌঁছেছি। স্টেশনে নামলাম। চারদিকে তাকিয়ে তাজ্জব লাগছিল। চড়াই-উৎরাই নেই। দূর দেখা যায় না! একি! বাইরে এসে একটা মানুষ-টানা গাড়িতে উঠলাম। তাকে কলকাতা নিয়ে যেতে বললাম। সে তবুও জিজ্ঞাসা করে, কোথায় নিয়ে যাবো? তাকে যত বলি, কলকাতায়,—তবুও সে বোঝে না, বলে, কলকাতায় কোথায়? এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলে, কলকাতায় কোথায় যাবে?—তাকেও বললাম, কলকাতায় যাবো, আবার কোথায়? তখন সে গাড়ির লোকটাকে কি বলে দিলে, সে একটা ধর্মশালায় নিয়ে গেল।

বুঝলাম, ভাগ্যক্রমে একজন সৎলোকের নজরে পড়েছিল, তাই তাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও হয়েছে। এখন হ্যারিসন রোডে এক ধর্মশালায় আছে এবং পাণ্ডার যে খাতাটি সঙ্গে এনেছে, তাতে-লেখা যাত্রীদের নাম-ঠিকানা

বার করে তাদের বাড়ি যাচ্ছে। আমার কাছে আসাও তেমনি খাতার পাতায় নাম বার করে।

কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য শুনি। তার ভগিনীর বিবাহ দিতে হবে, অর্থের প্রয়োজন। পাণ্ডাজি কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্থ-সংগ্রহের জন্যে। তাঁর ধারণা, এখানে পথের দু'ধারে টাকা ছড়ানো আছে, তুলে নিতেই যা কষ্ট! দু'জনের যাতায়াতেরই খরচ পড়বে দেখলাম প্রায় দেড়শো টাকা!

আমাদের বাড়িতে এসে তাদের থাকতে বললাম। জিনিস-পত্র নিয়ে আসার কথায় বললে, জামা-কাপড় তো এই গায়েই রয়েছে, আর এই খাতাটা—অন্য আর কিছু নেই।

জিজ্ঞাসা করি, বিছানা, কম্বল কিছু আনো নি?

দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর বলে, হাঁ ছিল—দু'খানা কম্বল ও একটা লোটা। তা এখন আর নেই।

গল্প শুনি। দু'জনে ট্রেনের কামরায় ওপরের বাঙ্কে রাত্রে শুয়েছিল। ভোর হলে নীচে নেমে বসে—ওপরে তাদের কম্বল ও লোটা গুছিয়ে রেখে। হু হু করে ট্রেন চলেছে, জানলা দিয়ে ভোরের বাতাস আসছে—আরামে বসে ঝিমোচ্ছিল। এমন সময় একটা বড় স্টেশন এলো। বহু যাত্রী। কত লোক উঠল, নামল। তারা যেমন বসে ঘুমুচ্ছিল, তেমনি ছিল। ট্রেন আবার চলতে সুরু করেছে। ওদের ঘুম ভেঙেছে। পরের স্টেশনে জল নেবে বলে লোটার সন্ধান করতে দেখে—লোটাও নেই, কম্বলও নেই! সহযাত্রীরা অম্লান বদনে বলে, আগের স্টেশনে নিশ্চয় কেউ নিয়ে চলে গেছে। নজর রাখো নি কেন? অমন নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ঘুমুলে যাবেই তো! কোথাকার লোকসব! উজবুক্!

গল্প করতে করতে আশ্চর্য হয়ে বলে, তাজ্জব ব্যাপার! একজনের জিনিস আর একজন নিয়ে গেল! এ হয় কখনো?

ওরা কয়দিন আমাদের বাড়িতে ছিল। কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি তাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা। মন্দিরেও পাঠালাম। ট্রামে বাস্-এ চড়ল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতার উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী শুনতাম। ঘরের টেবিলের উপর নির্বিচারে ধূলি-মলিন পা দু'খানি তুলে দিয়ে বসতো—আরাম করে। মনে কিন্তু ধূলার

স্পর্শ নেই। প্রাণ খুলে কথা বলতো। একজন হয়তো কথা বলছে, অপরজন তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে গান ধরেছে গলা ছেড়ে। হঠাৎ কোন সহুরে সভ্যভব্য বন্ধু এসে পড়লে, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কি ব্যাপার হে! বলতাম, এসো, বসো, এ-সব আমার পাহাড়ী-বন্ধুরা!

একদিন পাঠালাম সিনেমায়। কৃষ্ণ-চরিতের কি একটা ফিল্ম ছিল। দেখে এসে সে কী উত্তেজনা! বলে, আজ তো দর্শনই মিলে গেল, কৃষ্ণজির বাঁশীও শুনে এলাম।—বলে, আমাকেই নমস্কার করে বসে। তাদের সঙ্গে যে-লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম তার কাছে শুনি, সিনেমা-হলে তাদের চুপ করে বসিয়ে রাখাই মুস্কিল হয়েছিল—জয়ধ্বনি করে চেঁচিয়ে ওঠে, সিট্ ছেড়ে ছুটে যেতে চায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করতে।

বোঝে না, কলি-কালে সিনেমার পর্দায় অদৃশ্য দেবতাও কত সহজে ধরা পড়েছেন! আসল পরমহংসদেবের ও নকল শ্রীরামকৃষ্ণে প্রভেদ বোঝাই ভার। আর কিছুদিন পরে পানের দোকানে ত নিশ্চয়ই, সম্ভবতঃ ঘরে ঘরেও সিনেমার রামকৃষ্ণের ফটো চালু হয়ে যাবে!

এমনি ভাবে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে তাদের কয়দিন কাটলো। কিছু অর্থ-সাহায্যেরও ব্যবস্থা হোল। তারপর টিকিট কাটিয়ে ট্রেনে বসিয়ে দেবার জন্যে একজন লোক দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম। বিদায়-কালে তাদের জিজ্ঞাসা করি, এবার দেশে ফিরছ,—এতো ঘুরে গেলে, দেখে গেলে —সবচেয়ে তাজ্জব কি দেখলে ব'ল।

তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সত্যিই অনেক কিছু দেখেছি যা কখনো ভুলব না, এ-যেন এক স্বপ্নের দেশ।—বলতে বলতে গম্ভীর হয়। তারপর বলে, অনেক কিছুই তাজ্জব দেখলাম বটে, কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব লেগেছে, এ-দেশে একজনের জিনিস অপর একজন নিয়ে নেয়! কি আশ্চর্য!

সহর-সভ্যতার বিস্ময়-সমুদ্র মন্থন করে এই তাদের বিষময় চরম অভিজ্ঞতা!

পুলিস-অফিসর গল্প শুনছিলেন। বললেন, আমার নিজের জেলার লোকের মিথ্যে গর্ব করছি না। সত্যি, ঐ হোল তাদের প্রকৃত রূপ। গাড়োয়ালে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে তালা-চাবি যে কি পদার্থ ও কি তার প্রয়োজন, লোকে তা মোটেই জানে না। আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে জানেন? ঘরে তালা পড়েছে—মানে, গৃহস্থের সর্বনাশ হয়েছে!

শুনে আমি বলি, ও-ধরণের প্রবাদ আমাদের অঞ্চলেও আছে যে! বোধ হয় তালার প্রচলনের সঙ্গে প্রবাদটারও চলন হয়েছে। তবে যে-সব গ্রামের কথা আপনি বলছেন সে-রকম গ্রাম আমি নিজেও চোখে দেখেছি। অবশ্য বাস্‌-এর, এমন কি যাত্রার পথেও এখন আর সে-সব দেখা যায় না। যাত্রা-পথ ছেড়ে কিছু ভেতরে গেলেই পাওয়া যায়। তবুও, কি রকম বিশ্বাসী মানুষ এখনও এ-পথে আছে—এই সে-বছরও তার পরিচয় পেলাম। ফাটার ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠেছি। পুরোনো বুড়া চৌকিদার যাবামাত্রই আমায় দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে, আপনি এসে গেছেন? সে-বছর আপনার চাকুটা এখানে ফেলে গিয়েছিলেন যে! আমি তুলে রেখে দিয়েছি। খুব সুন্দর জিনিসটা। কত লোক ওটা টাকা দিয়ে নেবার জন্যে ধরাধরি করেছিল—একজন দশটাকাও দিতে চেয়েছিল—আমি কিছুতেই দিই নি—বললাম, তাঁর জিনিস, আমি দেব কি করে? তিনি নিশ্চয় আবার আসবেন, এলেই দিয়ে দেবো। গত বছর এখানে আপনি আসেন নি, দু'বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি।—তখনি গিয়ে নিয়ে আসে, অতি যত্নভরে বার করে দেয়। যেন, কত মহামূল্য এক সামগ্রী!

বার করতেই চিনতে পারি। ঠিকই বটে। আমারই। মোগলসরাই স্টেশনে কেনা অনেকগুলি ফলা-সমেত সেই ছুরিটি। সেটা যে সে-বছর এইখানে ফেলে গিয়েছিলাম, তা জানতামই না, সন্দেহও করি নি। বাড়ি ফিরেও ছুরির কথা মনে হয় নি, পরের বার আসার সময় খুঁজে পাই নি, এই পর্যন্ত।

ছুরিটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে চৌকিদার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। যেন, একটা মস্ত দায় মুক্ত হলো।

আমিও তখনি খুশী-মনে ছুরিটি তাকে আবার দিয়ে দিই, বলি, এটি তোমার কাছেই থাক। এটি তোমায় দিলাম।

এ-সবের মর্ম সে বোঝে না। অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে থাকে। হয়তো ভাবে, যার জিনিস তাকে দিলাম, সে ফেরৎ দেয় কি!

তার এই আচরণে প্রকৃত আনন্দ পাই। অশিক্ষিত, অতি-দরিদ্র। তবুও—অথবা, তাই-ই হয়তো—অপহরণ করতে শেখে নি, লোভের বশীভূত হয় নি। এরাই তো এ-অঞ্চলের মাথার মণি।

অফিসরটি বলেন, আমাদের শিক্ষাহীন দেশে এখনও সেই আদর্শ ও

ধারা বজায় আছে। মনে হয়, দেশের লোকের মজ্জাগত সংস্কার ও দৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস এর কারণ। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সভ্যজগতের নতুন হাওয়া লেগে এবার ঘুণ ধরতে সুরু করেছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে যে-সব চুরি হয়, সাধারণতঃ এখনও বাইরে থেকেই লোক আসে এ-সব করতে।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, কি ধরণের চুরি এখানে হয় ?

তিনি বলেন, স্থানবিশেষে প্রকারভেদও হয়। এখানেও তাই। এখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী গড়ে উঠছে। যাত্রীরা এখানে আসেন প্রাণ-ভরা ভক্তি নিয়ে। যা কিছু করেন, যা কিছু দেখেন সব কিছুই ভক্তিরসে সিক্ত করে নেন। গেরুয়া দেখলেই মনে করেন সাধু, ভস্মমাখা হলে ত কথাই নেই। তখনি ভাবেন, হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী! দর্শনেই মুক্তি। সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করেন। ধূর্ত লোকে এসব জানে। গেরুয়া গায়ে অথবা ভস্ম মেখে যাত্রীদলে যোগ দেয়। বলে, হিমালয়ের গুহায় বাস করি, কেদার-বদরী তীর্থ করতে বেরিয়েছি।—পুণ্যলোভী যাত্রীরা ভোজন দেয়, পরে কখনো সঙ্গীও করে নেয়। সাধু-সঙ্গের পরম ভাগ্য, পরমানন্দ! সাধুর ওপর অন্ধবিশ্বাস এমনিই আছে, ক'দিনের আচার-ব্যবহারে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এদিকে সাধু-বেশী সঙ্গীটি দৃষ্টি রাখে, কোথায় যাত্রীর টাকার থলি। তারপর একদিন হঠাৎ অদৃশ্য—লোকটিও, পথের পুঁজিও!—এই ধরণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, ধরাও পড়েছে দু-একজন। আবার, আর এক ধরণের চুরিও দুবার হয়েছে। পথের সঙ্গীভাবে যাত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। একই পথের যাত্রী। দুর্গম পথ। একসঙ্গে যায়। একই চটীতে ওঠে। সুখ-দুঃখের গল্প করে। এই সুযোগে যাত্রীর বাড়ির খবরাখবর নেয়, ঠিকানাও জানে। তারপর, একদিন পথে কোন বড় চটীতে থেকে যায়, সঙ্গী-যাত্রীকে জানায়, 'আপনি এগিয়ে যান, আমি দু'দিন এখানে কাটিয়ে যাব—জায়গাটায় মন বসে গিয়েছে—আবার দেখা হবে পথে।'—বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনার ভানও করে। যাত্রী যাত্রা-পথে এগিয়ে যায়, দুঃখপ্রকাশ করে বলে, 'দু'দিন একসঙ্গে বেশ থাকা গিয়েছিল।' তারপর, ধূর্ত লোকটি যাত্রীর নাম নিয়ে তার বাড়ীর ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে, 'পথে হঠাৎ সর্বস্বান্ত হয়েছি, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও, পোষ্টমাস্টারের কেয়ারে।' পোষ্টমাস্টারের সঙ্গেও ইতিমধ্যে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আলাপ করে—তার সামনেই তার পাঠায়। একদিন অপেক্ষা করার পরই টাকা আসে। না এসে উপায় নেই! তারপর,

উধাও! প্রায় মাসখানেক পরে বাড়ি ফিরে যাত্রী সব কিছু জানতে পারে। তখন কোথায় কে! শুধু, পথের সঙ্গীটির বন্ধুত্বের উজ্জ্বল স্মৃতিখানি কালিমায় লিপ্ত হয়ে যায়।

পুলিস অফিসরটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে দু'একটা চুরি হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, জানি। তবে, এই তীর্থ-পথের ওটা একটা কলঙ্ক হয়ে ওঠে। এই দেখুন না, কত বড় লজ্জার বিষয়—এখন কোন কোন চটীতে পুলিসকে যাত্রীদের সাবধান করিয়ে দিতে হয়—যেন নিজের নিজের জিনিসের উপর ঠিকমত নজর রাখে!—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এর প্রতিরোধ করতে। কিন্তু ভাবনা হয়, আমার দেশের লোকের কথা ভেবে, এ প্রবৃত্তি যেন ওদের মধ্যে না প্রবেশ করে!

দুশ্চিন্তারই কথা বটে।

এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়লাম, যুক্তরাষ্ট্রের এটর্ণি-জেনারেল্ তাঁর বার্ষিক বিবৃতিতে বলছেন, ১৯৫৮ সালে এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় প্রতি ৬৪.২ মিনিটে একটি করে নরহত্যা (murder), ৪৬.৪ সেকেণ্ডে একটি করে সিঁদেল চুরি (burglary) এবং প্রতি ৬.১ মিনিটে একটি করে নারীধর্ষণ (rape) হয়েছে! সেই বৎসরে শুধু গুরুতর আইনগত অপরাধের সংখ্যা উঠেছে—১৫,৫৩,৯২২!

সভ্যদেশের সভ্যতার কলঙ্কিত পরিচয়!

৫

কিন্তু, কালের প্রবল প্রবাহ রোধ করবে কে?

মনে পড়ে, সাধুজির সেই নির্বিকার অভিমত;—যুগ-ধর্মের প্রভাবে তীর্থ-ক্ষেত্রের মর্যাদা-হানির কাহিনী,—সভ্য-সমাজের সমস্যাগুলির হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলেও অবাঞ্ছিত প্রবেশ।

প্রতি বছর আসা-যাওয়ার পথে তার নিদর্শন পাই।

সে-বছর পথ ধরে চলেছি। কে একজন পথের একটু উপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—ইংরাজিতে—Have tea here, Sir. Good tea। তাকিয়ে দেখি, একটা ছোট দোকান। বাইরে একটা গাছ, তার তলায়

বেঞ্চ। সেইখানে দাঁড়িয়ে এক পাহাড়ী ছেলে। একটু পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।— আমার তখন চা খাওয়ার দরকার নেই। তাই বললামও। তবুও সে ছাড়ে না। বলে, সকাল থেকে বসে আছি—একটিও যাত্রী এখানে বসে নি। কড়ার দুধ তেমনি রয়েছে, দেখুন না।—হিন্দী ইংরাজি মিশিয়ে কথা বলে।

ছেলেটিকে দেখে কৌতূহল জাগে, মায়াও হয়। উঠে গিয়ে বসি, বলি, তাহলে দু'গ্লাস তৈরী করো।

আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি ত একা। সঙ্গী কেউ পেছনে আসছেন বুঝি?

বলি, করো তো তুমি ভাল করে তৈরী।

দু'জনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে তার ছোট্ট জীবনের কাহিনী শুনি।

সেই বছর স্কুল ফাইনাল্ পাশ করেছে। একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, সেকেণ্ড ডিভিসনে!—কিন্তু উৎসাহ থাকলেও আর কলেজে পড়ার তার অর্থ-সংস্থান নেই। মাইল তিনেক দূরে গ্রাম। বাবা আছেন, অন্য ভাই-ও আছে। সামান্য জমি-জমা,—তাঁরাই চাষবাস করেন, সংসার চলে যায়। এর এখন আর ক্ষেতে গিয়ে কাজ করার মত মন নেই। বলে, বাবার সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। তাহলে লেখাপড়া শিখতে গেলাম কেন?

অগত্যা এই ছোট দোকানটুকু খুলেছে, কিন্তু চলছে না, আর এতে হবেই বা কি? আমাকে ধরে, কলকাতায় নিয়ে চলুন আমাকে—আরও পড়তে পারলে ত ভালই, নয়ত সেখানে চাকরি দেবেন একটা।—ছল্‌ছল্ চোখে বলে, জীবন কি আমার এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?

দেখি, সহরের সেই একই সমস্যা এখানেও দেখা দিয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষার স্বাদটুকুই পেয়েছে। সে-শিক্ষা কার্যকরী নয়। জ্ঞানের পিপাসা জেগেছে—মেটাবার ক্ষমতা নেই। বেকারের গ্লানি এসেছে। মনের ও গৃহের শান্তি ভেঙেছে!

ভাবি, গাড়োয়ালে অন্ততঃ একটা মিলিটারী-কলেজও তো খুললে পারে। এখানকার ছেলেদের সেনা-বিভাগে যোগ দেবার আকর্ষণ বহুকাল ধরেই আছে।

আমাদের বদরীনাথের পাণ্ডাজির নাতিটিও পাশ করেছিল। পাণ্ডাজি

আমায় ধরলেন, কলকাতায় থেকে আরও লেখাপড়া করবে। তাঁদের গ্রামে ডাক্তার নেই—ডাক্তার হবে।

শেষের প্রস্তাবটা শুনে ভাল লেগেছিল। মনে হোল, সত্যিই,—গভর্ণমেণ্টও যদি এখান থেকে ভাল ছেলে বেছে খরচ দিয়ে ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন—অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ খোলে, দেশেরও উপকার হয়। কয়েক জায়গায়—যাত্রা-পথে সরকারী হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারি আছে, নইলে কোনও গ্রামেই একজনও ডাক্তার নেই, লোকে চিকিৎসাও পায় না। যে-সব রোগ ওষুধে সারবার কথা, ওষুধ না পেয়ে লোকে তাতে মারা যায়। শিশু-মৃত্যুর ত কথাই নেই। স্বাস্থ্য-রক্ষার অতি-সাধারণ নিয়মগুলিও জানে না, এ-সবের প্রয়োজনীয়তারও বোধ নেই। মানস-সরোবর যাবার পথে একদিন আমাদের একটা কুলীর প্রবল জ্বর আসে। এক সঙ্গীর কাছে ওষুধ ছিল, তিনি তাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, চুপচাপ কম্বল গায়ে শুয়ে থাক্‌। কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখি, সে লোকটাকে ঘিরে অন্য কুলীরা বসেছে এবং সর্দার কুলী তাকে কি একটা গাছের পাতা-সমেত ডাল দিয়ে খুব মারছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?—শুনলাম, ওর জ্বরের প্রকৃত কারণ ওরা ধরতে পেরেছে। ওকে দানোয় পেয়েছে! তাই, তার চিকিৎসাও চলেছে।—জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কিসের ডাল?—শুনি, বিছুটি!—ভাবি, চমৎকার চিকিৎসা! লোকটার কিন্তু সেইদিনই জ্বর ছেড়েছিল! আমার সঙ্গী বলেন,—আমরাও জানি,—তাঁর ওষুধে। কুলীরা বলে, তাদের চিকিৎসায়! এইসব বিষয়ে এই ধরণেরই ওদের মূঢ় বিশ্বাস। সেখানে উন্নতির ক্ষেত্র আছে।

গাড়োয়ালে একবার এক গ্রামে গেলাম। যাত্রাপথ থেকে অনেকখানি ভেতরে। সেখানে এক পরিচিত অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। খবর না দিয়ে হঠাৎ পৌছুই। আমাদের পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ! ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী সেখানে থাকেন। ছেলেরা ভাল করে লেখাপড়া শিখে বড় বড় চাকরি করে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আছে। কচিৎ কখনো গ্রামে আসে। বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু, একটিও দোকান নেই। সংসারে যার যা প্রয়োজন সব ঘরে আছে। তার বাইরে কোন কিছুর দরকার হলে দশ মাইল দূরে যাত্রা-পথে যে-সহর আছে, সেখান থেকে আনতে হবে। ভদ্রলোকের কিছুদিন থেকে পায়ে একটা

ব্যথা হয়েছে—মাঝে মাঝে অসহ্য যাতনা হয়, ফোলেও। চিকিৎসার দরকার। কিন্তু, ডাক্তার নেই। পাহাড়ের পাঁচ হাজার ফিট নীচে সেই দশ মাইল দূরে সরকারী হাসপাতালের একজন মাত্র ডাক্তার। তাঁকে এখানে আনানোর অনেক অসুবিধা, এঁরও যাওয়া অসম্ভব। অতএব, চিঠি লিখে চিকিৎসা চলছে, রোগ ভোগও চলেছে!

এইসব মনে পড়ে। তাই, পাণ্ডাজির নাতিকে ডাক্তার করানোর অভিপ্রায় শুনে রাজি হই, কিন্তু তখনি মনে আশঙ্কা জাগে, পাহাড়-প্রদেশের শান্ত, নিরীহ ছেলে—হঠাৎ কলকাতার ছাত্র-সমাজের ও সহর-সভ্যতার মধ্যে গিয়ে কি পরিণতি হবে কে জানে! পাণ্ডাজিকেও সে-কথা জানাই। তিনি বলেন, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ছেলেটি কলকাতায় আসে। মন দিয়ে পড়াশুনাও করে। কিন্তু, চেষ্টাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী কলেজে তার ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। তারপর, ভালভাবেই এম্, এস-সি পাশ করেছে। এখন কলকাতাতেই একটা ভাল চাকরি করছে। আচার-ব্যবহারে, নম্রতায় কোন পরিবর্তন হয় নি। তার ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য হয়েছে। কিন্তু, গাড়োয়াল তাকে হারিয়েছে। প্রতি বছরে একবারের জন্যে দেশে যাওয়াও তার সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ রকম আরও অনেককে জানি। গাড়োয়ালে বাড়ি। উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন। এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভাল ভাল চাকরি করেন। গাড়োয়ালে সে-সব চাকরির বা কাজের কোন সুযোগই নেই। দু'তিন বছর অন্তর কয়েকদিনের জন্যে যদি একবার দেশে যানও—সে যেন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকা। তাঁদেরও মন বসে না—নিজেদের লোকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আর মিশতেও পারেন না।

এ-শিক্ষালাভে গাড়োয়ালের উন্নতি হয় নি, কয়েকটি লোকের উপকার হয়েছে। গাড়োয়ালের বহু ছেলেরা যারা এখন সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন পথ খোলে নি, বরং ব্যর্থতার গ্লানিতে মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

আর একবারের এক ঘটনা। বাইরের লোকের প্রভাবও কি ভাবে আব্‌হাওয়া বিষাক্ত করে তোলে!

এই ১৯৫৯ সালে। কেদারনাথ থেকে ফিরছি। বাস্ যে পর্যন্ত গেছে

—কাঁক্‌রাঘাটেতে সকাল আটটায় নেমেছি। এইবার বাস্‌-এ বসে রুদ্রপ্রয়াগ চলে আসব। কুড়ি মাইল পথ। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। টিকিটের জন্যে নাম রেজেস্ট্রী করতে গিয়ে খবর পেলাম,—দুটি মাত্র বাস্ এখন চালু আছে। আমাদের নামের নম্বর পড়ল—২৪৬! দিন দুই তিন পরে যেন খোঁজ নিই! কিছুদিন থেকে মাত্র বাস্ ঐ পর্যন্ত আসছে—তাই সাময়িকভাবে কয়েকটি দোকান খুলেছে। ছোট জায়গা। তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, শ'খানেক যাত্রীও হবে না,—নম্বরটা বাড়িয়েই লেখা হচ্ছে। তার কারণও সুস্পষ্ট। কিছু পরে নিজের চোখেও দেখলাম—পুলিসের বা কণ্ডাক্‌টারের সঙ্গে একটু ব্যবস্থা করা!

এ-সব আমার ভাল লাগে না—বিশেষতঃ এই হিমালয়-পথে। পাহাড়ী সঙ্গীকে বলি, কুড়ি মাইল মাত্র! হেঁটেই যাব। গতবারও তো এ-পথ হেঁটেই গিয়েছিলাম।—সে বলে, দাঁড়ান। আর একবার চেষ্টা করব। প্রিন্সিপাল সাহেবের একজন পুরান ছাত্র ওখানে রয়েছে মনে হোল।

অবশেষে, আশ্বাস পাওয়া যায়, দুপুরে বারোটায় টিকিট মিলবে। পেয়েও ছিলাম, এবং বাস্ যখন ছাড়ল—কোথায় সেই ২৪৬ যাত্রী! একটিও পড়ে নেই—বরং বাসে জায়গা খালি পড়ে!

পথ থেকে একটু উপরে একপাশে ছোট্ট একটা দোকান। সেইখানে সেই চার ঘণ্টা আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছোকরা দোকানদার—বছর ষোলো বয়স। ইংরাজিতে বলে, আমি সাধারণ দোকানী নই। আমি ছাত্র! আমার কাছে 'ফার্ষ্ট ক্লাশ পিওর' ঘি আছে। নিন্—এখানে আর কারো কাছে পাবেন না—সর্বত্র বনস্পতি!

শুনি, বাস্‌-এর পথে অগস্ত্যমুনিতে স্কুলে পড়ে। এখন ছুটি। তাই এখানে দোকান চালাচ্ছে।

ভাবলাম, বলছে ভাল ঘি। একটু নেওয়াই যাক। একটা ছাত্রকে সাহায্যও করা হবে। নিইও। কিন্তু, রাঁধতে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়। ভাজা জিনিস ফেলে দিতে হয়।

ছোকরা হাসে। বলি, এই তোমার খাঁটি ঘি? ছাত্র হয়ে এইসব করছ?

সে নির্লজ্জের মত বলে, বাঃ! ব্যবসা করছি—ওসব একটু-আধটু করতে হয়। ওতে আবার দোষ কি? ছ'টাকা করে সের বলেছিলাম, না হয় একটু কমিয়েই দেবেন।

তারপর জোর করে বার করি, বাইরের একটা লোক ওখানে ক'টা দোকান খুলেছে—এইসব ছেলেদের বসিয়ে চালাচ্ছে!

বাস্ হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে, সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ যাত্রীদের। দশদিনের হাঁটা পথ এখন দু'দিনেই চলে যাওয়া যায়। কিন্তু, তাতে এইসব অঞ্চলের লোকেদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দু'তিন মাইল অন্তর সারি সারি চটী ছিল। পথের নিকটস্থ গ্রামবাসীরা এইসব দোকান চালাতো—ব্যবসা করতো। এখন দেড়শো মাইলের ওপর বাস্ হয়ে গেছে—এসব দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট জায়গায় বাস্ দাঁড়াবারও বিশেষ দরকার হয় না, ছুটে বেরিয়ে যায়—যাত্রীদেরও কেনাকাটির তাগাদা থাকে না। স্থানীয় বহু লোক এইভাবে ব্যবসা হারিয়েছে, তাদের মনে একটা বিক্ষোভও জেগেছে। বাস্ চলল তাদেরই দেশে, অথচ লোকের দৈনন্দিন জীবনে কোন উপকার হোল না। গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ক'জনেরই বা প্রয়োজন হয়? যাদের হয়ও সকলের ভাড়া দেবার ক্ষমতাও থাকে না। জিনিসপত্রের দামও কিছু কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। হবার মধ্যে সৌখীন জিনিসপত্র ওখানে পৌঁছে গেছে। বাস্ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব লোকেদের যদি অন্য কোন উপজীবিকার বা কোন কিছু কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হোত, লোকেদের উপকার হোত, এই ক্ষোভেরও কারণ হোত না। বাস্ আসায় আর এক বিপরীত বিপত্তিও ঘটেছে। বাইরে থেকে অনেক উৎসাহী ব্যবসাদার এসে গেছে। সহরগুলিতে নতুন দোকান খুলে বসছে। স্থানীয় ব্যাপারীরা সেখানেও ব্যবসা-চ্যুত হচ্ছে।

দেশের লোকেরা তাই প্রথম বাস্-চলার আনন্দ উদ্দীপনা কেটে গেলেই দেখে, সভ্যতার যান তাদের মুখের অন্ন নিয়ে এল না, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল। অথচ, বাস্-কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ক'রে তাদেরই দেশের বুকের ওপর দিয়ে চলে যায়! তারা নিঃসহায়, নিরুপায়!

চাষের কথা বলি। পাহাড়ে চাস হয় পাহাড়েরই গায়। স্তরে স্তরে ক্ষেতের ধাপ উঠেছে—সাহেবরা বলেন, terraced cultivation। দূর থেকে দেখতে সুন্দর লাগে। মোষের লাঙলে চাষ হয়। কঠিন পরিশ্রম করে এই পাহাড়ের পাথুরে জমি তৈরী করতে হয়। পাহাড়ের বুকে লাঙল

দেওয়া—সে কি সহজ কথা! তবুও, মানুষের অদম্য উদ্যম, বুক-ভরা আশা। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে ভাগ্যবিধাতা হাসেন। চাষীও জানে। তাঁর সঙ্গে যে তার ভয়-ভক্তি-প্রেমের সম্পর্ক—বিশ্বাসের দৃঢ়-বাঁধনে বাঁধা।

সে বছর আসছি গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথের পথে। মধ্যে পাওয়ালির চড়াই। পাহাড়ীরা বলে, জার্মান কো লড়াই! একদিনও পথে বৃষ্টি পাইনি। তবুও, রোজই ছাতা-লাঠি দুই সঙ্গে রাখি—যদি আসে! একদিন আঠারো মাইল হাঁটতে হবে, চড়াইও অনেকখানি উঠতে হবে। ভাবি, বৃষ্টিতো কোনদিনই হয় না—আকাশও পরিষ্কার—ছাতার ভার অযথা বওয়া কেন? সঙ্গে নিই না। মাঝ পথে হঠাৎ দূরে পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখা দেয়। ছোট একখণ্ড মেঘ—কিন্তু ঘন কালো। চোখের সামনে সেই ছোট মেঘ বড় হয়ে ফুলতে থাকে, পাহাড়ের মাথা থেকে অন্য পাহাড়ে আকাশ বেয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। নিমেষে আকাশ, পাহাড় চারিধার ছেয়ে ফেলে। দিনের আলো নিবে যায়।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে তখনও আট মাইল বাকি। এই দুর্যোগে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু, আশ্রয় বা মেলে কোথায়? এ-পথে চটী নেই। ছুটে চলি। ঢোল-বাজানোর একটা শব্দ আসে না? হয়তো কাছাকাছি লোকালয় আছে। ঠিকই তাই। পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ে কিছু নীচে এক ছোট গ্রাম। পথ ছেড়ে সেইদিকে নামি। একটি লোকের সঙ্গে দেখা। আশ্রয়ের কথা বলি। সানন্দে সে আমাদের নিয়ে চলে, বলে, জল তো নেমে এলো, গ্রামে যেতে ভিজে যাবেন। ঐখানে আমার নতুন একটা ঘর করছি—সেইখানে আপাততঃ উঠবেন চলুন। এখনও কিন্তু দরজা-জান্‌লা বসেনি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছুটে সেখানে উঠি। সুন্দর দোতলা বাড়ি। মাথার জল মুছতে মুছতে বলি, না থাক দরজা-জান্‌লা—এখানেই আজ রাত কাটাব—আপনার আপত্তি যদি না থাকে।

তিনি বলেন, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বাড়ি ধন্য হবে। কিন্তু, খাবার ব্যবস্থা আমি ঘর থেকে করে নিয়ে আসব। এ-বৃষ্টি থামতে এখনও ঘণ্টা দুই লাগবে—তারপরও চলবে থেকে থেকে এখন সাত দিন।

আব্‌হাওয়া সম্বন্ধে কথা বলেন যেন আবহবিদ্যা-বিশারদ্‌। অবশ্য, তাহলেই না-মেলার আশঙ্কা হয় বেশী!

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এ-সব বোঝেন কি করে?

তিনি দ্বিধা না করে বলেন, কেন? বাজনা শুনছেন না? দেবতার পূজা হচ্ছে যে! বৃষ্টির অভাবে ফসলের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই দেবতাকে বার করতে হয়েছে। এই সাতদিন আশপাশের সব গ্রামগুলি ঘুরে এলেন—প্রতি গ্রামে ঘরে ঘরে পূজো পেয়ে এলেন। সাত দিনের পরিক্রমা। শেষ হলেই বৃষ্টি নামবেই—দিন সাতেক চলবেও। আজ শেষ হোল—বৃষ্টি আসবেই আমরা জানতাম। চিরকাল এ দেখেও আসছি।—চলুন না, দর্শন করবেন—খুব জাগ্রত দেবতা আমাদের।

জল কমলে দেখতে যাই। দু'টা বাঁশ সমান্তরালে রাখা। তার উপরে মাঝখানে চেঁচাড়ি-দিয়ে-তৈরী হাত দেড়েক উঁচু একটা ছোট মন্দির মত। ভিতরে রঙীন্-কাপড়ে-ঢাকা একটি ছোট মূর্তি। বাঁশ দু'টার দুইদিকে দু'জন লোক—কাঁধের ওপর তাই নিয়ে উন্মাদের মত নাচছে, একবার হেঁট হচ্ছে, আবার লাফিয়ে উঠছে, কখনো বা ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। দু'জন ঢুলিও ঢোল বাজাচ্ছে নেচে নেচে। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে গেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সকলেই আনন্দে বিভোর। দেবতা তাদের পূজা নিয়েছেন, প্রার্থনা শুনেছেন।

আমাদের গৃহস্বামী বলেন, আপনারা পাহাড়ে আসতে ভাল করে নজর করেন নি? ইন্দ্রদেবের আদেশে ঐরাবর্ত এলেন যে প্রথমে ঐ পাহাড়ের মাথায়—তারপর তাঁর বিশাল শরীর ফুলিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে পা রেখে দাঁড়ালেন—প্রকাণ্ড শুঁড় তুলে জলের ধারা ছড়াতে লাগলেন!

ফসলের জলের অভাব হলে এই হয় এদের জল পাওয়ার ভরসা!

কিন্তু, দেবতাও সব সময়ে প্রসন্ন থাকেন না। চাষী তাও জানে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ক্ষেত-তৈরীর এত কষ্ট, ফসলের এত আশা—সব কিছুই হয়তো একদিনের পাহাড়-ধসায় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যায়ও তাই। তবুও মানুষ হাল ছাড়ে না, নইলে পেট চলে না। আবার বহু কষ্ট স্বীকার করে অন্যত্র নতুন ক্ষেত তৈরী করে। আবার একদিন সেখানেও ভাঙে। এই তাদের চাষের জীবন। তবুও হাসিমুখে সব মেনে নেয়। ভাল ফসল হলে, নিজেদের পরিশ্রমের গর্ব করে না, মাথায় তুলে নেয় দেবতার অশেষ করুণার দান বলে। আবার, প্রকৃতির বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি হলে, দেবতাকে দোষে না, বলে, নিজেদের কোন পাপেরই এই শাস্তি!

চাষীদের এই শঙ্কাকুল অনিশ্চিত জীবনে আশা দিতে হবে, আত্ম-ভরসা

জাগাতে হবে, তাদের সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের চাষীদের সমস্যা আর হিমালয়ে চাষের সমস্যার মধ্যে রূপভেদ আছে, তার প্রতিকারেরও তাই ভিন্নরূপ দিতে হবে। হাল-আমলের গতানুগতিক চাষের উন্নতির পন্থাগুলি সব সেখানে চলে না।

আর একটি ঘটনা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি। নতুন আইন-কানুন প্রবর্তনের কথা।

গাড়োয়ালের এক গ্রামে এক পাহাড়ী বন্ধুর বাড়িতে ক'দিন আছি। একদিন গল্প হচ্ছে, হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, একটা আইনের প্রশ্ন করি। উত্তরাধিকারী হবার আমাদের কি নতুন আইন হয়েছে বলুনতো।

আমি বলি, এখানেও আইনের প্রশ্ন? কি ব্যাপার বলুন, উত্তর দিচ্ছি।

তাঁর এক বিশেষ-বন্ধুর কথা। কিছুকাল আগে মারা গেছেন। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি, অল্প জমি-জমা। সেইখানে থাকতেন। সাধারণ অবস্থা। অভাব ছিল না, শান্তি ছিল। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র মেয়ে। এ-পক্ষের দু'টি ছেলে। কোন স্ত্রী জীবিত নেই! ছেলে দু'টি বড় হয়েছে। বাড়িতে থাকে, ক্ষেত-খামারের কাজ করে। কয়েক বছর আগে মেয়েটির বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র মেয়ে, মা-হারা। বিয়ে দিতে অনেক খরচ করেছিলেন। জামাইটি এ-দেশের হলেও বহুদিন দেশ-ছাড়া। বাইরে থেকে লেখাপড়া করেছে, এখন পাঞ্জাবে ভাল চাকরি করে। অবস্থা বেশ ভাল। কিন্তু, সমাজে এঁদের চেয়ে কিছু নীচু। তাই বিয়ের প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আপত্তি উঠেছিল। তবুও, পাত্রটি ভাল বলে ভদ্রলোক হাত-ছাড়া করেন নি; সম্পত্তির খানিকটা বিক্রী করে বিয়ে দেন। বিয়ের পর জামাই আর আসে নি। জাত সম্বন্ধে দু' একটা মন্তব্য নাকি তার কানে গিয়েছিল। মেয়েও আর আসে নি। বাপের শেষ অসুখের খবর পেয়েও নয়। কিন্তু, মারা যাবার কিছুদিন পরেই এক উকিলের চিঠি—বাড়ি ও জমির অংশ মেয়ে দাবী করে। ছেলেরা চিঠি পেয়ে সন্ত্রস্ত, কি করবে বোঝে না! পরামর্শই বা করবে কার সঙ্গে? চুপচাপ বসে ছিল। সম্প্রতি সমন এসেছে কোর্ট থেকে—ভগ্নী ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে—তার অংশের দাবী করে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েদেরও কি ছেলেদের সঙ্গে স্বত্ব হয়েছে? এই কি নতুন আইন? মেয়েটার বিয়ে দিতে সম্পত্তির খানিকটা তো বিক্রী করে

দিতে হোল—আর ওই তো ছোট একটা পাথরের বাড়ি, তার অংশ নিয়ে মেয়ে-জামাই করবেই বা কি, আর তার ভাগই বা হবে কি করে? নগদ টাকাই বা ছেলেরা পাবে কোথায়?

আমি বলি, ও-সব তর্ক এখন আর চলবে না। দেশের ভাগ্য-বিধাতারা এসব নতুন আইন করেছেন—কেন না, সমাজে ও দেশে মেয়েদের সমান অধিকার দেওয়াই উদ্দেশ্য, নইলে দেশে মঙ্গল আসবে না, জাতি-হিসেবে জগতে পেছিয়ে থাকবে।

ভদ্রলোক বলেন, গ্রামের লোকেরা এ-সব কিছুই জানে না। কোথা থেকে আইন করে তাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এতে তো এখানকার সব সংসার ভেঙে যাবে। গাড়োয়ালে প্রথম এই ধরণের মামলা হোল, শুনলাম। আরও হবে নিশ্চয়। অথচ এখানকার লোকে কোর্ট-আদালত জানেই না—কখনো দরকারও হয় না।

আমি বলি, কোর্ট পর্যন্ত যাবে কেন? মেয়েদের অংশ ছেড়ে দিলেই হয়।

বন্ধু বলেন, ছোট বসতবাড়ী—তার মধ্যে অংশ ছাড়া, সে কি সম্ভব?—তারপর হঠাৎ চিন্তিত হয়ে বলেন, আমার নিজের কথাও ত তাহ্লে ভাবতে হয় দেখছি। মেয়েদের সব ভালভাবে বিয়ে দিয়েছি,—জামাইদের কাছে বাইরে থাকে। এখানে মাঝে মাঝে আসেও।—নাঃ, তারা কেউ ওরকম হবে না। তবু, আইনে যদি অধিকার দিয়ে থাকে—তারাই বা দাবী ছাড়বে কেন?—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সম্পত্তি থাকাও এক বিপত্তি!—গালে হাত রেখে চুপ করে ভাবতে থাকেন।

চারিদিকে আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। বিরাট নিস্তব্ধতা। সেই অচল হিমাচলের নিভৃত অন্দরে প্রাচীন সংস্কারের অচলায়তন। সেই দুর্গম গিরি-প্রাচীর ভেদ করে প্রগতির আকস্মিক তুফান পাহাড়ী মানুষের শান্ত জীবনে দুশ্চিন্তার ও অশান্তির প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে!

৬

বদরীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ যাত্রীদের মিলন-ক্ষেত্র। নতুন যাত্রী কারা এলেন, কতলোকই বা এলেন, সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলেই অনেকটা ধারণা করা যায়। যাত্রী-সংখ্যা তো কম নয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত

অবিরত আসছে। উঠছে, ভাঙ্ছে, ফিরছে। সহরে প্রবেশ করার মুখে কর্তৃপক্ষদের একটা দপ্তরও আছে—যাত্রী-সংখ্যা গণনার জন্যে। প্রতিদলের দলপতির নাম ধাম, কয়জন সঙ্গী—সব লেখা হয়। মে-জুন মাসে যাত্রায় সবচেয়ে ভিড়। প্রতিদিন হাজার খানেক যাত্রী—কখনো বা তারও বেশী—আসতে থাকেন। পটখোলার দিন—অর্থাৎ বছরে প্রথম যেদিন মন্দির খোলে—পাঁচ ছয় হাজার যাত্রী হয়। প্রায় ছয়মাস মন্দির খোলা থাকে, আজকাল বাস্ চলাচল হয়ে সর্বসমেত লাখখানেকেরও উপর যাত্রী বছরে যায়। আগেও বহু যেতেন, সে-সময়েও বছরে পঞ্চাশ ষাট হাজার হোত। তবে তখন লোকেদের মনে নানারকম ভয় ছিল, ভাবনা ছিল,—এখন অনেক কমে গেছে। কেদারনাথের-যাত্রা, বাস্ হয়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে নি। ও-দিকেও বাস্-পথ এগিয়েছে, কিন্তু অনেকে আজকাল দু'বার বাস্-বদলের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শুধু বদরীনাথেই যান। সারা তীর্থপথ ঘোরাতে তাঁদের উৎসাহের অভাব, সম্ভবতঃ সময়েরও টানাটানি। তাই, শুধু বদরীনাথে দশ বারো দিনেই ঘুরে আসেন। এ-যাওয়ায় সার্থকতা কম। যাঁরা অবশ্য দু'বছরে ধীরে সুস্থে দু'জায়গায় যেতে চান—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। সে-রকম এক দম্পতির সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল।

বদরীনাথ থেকে ফিরে আসছি। পথের পাশে চটীতে কাঠের বেঞ্চের ওপর দু'জনে বসে চা খাচ্ছেন। সাধারণ যাত্রীর মত বেশভূষা নয়–তাই বিশেষ করে চোখে পড়ল। ভদ্রলোকের পরনে হাত-কাটা সার্ট, ফুল-প্যাণ্ট—বুটের সঙ্গে ব্রীচেস্-এর মত পট্টি দিয়ে বাঁধা, মাথায় ক্যাপ—টুপি, চোখে রঙীন্ চশমা, হাতে লাঠি। ভদ্রমহিলার সুশ্রী চেহারা, পরনে ফুল-কাটা নানান্ রঙে চিত্রিত সিল্কের শাড়ি, মাথায় রোদ আটকাবার জন্যে প্রকাণ্ড এক স্ট্র হ্যাট্—টুপি, চোখে নীল চশমা, ঠোঁটে গালে লাল রঙের প্রসাধন। তাঁরও কাছে এক লম্বা লাঠি।

চটীতে সাধারণতঃ চা দেয় মোরাদাবাদী গেলাসে। আজকাল কোথাও কোথাও কাপ-ডিসের প্রচলন হচ্ছে। গেলাসগুলি গরম হয়ে যায় অতি-সহজেই। রুমাল বা সেই জাতীয় কাপড় দিয়ে না জড়ালে হাতে ধরা যায় না। এঁরা দু'টি রঙীন রুমালে সেই ভাবেই ধরেছিলেন। পান করছেন দেখলাম, খুব উপভোগ করে। আমাকে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক ক'টা বেজেছে বলতে পারেন?

হেসে উত্তর দিই, ঠিক সময় কি, তা জানা নেই। অনেকদিন সহর-ছাড়া, ঘড়ি মেলাবার সুযোগ পাই নি। তবে আমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে বলতে পারি।

সময় বলি। তাঁর ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল, তিনি চালিয়ে নেন। আমি বলি, এ-সব পথে এক-আধ ঘণ্টার তফাৎ হলেও ক্ষতি নেই—এখানে কেউ সময়ের সে-ভাবে মূল্য দেয় না, দরকারও হয় না।

তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। শিক্ষিতা মহিলা। সাহেবী কায়দায় ইংরাজি বলেন।

ভদ্রলোক বলেন, দেখুন, আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে পারেন? আমাদের দু'জনের কাছে দু'টা ক্যামেরা রয়েছে। ছবিও তুলছি অনেক। উনি আমার ছবি তোলেন, আমি ওঁর তুলি—কিন্তু দু'জনের ছবি একসঙ্গে তোলা হচ্ছে না। আমার ক্যামেরাটা ঠিক করে আপনার হাতে দিচ্ছি—আমরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াবো—একটা ছবি যদি কষ্ট করে তুলে দেন।—মুখে সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়ান।

আমি সানন্দে ছবি তুলে দিই। দিয়ে বলি, একটু দাঁড়ান। আমারও একটা অনুরোধ আছে। এটা আমার অজানা ক্যামেরা—ঠিক উঠল কিনা জানি না। আপত্তি যদি না করেন, আমার নিজের ক্যামেরায় একটা ছবি নিই—ওতে ঠিকই উঠবে, ভরসা রাখি।

ওঁরা আরও খুশী হন। ছবি তোলা হয়। কলকাতায় এসে ওঁদের পাঠিয়েও দিই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। সিন্ধ্-প্রদেশে বাড়ী ছিল। পাকিস্তানের পর সব ছেড়ে আসতে হয়েছে। মিলিটারী এয়ার অফিসর। ফ্লাইট লেফ্টেনেন্ট। দিল্লীতে এখন আছেন। একমাসের ছুটি নিয়েছেন। সস্ত্রীক বদরীনাথ বেড়াতে চলেছেন। এ-যাত্রায় কেদারনাথ যাবেন না। বলেন, এবার এটাই শুধু করা যাক। ভাল লাগে তো, আসছে বছর আবার একমাস ছুটি নেবো—তখন কেদারনাথ ঘুরে আসা যাবে। ভাল যে নিশ্চয় লাগবে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারছি। ধীরে সুস্থে পায়ে হেঁটে চলেছি। ইচ্ছে হলেই চটীতে বসি—চা খাই। সারাদিনে দু'মাইল—চার মাইল গেলেও ক্ষতি নেই। একমাস সময় হাতে রয়েছে—কম নয় তো! দু'জনে বেশ দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যাওয়া

যাচ্ছে। রাস্তাও দেখছি ভালই—শুধু পাতালগঙ্গার কাছে দেখলাম এক-জায়গায় ভেঙে গেছে—সারানো চলছে—সেইখানটায় একটু সাবধানে পার হতে হোল। যারা কাজ করছে তারাই হাত ধরে পার করিয়ে দিলে। আমি এঁর একটা ছবি সেখানে তুলে নিয়েছি—এই ড্রেস্—সাজগোজ—আর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া-জামা লেঙ্‌টি-পরা ধূলো-মাটি-মাখা এক গাড়োয়ালি! দু'জনকে চমৎকার মানিয়েছিল!—বলে কৌতুক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান।

মহিলাও হেসে উঠে বলেন, বটে! আমার কথাটা বলা হোল—আর নিজের কি? মিলিটারী অফিসর। মস্ত বীর পুরুষ! সে-জায়গাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের তলায় একটা ছোট্ট পাথর একটু সরে গেছে—আর অম্‌নি—ওঁর তখনকার মুখের চেহারাটা যদি দেখতেন!—যে-লোকটা হাত ধরে ওঁকে পার করেছিল, দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন!—আমিও নিয়েছি সেই অবস্থার একটা ছবি তুলে! দেবো তোমার কমাণ্ডারের কাছে পাঠিয়ে।

দু'জনে এইভাবে হাস্য-পরিহাস করতে থাকেন। 'বাই' 'বাই'—বলে এগিয়ে চলেন।

দেখি, মন-ভরা আনন্দ নিয়ে চলেছে। যেন, দু'টি রঙীন্ পাখী—বনের মধ্যে গাছের এ-ডালে ও-ডালে বসতে বসতে উড়ে চলেছে! জানি, আর দু'দিন চলার পর, রঙের চটক্ যাবে, কিন্তু মনের আনন্দ কমবে না।

সেই ভদ্রমহিলার অতো রঙীন্ বেশভূষা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও পাহাড়ের পথে দৃষ্টি-কটু লাগে নি। কিন্তু চোখে লেগেছিল বদরীনাথের মন্দিরের মধ্যে আর এক মহিলার সাজসজ্জা দেখে।

দর্শনের জন্য যাত্রীর তখন বেশ ভিড়। মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহের দরজার সামনে একটু জায়গা নিয়ে বসতে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো সকলের দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি নয়—দরজার একধারে পাথরের যে উঁচু লম্বা বেদী মত বসবার জায়গা আছে—সেই দিকে। তাকিয়ে দেখি একটি রূপসী মহিলা সেখানে বসে। রঙ্-বেরঙের খুব দামী ও উজ্জ্বল শাড়ি পরা। অঙ্গ-ভরা হীরা-মুক্তার অলঙ্কার। তাঁর পাশেই বসে আছেন এক নধর-কান্তি পুরুষ—গেরুয়াধারী! এমন ভাবে আছেন যে ইনি মহিলাটির

সঙ্গী বলে বুঝতে ভুল হয় না। এই বিচিত্র সমাবেশ ও মন্দিরের মধ্যে রূপসজ্জার এমন উৎকট পরিচয় অদ্ভুত লাগে,—যাত্রীরাও দেবতা ভুলে মানুষের লীলা দেখে।

লীলাই বটে!

মন্দির থেকে বেরিয়ে পরিচয় পাই। এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের কোন এক মঠের মঠাধীশ। অতএব, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। পরিধানে ওটা ঠিক গেরুয়া নয়, গেরুয়া অনুরূপ আর এক কি রঙ্, শুনি। সঙ্গে সহধর্মিণী। তাঁদের মঠের নিয়মে বিবাহে বাধা নেই। সস্ত্রীক তীর্থ-দর্শনের পুণ্য অর্জন করতে বেরিয়েছেন।

তা করুন। কিন্তু, দেবস্থানের উপযোগী বেশভূষা করাও যে ধর্মেরই এক অঙ্গ,—সে বোধের অভাব হয় কেন, বুঝি না। দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে হলে পুরুষদের খালি গায়ে যাবার প্রথা আছে। দেহের সাজ-সজ্জা বাইরে ফেলে দেবতার কাছে যেতে হবে—এ-কথা ভাবতেও ভাল লাগে। উত্তর-ভারতে সেরূপ কোন রীতি নেই; হিমালয়ের এই সব শীতাঞ্চলের মন্দিরে হবারও উপায় নেই। কিন্তু, তবুও সর্বত্রই মন্দিরে বেশ-ভূষার শালীনতা যাত্রীমাত্রেই মেনে চলেন। এতে মনে তৃপ্তিও আনে। মনে পড়ে, আমাদের দেশের পূজার্থিনী মহিলাদের কথা। কি শুচি-শুভ্র রূপ-সজ্জা, স্নান সেরে গরদ বা তসরের সাড়ি-পড়া, ভিজা চুল—এলো করে কাঁধ বেয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে রাখা, একহাতে নৈবেদ্যের থালা—চন্দন, ধূপকাঠি, অপর হাতে সদ্য-তোলা ফুলের সাজি,—মুখ-ভরা স্নিগ্ধ-পবিত্র ভাব! ধন-দৌলতের জৌলুষ নয়, উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের বিকিরণ নয়—সহজ সুন্দর ভক্তি-প্লুত অপূর্ব মূর্তি!

মন্দিরে দেব-দর্শনে একটা আনন্দ আছে। কেন আছে, তার মধ্যে যুক্তি-তর্ক চলে না। মানুষের বিচিত্র মন। কোন্ পথ দিয়ে তার আনন্দ আসে, দুঃখ জাগে—সব সময়ে তার কারণ পাওয়া যায় না। মন্দিরের বাইরে আব্-হাওয়ার মধ্যে মনের যে ভাব, মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহের সামনে দাঁড়াতেই সেই মনেরই একটা অকস্মাৎ পরিবর্তন আসে। বেশ লাগে বসে বসে মূর্তির সেবা-পূজা-আরতি দেখতে।

প্রাতে ও রাত্রে নির্বাণ-দর্শন। ভোরে রাত্রির অঙ্গাবরণ একে একে সব

খুলে ফেলা হয়। তখন দর্শন পাওয়া যায় বেশ-ভুষাহীন শুধু পাথরের মূর্তির। সৌম্যদর্শন নারায়ণ। যোগাসনে আসীন। পূজার অধিকারী একমাত্র রাওয়াল। দেবতাকে স্পর্শ করার আর কারো অধিকার নেই। দক্ষিণ-ভারতের নাম্বুদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গর্ভগৃহে আর একজন সাহায্যকারী আছেন —নায়েব রাওয়াল। সব গুছিয়ে রাওয়ালজির হাতে তিনি এগিয়ে দেন। আর কারো ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। দ্বারের বাইরে দর্শন-গৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-আচার্য-উপাসকগণ সুর করে সমস্বরে বেদপাঠ করেন, স্তোত্র পড়েন।

এরি মধ্যে এক সময়ে বিগ্রহের লক্ষণাদি ব্যাখ্যাও করে দেন একজন,—রাওয়ালজি সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল দীপ নিয়ে সেইসব লক্ষণ দেখিয়ে দেন।

কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় ফিট দুই উঁচু। কেউ বলেন যোগাসন, কারো মতে সিদ্ধাসন। চরণ দু'খানি দেখা যায়; চরণে পদ্ম-চিহ্ন—বর্ণনায় শুনি। দুইটি হাত কোলের উপর রাখা—স্পষ্ট দেখা যায়। কারো মতে চতুর্ভুজ মূর্তি—অপর দুইটি হাত একসময়ে থাকার কয়েকটি নিদর্শন মূর্তির অঙ্গে দেখানো হয়। কম্বু-গ্রীব—প্রদীপের আলোকেও শাঁখের ন্যায় রেখা গ্রীবায় স্পষ্ট ফোটে। যোগী নারায়ণ—শিরোভাগ থেকে জটাভার নেমে এসেছে দু'দিকে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত, মধ্যখানে ভৃগু-পদ-চিহ্ন। বিশাল-বক্ষ। ক্ষীণ-কটি। সুন্দর লীলায়িত মূর্তি। কিন্তু, মুখমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই—যেন কিসের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে—এমনি মসৃণ, সমতল!

এ-মূর্তি কোন্ দেবতার তা নিয়ে মতভেদ আছে।—সে কথাও প্রচার করা হয়। বৈষ্ণবরা এই বিগ্রহে দেখেন—চতুর্ভুজ নারায়ণ। শৈবরা বলেন, দ্বিভুজ জটাধারী শিবমূর্তি। শক্তি-উপাসকদেব মতে—দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈনরা বলেন, ইনি তীর্থঙ্কর। আবার, কারো মতে—এটি ধ্যানী-বুদ্ধ-মূর্তি; নারায়ণের প্রাচীন মূর্তি অপসারিত হবার পর, এই মূর্তি তিব্বত থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বৈখানস বদরীনারায়ণের মূর্তিতে রামচন্দ্রজির পূজা করতেন। ব্যাখ্যাকারী উপসংহারে বলেন, দেবতার মূর্তি। যে-ভক্ত যেমন বিশ্বাস নিয়ে দেখবেন তিনি এখানে সেই রূপেরই সেইভাবে দর্শন পাবেন। ভগবান-ই আশ্বাস দিয়েছেন:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

মন্দিরের অন্য বিগ্রহাদিরও সেইভাবে পরিচয় ও বর্ণনা দেওয়া হয়—দুই ঋষি-ভ্রাতা নর ; নারায়ণ ; নারদ, গরুড়, কুবের আদি।

শোনা যায়, বদরীনাথে নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এখনকার এই মূর্তি উদ্ধার করেন এবং গরুড়শিলার কাছে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, ১৫শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের এক মহারাজা বদরীনাথে একটি মন্দির নির্মাণের জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং এখন যেখানে মন্দির সেইখানে মূর্তিটি নিয়ে আসেন। এর পর রাণী অহল্যাবাঈ সেই মন্দিরটির সংস্কার করেন ও মন্দিরের শীর্ষদেশে স্বর্ণ দিয়ে আচ্ছাদন করে দেন।

শুনি, এ-মূর্তি সাধারণ পাথরের মূর্তি নয়, শালগ্রাম-শিলা।

মূর্তির অভিষেক হয় ;—ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজলে, দুধের ধারায়ও। তারপরে আতর আদি সুগন্ধি উপচারে মার্জন হয়। রাওয়ালজি আতরের পাত্রটি বাইরে পাঠিয়ে দেন—দর্শনার্থীরা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে সেই সুগন্ধ কপালে লাগান, ঘ্রাণ করেন,—মনে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল ভাব জাগে। তারপর, গাঢ় শ্বেত-চন্দন দিয়ে নারায়ণের সারা অঙ্গ প্রলেপন করা হয়—যেন সুদক্ষ ভাস্কর চন্দনেরই এক অপরূপ মূর্তি গড়লেন। অবশেষে বেশ-ভূষা দিয়ে, অতিমূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে, বহু ফুলের ও পাহাড়ী-তুলসীর মালায় বিগ্রহের শৃঙ্গারবেশ হয়,—তারি মধ্যে ফুটে ওঠে চোখ-মুখ-নাসার আকৃতিও। প্রকৃত পাথরের শান্ত সমাহিত যোগী-মূর্তি এইভাবে অদৃশ্য হন ;—উজ্জ্বল বসন-ভূষণ-ফুল-সাজে সিংহাসনে জেগে বসেন মোহন মধুর মূর্তি!—তখন শুরু হয় নানান্ দীপমালায় তাঁর আরতি ;—ঘণ্টা ধ্বনি ওঠে, স্তবগান চলে।

একবার এই মূর্তি সাজানোর মধ্যে বিশেষ এক আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

সে-বছর কলকাতা থেকে যখন যাত্রার আয়োজন করছি, মা বললেন, নারায়ণের বস্ত্র নিয়েছ?

আমি হেসে বলি, নিজেকেই নিয়ে চলেছি—সামান্য একটা কাপড় নিয়ে কি হবে? কতো ধনীলোক যান—খুব দামী ভালো ভালো রঙ্-বেরঙের ভেল্‌ভেট্, সিল্কের কাপড় দেন। তোমার নারায়ণের কি আর কাপড়ের অভাব? না, সেইসব ফেলে আমার-নিয়ে-যাওয়া সামান্য একটা কাপড় তিনি পরবেন?

মা, ধমক দেন, ছিঃ, ও-কথা বলে! একটা জোড় কিনে নিয়ে যাও—ছোট হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রঙ্‌টা দেখে নিও—নারায়ণের সব রঙ্ চলে না—হলুদ রঙ্ হলেই ভাল।

বলেই চুপ করে অন্যমনে একদিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। ভাবি, বোধ হয় নিজের কল্পনায় কল্পিত কাপড়খানি পরিয়ে মূর্তিটি দেখেন!

তারপর বলেন, হাঁ, তাই নিয়ে যা।

নিয়ে যাই-ও।

রাওয়ালজি মূর্তি সাজাচ্ছেন। একমনে বসে দেখছি। বেশ সাজান। এদিকে একটা কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে, ওদিকে খানিকটা কুঁচিয়ে—একটু পেছিয়ে এসে দেখেন, ঠিক হোল কিনা। নাঃ, ওদিকটা যেন একটু বেঁকে আছে, এগিয়ে গিয়ে সোজা করে দেন। ওখানটায় মানায় নি। আর একটা কাপড় তুলে নিয়ে সেইদিকে ঝুলিয়ে দেন। রত্নবেদীর ওপরও এমন ভাবে কাপড় ছড়িয়ে দেন, মনে হয় যেন বিগ্রহের দেহেরই এক অংশ। সরে এসে এক মনে এক দৃষ্টিতে দেখা, আবার এগিয়ে যাওয়া—অতি-সযতনে একটু অদল বদল করা,—দেখে মনে হয় যেন, নিপুণ শিল্পী ইজেলের ওপর ছবি রেখে আঁকছেন—দূর থেকে দেখছেন, আবার এগিয়ে এসে আঁকছেন।

পাশে জড়ো-করা যাত্রীদের দেওয়া কাপড়। ভালো ভালো দামী অনেকগুলি রয়েছে—তার থেকেও দু-একটা তুলে নেন্। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, তারি মধ্যে থেকে বেরুল মা'র-পাঠানো সেই পীত-বসনটি। উঁচু করে ধরে রঙ্‌টি দেখেন। তারপর খুলে কুঁচিয়ে মূর্তির সুমুখদিকে মধ্যিখানে কোঁচার মত ঝুলিয়ে দেন—কাপড়ের নীচের দুই দিকের দুইটি খুঁট ধরে বেদীর উপর বিস্তার করে দেন—দেখে যেন মনে হয় একটি ফোটা কমলের আধ-খানা! আশ্চর্য হয়ে দেখি। ঐটুকু বস্ত্রখণ্ড, তারি মধ্যে এতোখানি বিস্তৃতি ছিল! ছোট কাপড়ও বড় হয়ে চোখে পড়ে। আনন্দে মন ভরে ওঠে। মনে মনে মাকে স্মরণ করি, দেখে যাও তোমার নারায়ণের কাপড় পরা! সেই জন্যেই বুঝি হেসেছিলে!

সেইদিনই মাকে চিঠি লিখে সব জানাই। দিনের মধ্যে কয়েকবার মন্দিরে ঘুরে ঘুরে দেখেও যাই।

রাওয়ালজির মূর্তি-সাজানো, পূজা আরতি—দেবতার সব কাজেই যেমন সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর প্রেম-বিহ্বল তন্ময়তাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমারও ভাল লাগে। সেই বারই তাঁর সঙ্গে, তারপর, আলাপ করি তাঁর বাড়ী গিয়ে। তপ্তকুণ্ডে যাওয়ার পথে সিঁড়ির

ধারেই বাড়ী। বয়স বোধ করি বছর পঁচিশ মাত্র হবে। পাতলা লম্বা গড়ন। কৃষ্ণ বরণ। মাথায় লম্বা কালো কোঁকড়ানো চুল—কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ইংরাজি বোঝেন না, হিন্দী অল্প শিখেছেন, সংস্কৃত ভাল জানেন। মাত্র দু'বছর এখানে এসেছেন। সরল মধুর ব্যবহার। অল্প কথা বলেন,—মনে হয়, মন যেন তাঁর কোন্ গভীরে ডুবে আছে। তাঁর বিগ্রহ-সাজানোর প্রশংসা করি। লজ্জা পান। শূন্য দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকান। অস্ফুটস্বরে বলেন, ওতে অদ্ভুত এক আনন্দ পাই। আমার তখন নিজের আর জ্ঞান থাকে না—মনে হয়, কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।

আমি বলি, দেখে মনে হয় বিগ্রহও আনন্দ পান আপনার হাতে সেজে ও পূজা নিয়ে!

এই ভাবেরই স্বল্প পরিচয় হয়। কিন্তু তারই মধ্যে অসীম আনন্দ পাই।

পরের বছর গিয়ে দেখি, তিনি নেই। আর এক নতুন রাওয়াল। তাঁর খবর নিই। শুনি, শীতের সময় মন্দির বন্ধ হ'লে দক্ষিণে তাঁর দেশে যাচ্ছিলেন। পথে কাশীতে নামেন। সেখানে বসন্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মন্দিরে বসে বারবার তাঁর কথাই স্মরণ হয়। ভাবি, স্বর্গের মন্দিরে বুঝি তাঁর সাজানোর ডাক পড়েছে!

কয়েক বছর থেকে মন্দিরের ভিতর বেশী যাই না বা থাকি না। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই ঘুরি। দেবতার দর্শন মনে মনেই করি। এর এক বিশেষ কারণ আছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে—যেখানে বিগ্রহ আছেন—তার সামনে একটি ঘর। সব যাত্রী সেই ঘর থেকে দর্শন করেন। ঘরের মধ্যখানে একটা বড় সিন্দুক, তার উপর রূপার প্রকাণ্ড এক থালা ও ডাবর রাখা। ডাবরের তলায় ফুটা, সিন্দুকের মাথায় গর্ত্ত। ডাবরের মধ্যে যা পড়ে, সিন্দুকের ভিতর তা চলে যায়, সিন্দুকে তালা বন্ধ। এই পাত্রগুলিতে যা কিছু প্রণামী, দান ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। সিন্দুকটি ঘরের মাঝে থাকায় একটা বেড়ারও কাজ করে—যাত্রীদের ঐখান থেকেই দর্শন করতে হয়—আরও কাছে যাবার তাদের উপায় নেই। সিন্দুক থেকে গর্ভগৃহের দ্বার পর্যন্ত সম্মুখের যে স্থানটুকু—দর্শন পাবার সব চেয়ে ভাল ও লোভনীয় জায়গা যেটা—সেখানে শুধু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদের প্রবেশ করার অধিকার আছে। এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন

যে-সব যাত্রী মোটা টাকা দিয়ে পূজা দেন, আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা,—সরকারী ক্ষমতাশালী অফিসররা তো বটেই। কয়েকবার যাতায়াতের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের সঙ্গে আমার সৌহার্দের সম্বন্ধ হয়ে গেছে, আমি গেলেই সাদরে কাছে সবাই ডেকে নেন্। তাই আমারও সেখানে যাবার কোন বাধা নেই।

কিন্তু, সেখানে বসে স্বস্তি বোধ করি না। পিছনে পঁচিশ-ত্রিশের বেশী যাত্রী এক সঙ্গে ধরে না। অথচ, হয়তো হাজারখানেক যাত্রী দর্শন পেতে এসেছেন;—মন্দিরের ভিতর, বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যাতে হঠাৎ ভিড়ের চাপ ঘরের মধ্যে এসে অশান্তির সৃষ্টি না করে তাই দরজার বাইরে প্রাঙ্গণে কাঠের বেড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া আছে,—তারি মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে যাত্রীরা ঘরে ঢোকে। দরজার মুখে মন্দিরের দ্বাররক্ষীরা থাকে,—ঘরের ভিতরের জনতা বুঝে—দরজা খোলে, যাত্রী ছাড়ে, আবার বন্ধ করে। দর্শনের পর বার হয়ে যাবার আর একটি দরজা—ঘরের আর এক দিকে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু মন্দির ছোট, যাত্রী অনেক বেশী। কর্মচারীরা, সাধারণতঃ, বিনীতভাবেই এক মিনিট পরেই সামনের যাত্রীদের বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন, আপনাদের দেখা হয়ে গেছে—এবার এগিয়ে ঐ দরজা দিয়ে যান—পেছনের যাত্রীদের আসতে দিন—তাঁরাও দেখবেন—চলুন, এগিয়ে চলুন !

কিন্তু, আগাবেন কে? সব যাত্রীই বহু দূর দেশ থেকে কত কষ্ট স্বীকার করে—কত অর্থ ব্যয়ে—কত বুক-ভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—হিমালয়ের এই দুর্গম তীর্থে এসেছেন—ভগবান শ্রীবদরী-বিশালের দর্শন পেতে। এই কি তাঁর দর্শন? দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই—বাইরের প্রখর আলো থেকে এসে মন্দিরের অভ্যন্তরের স্তিমিত আলোকে তখনও চোখের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয় নি—বিগ্রহের দর্শন তখনও সুস্পষ্ট নয়;—বাইরের কোলাহল থেকে মন তখনও মুক্ত হয়ে সমাহিত হয় নি—মন্দির ছেড়ে চলে যাবো?

কর্মচারী তাগাদা দেয়, বেরিয়ে চলুন, এখন বেরিয়ে যান—ইচ্ছে হয়তো আবার ঘুরে পেছন থেকে আসবেন।

যাত্রী বলে, আবার সেও ত এসে তখনি বেরিয়ে যেতে হবে?

তা'ত হবেই। উপায় কি?

এ-যেন সেই ঝাঁকি-দর্শন। বৃন্দাবনের এক মন্দিরে দেখেছিলাম।

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ নাথদ্বার মন্দিরেও সেই নিয়ম। মন্দিরের ভিতরের দরজার উপর পর্দা ফেলা। পর্দা একবার সরছে, আবার তখনি বন্ধ হচ্ছে। এরি মধ্যে বিগ্রহের দর্শন। যেন, ঝিলিক্ মেরে দেখা!

বদরীনাথে পর্দা সরে না। সারি সারি যাত্রী সরে। একটানা স্রোতের মত অনবরত চলেছে;—ধীর স্থির মনে তাদের দর্শনের কোন উপায় নেই। অথচ, আমি বসে আছি—মূল দরজার কাছে—বিগ্রহের সামনে। যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকবে—এখানে বসে দেখতে পারি। পাশে আমার বিপুল-কায় কয়েকটি মাড়োয়ারী পুরুষ-মহিলা।—তাদের কোলের উপর দু'টি ছোট ছেলে মেয়ে শিশু-সুলভ উৎপাত করে।

হঠাৎ কানে শুনি পিছনে জনতার মধ্যে এক নারী-কণ্ঠ।—'যাচ্ছি, বাবা, এখনি যাচ্ছি।—একটু দাঁড়িয়ে একবার দেখতে দাও। কই, নারায়ণের চরণ কই? দেখা যায় না? আহা, তাইত! বসনে মালায় ঢাকা পড়েছে যে! মুখটি কোথায় দেখাও না, বাবা! হাঁ, বুঝতে পারছি—ঐখানে হবে—কপালের ওপর ঐ না হীরে ঝক্‌ঝক্ করছে—মাথার ওপর মস্ত বড় মুক্তো-পান্নার মুকুট ঐ ত্রে! আহা—কি সাজ! চোখ সার্থক হোল। ধরো—বাবা, ধরো, এই নাও।'

পেছন ফিরে তাকাই। দেখি, ছিন্ন তসর-পরা এক বৃদ্ধা। চোখের দৃষ্টি কমেছে, শরীরের শক্তি গেছে, তবু ভিড় ঠেলে সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটি ছোট্ট, পাতলা রূপার বাঁশী। তুলে ধরে কর্মচারীকে দেন, বলেন, যাচ্ছি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—একবার ঠাকুরের হাতে এটি ধরিয়ে দাও বাবা—দু'চোখ ভরে দেখে যাই।

কর্মচারী মৃদু হেসে বলেন, মা, ঠিক আছে, এটা দেবেন তো? এই সিন্দুকের মধ্যেই থাকবে—এ-সবই ঠাকুরের জিনিষ আছে এতে।

বৃদ্ধা ছাড়েন না, অনুনয় করতে থাকেন, একবারটি ঠাকুরের হাতে দাও বাবা!—কর্মচারী হেসে বাঁশীটি সিন্দুকেই ফেলে দেন। বৃদ্ধার চোখে জল নামে। এক পা এগিয়ে যান। আবার ফিরে দাঁড়ান, বলেন, যাচ্ছি, দাঁড়াও, এটাও আছে যে!—একটি পুরানো রূপার টাকা অতি যত্নভরে আঁচল থেকে খুলে দেন। এ-যে তাঁর লক্ষ-টাকার সমান!—সিন্দুকের রাশীকৃত প্রণামী অর্থের মধ্যে সেটিও লুপ্ত হয়।

কিসের এক লজ্জায় ও বেদনায় আমার মন ভরে যায়। আমিও উঠে চলে আসি। তারপর থেকে, দর্শনে গেলেও আর বেশীক্ষণ ওখানে বসি না।

আর একবারের কথা।

বাইরে মণ্ডপে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দর্শন করছি। নিকটে একজন তার সঙ্গীকে বিগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন, শুনি। বিবরণের ধারা শুনে কৌতূহল হয়। তাকিয়ে দেখি, সঙ্গীটি তাঁর সম্পূর্ণ অন্ধ। অপরের মুখের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শনের আনন্দ নিচ্ছেন। মনে মনে ভাবি, এই দুর্গম পথ,—কতরকম অসুবিধা—এই অন্ধব্যক্তি অতিক্রম করে এসেছেন, নিশ্চয়, সঙ্গীর হাত ধরে। কিন্তু, এ-পথের একটা বিশেষ আকর্ষণ—চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চোখে মনে আনন্দ আনে। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করে। নূতন দেশ ও দৃশ্য দেখার মনে একটা আগ্রহও থাকে। তাছাড়া মন্দিরে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা ত আছেই। কিন্তু, দৃষ্টিহীনের কাছে এ-সবই নিরর্থক, মূল্যহীন। যেখানেই তিনি থাকুন—একই কথা। তবে, কেন এই কষ্ট স্বীকার করে ব্যর্থ যাত্রা!

দর্শন-শেষে তাঁদের কাছে এগিয়ে যাই। তাঁর এই দর্শন-না-পাওয়ার দুঃখে সহানুভূতি দেখাই!

বিচিত্র মানুষ!—মুখে দেখি তাঁর পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রসন্নতা। হেসে আমায় বলেন, দর্শন আমি পাই নি, ঠিকই। আমি যে অন্ধ। কিন্তু, নারায়ণের তো চোখ আছে—তিনি আমায় দেখলেন! সেই তো আমার আনন্দ!

৭

জগতে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে সহজ দৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ, যুক্তিবাদ মানুষের ধর্ম। প্রাণিজগতে এই তার এক বৈশিষ্ট্য। কারণ না বার করে সে তুষ্ট হতে পারে না। কিন্তু, কারণ যদি নাই পাওয়া যায়, করাই বা যাবে কি? অগত্যা তখন কেউ বলেন, ওটা ভূতের খেলা; কেউ বা চোখ বুজে বলেন, দেবতার লীলা; আবার কেউ বা সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেন, আছে বই কি ভেতরে কিছু,—লোকে ধরতে পারে নি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করি না।

ব্যাপারটা ঘটে বদরীনাথেই। আমারও নিজের চোখে দেখা নয়। শোনা কথা। তবে, অনেকেই যাঁরা দেখেছিলেন, গল্প করলেন। সে-বছর

বদরীনাথ পৌঁছুতেই স্থানীয় কয়েকজন এসে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আহা! আপনি এই ক'টা দিনের জন্যে দেখতে পেলেন না—মাত্র তিন দিন আগে হয়ে গেল। স্বামীজি যে আবার নারায়ণকে ভোগ খাওয়ালেন! এর আগের বার অনেকে দেখতে পায় নি, তাই বিশ্বাসও করে নি। এবার কারও যাতে কোন সন্দেহ না থাকে—তার ভালভাবে ব্যবস্থা করে ভোগ দিলেন, নারায়ণ হাতে করে খেয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত ক্ষমতা স্বামীজির! আপনার ভাগ্যে দেখা হোল না!

মনে মনে ভাবি, আমার ভাগ্যটাই ঐ রকম। একবার কলকাতা সহরে এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়ীতে ভূত দেখা গেল। ক'দিন আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকে ঘরের দেওয়ালে নানারকম ছায়া দেখা যেতে লাগল। ছায়ার মাধ্যমে ছেলে-নাতিদের সঙ্গে মৃতের সাঙ্কেতিক কথাবার্তাও চলতে থাকে। রোজই হয়। খবর পেয়ে আমরা গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত রইলামও। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু দেখতে পেলাম না। শুনলাম, ক'দিন ধরে কমে গেছে,—সবদিন হয় না!

কিন্তু, থাক সে-সব কথা।

প্রথমে স্বামীজির পরিচয় দিই, তারপর এই ভোগ-লীলা। কিন্তু, তারও আগে হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু'একটা কথা বলি।

হিমালয়ে বহু সাধু-সন্তের বাস। হিন্দুমতে হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ বা শৈব, কেউ অবধূত সন্ন্যাসী—নানান্ সম্প্রদায়। কারো গেরুয়াবাস, কারো বা কৌপীন সার, আবার কেউ বা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বহু শ্রেণীর সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী। বিভিন্ন-পন্থী হলেও সকলেরই উদ্দেশ্য,—ধর্ম-জীবন-যাপন, ভগবদ্-চিন্তা, সাধন-ভজন। কিন্তু, সকলের সমান শক্তি থাকে না, সমান সিদ্ধিও হয় না। তাঁদের মধ্যে কে কত উচ্চ মার্গে উঠেছেন, বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। সে-বিচারে ভুলেরই সম্ভাবনা। তা ছাড়া, এ-সব শক্তির বিচার করারও ক্ষমতা থাকা চাই।

মানুষই সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে সাধু হয়। সাধু-জীবন আদর্শ-জীবন। তাই, সন্ন্যাস-জীবনে মানুষের সৎ ও মহৎ গুণগুলির বিকাশ ও প্রকাশ সকলে প্রত্যাশা করে। প্রকৃত সাধু-সমাজে, সাধারণতঃ, সেই বিকাশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু, মানুষের মজ্জাগত দুর্বল বৃত্তিগুলিও তো আছে!

চিরতরে সম্পূর্ণরূপে সেগুলি কাটানো সহজ কথা নয়, সব ক্ষেত্রে যায়ও না। তাই কোন সময়ে হয়ত সেই সব মানুষ-স্বভাব সাধু-জীবনেও প্রকাশ পায়। তাতে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন তাঁদের মানুষ ভাবেই মেনে নেওয়া ভাল। সে-সময়ে সেই ক্ষেত্রে সাধু অক্ষম, মানুষ প্রবল।

কঠোর-ব্রতী সাধুর জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতেও দেখেছি।

একবার কেদারনাথে এক নাগা মৌনী সাধুকে দেখেছিলাম। সেই প্রচণ্ড শীতেও নগ্নদেহে নিঃস্পন্দভাবে বসে আছেন। শুনলাম, মস্ত বড় সাধু। তাঁর দর্শনের জন্যে যাত্রীদের কি বিপুল জনতা! সকলেই ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে প্রণাম করছেন। তিনি নিশ্চল, নির্বিকল্প। আমারও দেখে ধারণা হোল, বিরাট পুরুষই হবেন।

দু'বছর পর। ঐ কেদারনাথের পথে এক চটীতে দেখি, লোকের বেশ ভিড়। কৌতূহল জাগল। কাছে গিয়ে উঁকি মারি। দেখি, জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি লোক—কোট্-প্যান্ট-পরা, মুখে সিগারেট, হাতে ক্যাপ্সটানের টিন, অনর্গল বকে চলেছে—হিন্দী, ইংরাজি-মেশানো বুলি—অসম্বদ্ধ সব প্রলাপ। লোকের কাছে শুনি, আগে নাগা সাধু ছিলেন, প্রয়াগে কুম্ভে গিয়েছিলেন—হঠাৎ এই পরিবর্তন ঘটেছে। চিনতে পারি, কেদারনাথে দেখা সেই সাধুটি!

বুঝলাম, কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের দুর্বহ ভার সামলাতে পারেন নি—মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়েছেন—তাই, এই বিকৃত পরিণতি।

ভাল সাধু বলে যাঁদের মনে হয়েছে তাঁদের কথাই এখন বলি। অল্প সময়ে বাইরের আলাপে যেটুকু পরিচয় মেলে, তাই।

হিমালয়ে সাধুদের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন যাঁরা বিদ্বান্, তীক্ষ্ণধী, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। প্রাঞ্জল ভাষায় নানান্ ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন, সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। নিজের মতামতও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-চর্চার উপর তাঁদের ধর্ম-জীবনের ভিত্তি। অথচ, পাণ্ডিত্যের কোন দম্ভ নেই। ছোট একটি কুটিতে—অথবা কোন আশ্রমে শান্ত পরিবেশে থাকেন। শান্তিময় জীবন-যাপন করেন। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার—কোথাও কোন বিলাস নেই। হয়ত সামান্য গেরুয়া কাপড়, ফতুয়া—শীতের সময় গেরুয়া গরম গেঞ্জি, কেউ বা হয়তো এ-সবও ত্যাগ করেছেন। কেউ হয়তো গৈরিকও ধারণ করেন নি। কিন্তু, যা কিছু ব্যবহার করেন, সামান্য হলেও, পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর বা

বাইরে চারিপাশে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে রাখা। মনে হয়, এঁরা বিশ্বাস করেন, মনে পবিত্রতা রাখতে হলে বাইরেও পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান ও নিরহঙ্কার আচরণ দেখে মনে শ্রদ্ধা জাগে। এঁদের সান্নিধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে। সহজ সুন্দর ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধিবাদের (intellectualism) সুস্বাদ উপভোগ করা যায়। শ্রদ্ধেয় তপোবনস্বামী এই শ্রেণীর ছিলেন। শেষ জীবনে উত্তর কাশীতে থাকতেন। আজ বছর তিনেক হোল দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা এখন নয়।

আর এক শ্রেণীর সাধু আছেন, তাঁরা যপ-তপ-আরাধনা, পূজা-অর্চনা নিয়ে দিবারাত্র কাটিয়ে দেন। যে সব আচার নিয়ম ক্রিয়াদিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন—কোথাও যেন নিয়মভঙ্গের সামান্য ত্রুটির ছিদ্রও না থাকে। নিয়ম-কানুনের লোহার বাঁধনে বাঁধা তাঁদের জীবন, যন্ত্রের মত ঘোরে। এর মধ্যে কি আনন্দ পান ও আশা রাখেন, জানি না। পান সম্ভবতঃ,—নইলে করেনই বা কেন?

যোগমার্গী সাধুও আছেন।

বিভিন্ন প্রণালীর যোগাসন—নাম বর্ণনা করে, কোন্ আসনের কি বৈশিষ্ট্য, কি গুণ ও সার্থকতা,—ভুল আসনেরই বা বিপদ কোথায়—দেখিয়ে দেখিয়ে বলে গেছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছি,—মেদশূন্য দেহে সুন্দর পেশীগুলির ছন্দোময় খেলা ; আবার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত অস্বাভাবিক পাক খাওয়ানো। কখনো বা স্থির হয়ে বসে একদৃষ্টে চোখের দিকে তাকান—উজ্জ্বল দৃষ্টি, মনে হয় যেন গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নীল জলের ভিতর তাকিয়ে আছি।

আর এক শ্রেণীর সাধু,—তাঁদের বহির্জীবনে কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রকাশ নেই। স্থির হয়ে একাগ্রমনে বসে থাকেন—বোধ করি যোগ-সাধনাই করেন। মনে হয় কঠোর তিতিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মৌনব্রতী। যাঁরা কথা বলেন, তাঁরাও স্বল্পভাষী। কঠোর সন্ন্যাস-জীবন। তবুও, সহজ সরল মধুর ব্যবহার। বিশেষ কিছু আলোচনা করেন না, পাণ্ডিত্যেরও কোন প্রচার করেন না। তাঁদের কাছে বসলে মনে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব জাগে, জগৎ-সংসারের অশেষ সমস্যা—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা—সব যেন ম্লান হয়ে যায়, শান্তিময় প্রসন্নতায় মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জানি, এ-সবই বাইরের দৃষ্টি দিয়ে বা আপনার মনে অনুভূতি দিয়ে অপরের স্বল্প পরিচয় নেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণ মানুষের মন এতে তুষ্ট হয় না। প্রশ্ন করে হিমালয়ের বড় সাধু—তার প্রমাণ কি? অলৌকিক ক্ষমতা কি দেখলেন?

এ-প্রশ্নের কারণ আছে। সাধারণতঃ, প্রসিদ্ধ সাধকদের জীবনীতে ও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাহিনীর মধ্যে তাঁদের বিরাটত্বের পরিচয় দিতে হলেই প্রথম ও প্রধান প্রমাণ দেখানোর রীতি, তাঁদের অত্যাশ্চর্য বিভূতি —অর্থাৎ কোন দৈব বা অলৌকিক শক্তি। যেন, এই শক্তির আরোপ না করলে তাঁদের মহত্বের কোন প্রমাণই হয় না!

এই ধরণের শক্তি লাভ হয় কিনা, এবং হলেই বা কতখানি হয় ও কেই বা কি পরিমাণ পেয়েছেন—তার প্রমাণ আমি নিজে কিছু দেখি নি। নেবার চেষ্টাও করি নি। যোগাভ্যাসে বা কঠোর সাধনায় মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির কল্পনাতীত বিকাশ হতে পারে—এর অতি সামান্য নিদর্শন আমাদের সাধারণ জীবনেও মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। এই সেদিন কাগজে খবর পড়লাম, একটি তেরো বছরের মেয়ে যোগ-সাধনা করে স্মৃতি-শক্তির এমনি উন্মেষ করিয়েছে যে যে-কোন বক্তৃতা একবার মাত্র শুনলেও নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করে দিতে পারে। অসাধারণ ক্ষমতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু, সাধুদের সম্পর্কে আরও নিগূঢ় কোন আধ্যাত্মিক বা ঐশী শক্তির সন্ধান করা হয়। এই সংশয়ের নিরাকরণ সাধু ছাড়া আর কেই বা করতে পারেন? অথচ, যদি কোন বড় সত্যিকার সাধু এমন কোন অজ্ঞেয় শক্তির অধিকারী হনই, তবে এই সাধনা-লব্ধ আত্মশক্তির পরীক্ষা তিনি অযথা প্রকাশ্যে দেবেনই বা কেন, এবং তাই যদি দেনই তবে তখনি কি সন্দেহ জাগে না যে ইনি উচ্চস্তরের সাধু কিনা? আধ্যাত্মিক বা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী মনের কাছে প্রমাণের প্রয়োজন নেই, তাই এই তর্কও ওঠে না। যদিও, এই বিভূতির প্রকাশ দেখার জন্যে তাঁদের অসীম আগ্রহ। ঐশী শক্তিতে অবিশ্বাসী মন নিজের বিজ্ঞান-লব্ধ বিদ্যার কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন যুক্তিসম্মত কারণ না পেলে সন্দেহ আরও ঘনীভূতই হতে থাকে। সমস্যার সমাধানও হয় না।

সাধারণ মানুষের মনে সাধুদের প্রসিদ্ধির আর এক উপকরণ—তাঁদের পূর্বাশ্রম-পরিচয়! অমুক সাধু বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অমুক ডাক্তার ছিলেন

বা অধ্যাপক ছিলেন কিংবা মস্ত বড় চাকরি করতেন—তা হলে তখনি তাঁর সাধারণ্যে সহজে একটা সুপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। অবশ্য, প্রচারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই ধরণের মনোভাব আমাদের সাধারণ সমাজেও আছে। এর পিছনে যুক্তিরও কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ইনি পূর্বাশ্রমে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত—অতএব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই তাঁর কাছে প্রকৃত সাধুজীবনের প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ আশা করা যায়।

আমাদের বদরীনাথের এই স্বামীজিরও সেই পূর্বাশ্রমের প্রসিদ্ধি আছে, সন্ন্যাস-জীবনেও বিপুল খ্যাতি আছে। উত্তরাখণ্ডে এঁকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন।

শোনা যায়, তিনি এককালে জেলা-জজ্ ছিলেন। দায়রার বিচারে এক আসামীর মৃত্যু-দণ্ড দেন। কয়েক বছর পরে প্রকাশ পায় যে প্রকৃত দোষীর বদলে এক নির্দোষ ব্যক্তির চরম সাজা হয়ে গেছে! তার পরই তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন, সংসারও ত্যাগ করেন, সন্ন্যাস-জীবন নেন। বহু বছর হিমালয়ের নানাস্থানে কঠোর সাধনা করেছেন। কারো কারো মতে সিদ্ধিও লাভ হয়েছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তরাখণ্ডে আছেন। প্রতি বছর কয়েকমাস বদরীনাথে কাটান। আগে বিবস্ত্র ছিলেন। লোক-সমাজে এলে শুধু একটা চট জড়িয়ে রাখতেন। সে অবস্থায় হৃষীকেশের কাছে এক আশ্রমে একবার তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম।

এই স্বামীজিই বদরীনাথে নারায়ণকে ভোগ খাওয়ান।

বদরীনারায়ণের প্রতিদিন ভোগ হয়। দেবতা মাত্রেরই যেমন হয়ে থাকে। ভোগের সময় চারিদিক বন্ধ রাখা হয়; দেবতার আহার মানুষের দেখা চলে না। শুনি, কয় বছর আগে একবার স্বামীজি নিজের হাতে এক ভোগের থালা রেখে দেন, ভোগ-শেষে দেখা যায় সেই থালার অন্ন কে যেন তুলে খেয়েছেন এমন চিহ্ন রয়েছে। সেবার সে-ঘটনা অনেকের দেখার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয় নি। তাই, এ-বছর সকলকে জানিয়ে আবার এই ভোগ-খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। অনেকে এবার উপস্থিত ছিলেন। চারিধার ভাল-ভাবে পরীক্ষা করে সবাই দেখেছিলেন, যাতে কেউ বা কোন কিছু ভোগের জায়গায় বা কাছাকাছিও না যেতে পারে। সুরক্ষিতভাবে ভোগ-সাজানো হোল, সেক্রেটারী নিজেও একটা থালা আলাদা করে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর, সব বন্ধ করে, বাইরে থেকে স্বামীজির নারায়ণকে আরাধন ও

ভোগ-নিবেদন। অবশেষে, যখন পর্দা তোলা হোল—দেখা গেল, সব পাত্র থেকেই কে যেন গ্রাস তুলে খেয়ে গেছেন!

অলৌকিক কাণ্ড!—মন্তব্য করেন আমার বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী।'

কাছেই পরিচিত হিমালয়-বাসী অপর এক সাধু বসে ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করি, স্বামীজি, ব্যাপারটা কি বলুন না একটু খুলে।

তিনি চুপ করে থাকেন। কথা বলতে চান না। বলি, আপনি বিশ্বাস করেন না নাকি—নারায়ণকে নিজে উৎসর্গ করে ভোগ খাওয়ানো?

কঠোর মন্তব্য করেন, নারায়ণের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, গেলেন অতো লোকের কাছে ওঁর ভক্তের পরিচয় দিতে আর মান রাখতে!

বলি, ও-কথা বললে চলে কি করে? ভোগের থালায় চিহ্ন এলো কোথা থেকে?

বলেন, যদি বলি মুষিক-জাতীয় কোন প্রাণীর দৌরাত্ম্য? এ-পাহাড়ে তাদের অভাব নেই।

আমি বলি, ওটা অচল। ইঁদুর অন্য দিন যায় কোথায়?

স্বামীজি বলেন, দেখুন, যোগের দ্বারা অনেক রকম ক্ষমতা হয়। পিশাচ-সিদ্ধ তো হয়ই—আমার নিজের দেখাও আছে। তাদের দিয়ে সুকাজ-কুকাজ করিয়ে নিতেও দেখেছি। এ-ও সেই ভাবে কোন কিছু করানো বলা যেতে পারে। তবে, নারায়ণকে এতখানি বশে আনা,—ডাকা মাত্রেই নিজের হাতে তুলে খেয়ে গেলেন—তা হলে আর ভাবনা কি? এতো ঘোরাঘুরি—এমন ভাবে থাকাই বা কেন—সবই তো হয়ে গেল! ও-সব ভেল্কির কথা রেখে দিন।

মনে মনে ভাবি, ব্যাখ্যা তো হোল না! ইনি পিশাচ পর্যন্ত এগোতে প্রস্তুত আছেন!

সেই বৃদ্ধ শান্ত স্বামীজিকে তারপরও প্রতিবছরই বদরীনাথে দেখতে পাই। একটা সাদা মোটা ছোট কাপড় পরে থাকেন—গান্ধীজির মত। গায়ে একটা সামান্য চাদর। প্রতিদিন বাড়ির সামনের পথ দিয়ে ধীর-পদে মন্দিরে যান, সঙ্গে জন কয়েক ভক্ত করতালি দিয়ে 'না-রা-য়-ণ' 'না-রা-য়-ণ' গাইতে গাইতে চলেন। সহর ছাড়িয়ে একটু দূরে সাধুদের একান্ত থাকবার জন্তে মন্দির কমিটির একটি ভাল কুটি আছে। সেইখানে প্রতিবছর এসে থাকেন। বহু যাত্রী দর্শনে যান। ঘরে বসে দেখি। কিন্তু,

আমার একদিনও যাওয়া হয় না। ভোগ-খাওয়ানোর কাহিনী শোনার পরও। কেন জানি না, যাওয়ার প্রেরণা পাই না।

৮

মন্দিরের মধ্যেও সাধু-দর্শন হয়। তাঁরা নিজেরা দর্শনে আসেন, যাত্রীরাও তাঁদের দর্শন পায়। মন্দিরে ভোগের পর প্রসাদ পেতেও তাঁরা অনেকে আসেন। সেইখানে একবার এক বৈরাগী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। ঠিক পরিচয় নয়, চাক্ষুষ দু'জনে দেখা। দেখামাত্রই দু'জনের মুখে অকারণ মৃদু হাসির বিনিময় ঘটে। কিন্তু, তাতেই দীর্ঘ-পরিচয়ের সেতু রচনা হয়।

মন্দিরে ভোগ বিতরণ হচ্ছে। প্রাঙ্গণের এক অংশে সারি সারি ভোগের পাত্র। তার থেকে প্রথমে সাধু-সন্ন্যাসীদের দেওয়ার প্রথা। তারপরে পাবার কথা সর্ব-তীর্থের চিরন্তন অঙ্গ—ভিক্ষুকদের। একপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যাত্রীদেরও জনতা জমেছে। তাদের মধ্যেও প্রসাদ পাওয়ার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু, প্রথম থেকেই ভিখারীদের সবল প্রবেশে ও উৎকট উত্তেজনায় প্রসাদ-বিতরণে বিশৃঙ্খলতা এনেছে। সাধুরা পাত্র হাতে এসেছেন। দু'একজন ভিড়ের মধ্যে কোন ক্রমে প্রবেশ করে প্রসাদ নিয়ে আসছেন, অনেকেই শান্তি-স্থাপনের আশায় অপেক্ষা করছেন।

কাছেই কে একজন বাংলা-মেশানো হিন্দীতে কথা বললেন। বাংলার আভাস পেয়ে আপনিই দৃষ্টি গেল সেইদিকে। দেখি, একটি সাধু অপর একজন বলিষ্ঠ সাধুকে একটি পাত্র দিয়ে অনুরোধ করছেন জনতা-জাল ভেদ করে তাঁরও প্রসাদ আনার জন্যে। সাধুটি যুবক। গৌরবর্ণ। সুশ্রী। কপালে মোটা করে শ্বেতচন্দনের দীর্ঘ তিলক। মাথায় একরাশ জটা—কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে রয়েছে। অল্প দাড়ি গোঁফ। গায়ে সাদা মোটা সুতির চাদর। পরনে কি আছে বোঝা যায় না। সন্ন্যাসীর রুক্ষ বেশ, কিন্তু মুখে চোখে যৌবনের স্নিগ্ধ দীপ্তি। তরুণ তাপস।

আমি তাকাতেই আমার দিকে তাকান। মৃদু হাসেন। আমিও হাসি। পাত্রটিতে প্রসাদ আসে। এগিয়ে এসে বলেন, জয় সীতারাম! এমন করে ভিড় ঠেলে যেতে সঙ্কোচ লাগে। নিন্—প্রসাদ নিন।

দেখি, পাত্রের ভেতর দু'হাতা অন্নপ্রসাদ ও ডাল। জানতাম—এই এঁদের সারাদিনের খাদ্য।

তাই বলি, এ আপনার জন্যে থাক। আজ আমিও প্রসাদ পাবো মন্দির থেকে, বলে এসেছি।

তিনি তবুও অনুরোধ করেন। আঙুল ঠেকিয়ে একটু মুখে ফেলি, বলি, এই হয়েছে—প্রসাদ কণিকামাত্র।

মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, দেখছি তো এখানেই থাকেন। এতো গোলমালের মধ্যে ভাল লাগে? প্রকাণ্ড সহর হয়ে গেছে না?

তিনি কোন জবাব দেন না। হাসি-ভরা মুখে চলে যান। বালকের মত।

ঘন্টাখানেক পরে আবার দেখা। অতিথি-শালার সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলেছিলেন। আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। আবার পরস্পরে মৃদু হাস্য বিনিময়। 'জয়রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম!' বলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, এইখানে আছেন বুঝি? একটু আগে মন্দিরে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তর দিইনি। সহরে আমি থাকি না। থাকা চলে না। বড়ো হট্টগোল। আমি থাকি সহরের বাইরে। মাইলখানেক হবে। এক গুহায়। যাবেন সেখানে?

বলি, বেশ তো। কিন্তু, আপনার কোনও রকম অসুবিধা হলে, নয়। কাল আমার ঐদিকেই যাবার কথা আছে,—মানাগ্রাম হয়ে বসুধারা যাবার ইচ্ছা।

শুনে বলেন, বাঃ! তাহলে ভালই হয়েছে। ঐ পথেই পড়বে। অবশ্য রাস্তার ওপর নয়। আধ মাইলটাক গিয়ে পথ ছেড়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠতে হয়।

আমি রাজী হই। বলি, তাহলে এক কাজ করুন। কাল সকালে এখানে চলে আসুন। একসঙ্গে যাবো। আপনার গুহা দেখে আমি বসুধারায় যাব। আর আপত্তি না থাকে—চলুন, কাল একসঙ্গে বসুধারাতেও।

তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন, বেশত!—তারপর হঠাৎ কি তাঁর মনে হয়। বলেন, দাঁড়ান—কাল-কাল! কাল, নাঃ, আমার গুহা ছেড়ে বার হবার উপায় নেই। কাল সারাদিন আমার একটা ক্রিয়া আছে। তবে, আপনার গুহায় যাবার কোন বাধা নেই। আপনি সোজা চলে আসবেন—বসুধারা যাবার পথে।

আমি হেসে বলি, যাব যে, পাহাড়ের মধ্যে গুহাটি খুঁজে বার করব কি করে? রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বরটা বলে যান, তাহলে!

ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠেন। বলেন, ঠিক বটে। জানা না থাকলে বার করা কঠিন। গুহাও তো একটি নয়। আশপাশে আরও কয়টা আছে। এ-অঞ্চলে গাছপালাও নেই যে চিহ্ন বলে দেবো!

অতএব, স্থির হয় সেইদিনই তিনি বিকেলে আসবেন। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বিকেলবেলা। জুতা-জামা পরে প্রস্তুত হয়ে আছি। তিনি এলেন। বললাম, আমি তৈরি। এক মিনিট সময় নেবো—ঘরের চাবিটা দিয়ে আসি।

তিনি বলেন, এক মিনিট কেন? পাঁচ মিনিটই নিন না। অতো ঘড়ি ধরে এখানে কাজ হয় না! তালা দিয়ে এসে আপনি রাস্তার সামনে দাঁড়ান, আমিও এখুনি একবার ঘুরে আসছি—ওদিক থেকে।—বলে বাজারের দিকে আঙুল দেখান।

সহর ছাড়িয়ে মানাগ্রামে যাবার সোজা সমতল পথ। ডানদিকে অল্প নীচে অলকানন্দা নদী। বাঁ দিকে ধীরে ধীরে পাহাড় উঠে গেছে বহু উপরে। গাছপালার চিহ্ন নেই। শুধু পাথর। মাঝে মাঝে ঘাসের আচ্ছাদন। এক জায়গায় পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা শুরু হোল। এঁকে-বেঁকে উঠছি। দু'একটা জলের ধারা ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। ছোট ছোট ঝরণা। এক পাথরের ওপর থেকে অন্য পাথরে পা রেখে ধারাগুলি পার হই। এক জায়গায় জলের ধারে কতকগুলি বড় কালো পাথর। কোনটি গোলাকার, কোনটি বা মসৃণ। তারি একটির উপর জটাজুট এক সাধু বসে আছেন। নগ্নদেহ। কৌপীনবাস। সঙ্গী বৈরাগীজি তাঁকে 'নমো নারায়ণ' বলে সম্ভাষণ করেন। তিনি শুধু মৃদু হাসেন। বৈরাগী জানান, স্বামীজি মৌনী। এই ক'মাস হোল এসেছেন। বড় শান্ত মিষ্ট স্বভাব। সারাক্ষণই ধ্যানে আছেন। ঐ গুহাটিতে থাকেন।

আরও একটু উঠে আর একটি গুহা। এখানকার ভাষায় গুম্ফা। পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ছোট গুহা, তার মুখে প্রকাণ্ড বড় কতকগুলি কালো পাথর। নানান্ আকারের। পাথরগুলি এমনভাবে সাজানো আছে যে গুহাটি ওরি মধ্যে আরও প্রশস্ত হয়েছে। প্রবেশ-পথটি সঙ্কীর্ণ। হাত দুই তিন মাত্র উঁচু। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঢুকতে হয়। গুহার বাইরেই

নীলকণ্ঠের
পাদমূলে
বদরীনাথ

তুঙ্গনাথ থেকে
কেদারনাথ ও
চৌখাম্বা শিখর

মাত্তা-মূর্তির মন্দির
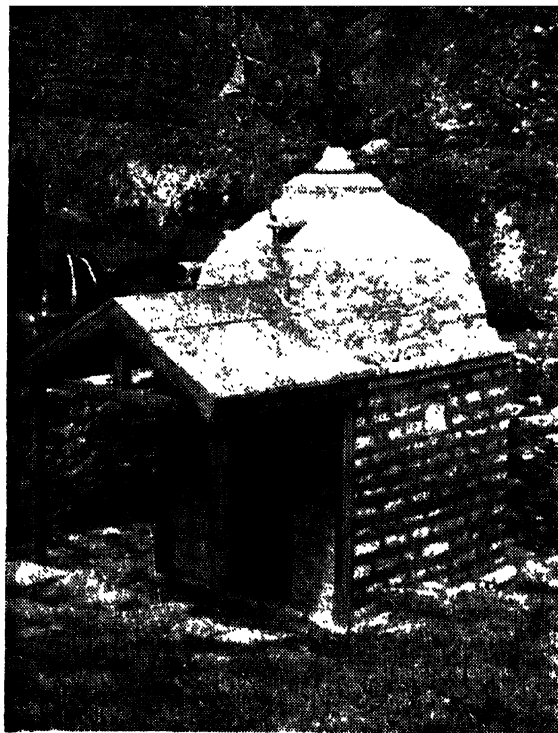
মার্চা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে

বৈরাগীজি

হিমবাহ-সঙ্গম

বসুধারা

পিঠে-করে নদী পার

হিমানী-সম্প্রপাত

হ্রদের তী
শিশিরবাবু
ও কুকুর

পাথর থেকে পাথরে
পা-ফেলে চলা

শতোপন্থ-তাল
(সত্যপদ)

শিশিরবাবু, বিদ্যা
ও সঙ্গী কুকুর
অদূরে স্বর্গারোহণী

গিরিরাজের অঙ্গে
লিলিপুটিয়ানরা

হিমবান্ মহাশৈল
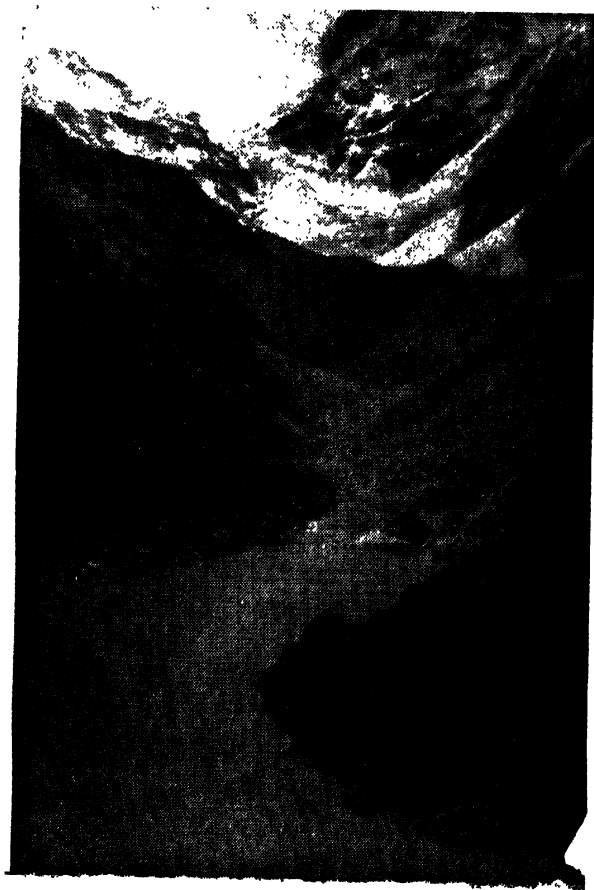
সত্যপদ হ্রদ
দূরে স্বর্গারোহণী
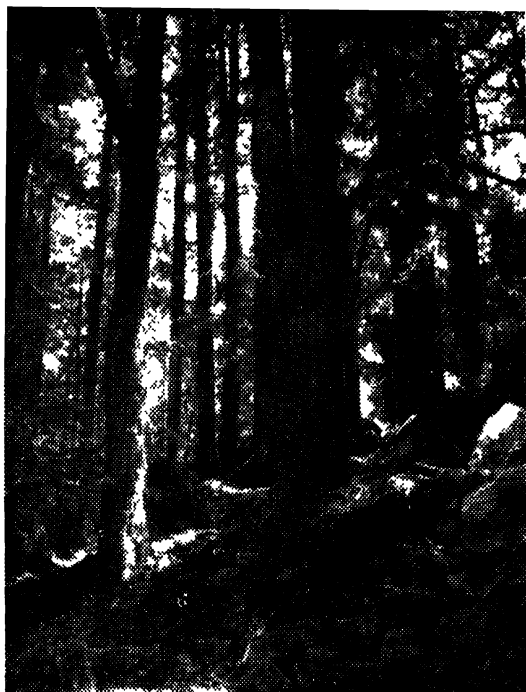
আদিম অরণ্যানী

নৃত্যভঙ্গে
ভুম্বর নদী
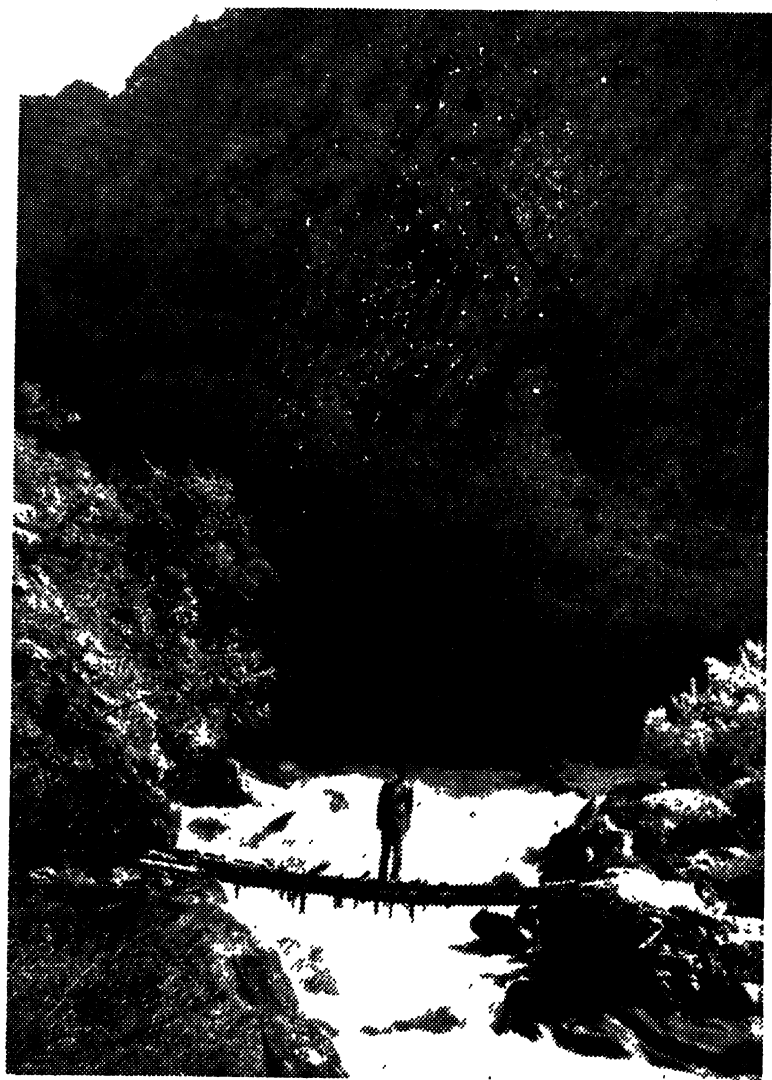
নদীব উপর কাঠ ফেলে পুল

স্বল্প-পরিসর সমতল স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় বহু উঁচু বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। তারই একধারে একটি লম্বা পাথর—যেন বসবার বেঞ্চ। সেইখানে বসে জুতা বাইরে খুলে রেখে সাবধানে গুহায় প্রবেশ করি। বৈরাগীজির জুতা খোলার হাঙ্গামা নেই। খালি পা—পায়ের তলা দেখিয়ে বলেন, আমাদের জুতা পায়ের সঙ্গে সেলাই হয়ে আছে!—তাকিয়ে দেখি, শক্ত মোটা চামড়া, মাঝে মাঝে লম্বা ফাটা—দারুণ গ্রীষ্মে যেমন মাঠের মাটি ফাটে।

আমার আগে তিনি গুহায় প্রবেশ করেন—শরীরটা একটু বেঁকিয়ে—অনায়াসে। তাঁর কাছে, অতি-সাধারণ সহজ পথ। ভেতরে গিয়ে অতিথির প্রতি তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি দেন। প্রবেশ করে উঠে দাঁড়াতে যাই, হাত ধরে সাহায্য করেন, বলেন, দেখবেন—সাবধানে মাথা তুলবেন, সোজা হয়ে দাঁড়াবেন না যেন—ওপরে পাথরে মাথা ঠুকে যাবে।

সত্যিই তাই। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। সামান্য উপরেই ছাদের মত পাথর ঢালুভাবে রয়েছে। মাটিতে বসতে যাই, বলে ওঠেন, বসবেন না এখন, একটু বেঁকে কষ্ট করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন—বসবার আসন দিই।—বলে একটা কম্বল টানতে যান, আমি হাত ধরে ফেলি। তাকিয়ে দেখি, একপাশে মাটিতে শুকনো ঘাস ছড়ানো। বলি, ওর ওপর বসি।

তিনি হেসে বলেন, তাই চান, বসুন, ওই তো আমার আসন—শয্যাও বটে। বসিও তাই। তাঁকেও হাত ধরে পাশে বসাই। বৈরাগী বলেন, শুকনো ঘাস, বেশ গরম হয়। জানেন নিশ্চয়।

গায়ের চাদরটা খুলে একপাশে রেখে দেন। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা—তারি সাহায্যে শুধু একটি লেঙটি পরা। লম্বা রোগা শরীর।

গুহাটির ভেতর দিকে হাত পাঁচেকও লম্বা হবে না। মাথার ওপরের ঢালু পাথর যেদিকে নেমে গেছে—সেদিকে সোজা হয়ে বসাও যায় না। পাশে যে পাথরগুলি দেওয়ালের মত আছে, তার মাঝে মাঝে ফাঁক ছিল—ছোট ছোট পাথর গুঁজে সেগুলি যথাসম্ভব বন্ধ করা হয়েছে। শুধু সামনে দরজার ফাঁকটুকু আছে। ঐ পথে আলো-বাতাসেরও গতিবিধি। মেঝেতে কোথাও পাথর, কোথাও মাটি—তবে বেশী অসমান নয়; পরিষ্কার করে রাখাও। গুহার ভেতর গরম। বৈরাগী বলেন, লোকের ধারণা—এই শীতের দেশে পাথরের গুহার মধ্যে ঠাণ্ডায় কতো কষ্টে আমরা থাকি—কিন্তু দেখছেন

ত গুহার মধ্যে কেমন আরাম। আর এটা যেদিকে মুখ করা, সেদিক থেকে কখনো ঠাণ্ডা বাতাস আসে না। ও-পারের ঐ-পাহাড়ে হলে নীলকণ্ঠের বরফের হাওয়া একবারে শরীর নীল করে দিতো! এখানে রোদ্দুর চান—বাইরে বেরিয়ে রোয়াকে বসুন—ওখানটায় সূর্য ওঠার পর থেকে রোদ আসে, সারাদিন থাকে। মানুষ দেখার কখনো ইচ্ছে হলে তাও দেখতে পাবেন ওখানে বসে—নীচে রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে। কিন্তু, বহু দূরে;—তাদের কোন কলরব এখানে এসে পৌঁছয় না। মন্দিরে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হট্টগোলের মধ্যে থাকার কথা। এবার দেখুন, সে-সব আছে এখানে কিছু? একমনে সাধন-ভজন করি। কি সুন্দর স্থান! এইখানে বসেই বাইরের দৃশ্যটি দেখুন না একবার।

এসে পর্যন্ত তাই দেখছিলামও।

নীচে অলকানন্দার সর্পিল গতি-পথ, ওপারে গগন-স্পর্শী নর-পর্বত; তারি শিখরে স্থানে স্থানে এখনও সামান্য তুষার-রেখা।

চারিদিক শান্ত, শব্দহীন। গুহার মধ্যে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়—যেন দরজার-ফ্রেমে-বাঁধানো আঁকা-ছবি দেখছি!

গুহার মধ্যে কি আছে তাও দেখি। একধারে একটি পাথরের ওপর নারায়ণের ছবি। খান চার পাঁচ বই—গীতা, তুলসীদাসের রামায়ণ, পূজা-পার্বণ ও স্তোত্রের হিন্দী বই। একটা ছোট্ট টর্চ। আলোর ডিবে। একটা ভুটিয়া কম্বলও আছে। বলেন, যখন এসেছিলাম কাছে একটা থালা গেলাসও ছিল—বছর খানেক আগে সে দুটো গেছে—একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখি—নেই!—বলে হাসতে থাকেন।

আশ্চর্য হয়ে বলি, এখান থেকে গেলো কোথায়?—তিনি হাসতেই থাকেন, বলেন, নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক এসেছিল হঠাৎ কোথা থেকে। এ-সব এখানে হয় না—হয়ে গেছে কি ভাবে। ভালই হয়েছে। সাধুদের ও-সব কিছু না রাখাই ভাল। কি বলেন?—বলব আর কি! অবাক হয়ে শুনি।

বৈরাগী বলেন, এবার তাহলে একটু গরম জলের ব্যবস্থা করি?

জিজ্ঞাসা করি, এখন গরম জল কি করবেন?

হেসে বলেন, গরম জল মানে চা। আপনার কাছে সেটা ঠিক চা-খাওয়া হবে না—শুধু গরম-জলই হবে।

বারণ করি। বলি, কোন দরকার নেই, তাছাড়া এখুনি খেয়েও এলাম। শোনেন না। বলেন, দেখুন না, কি রকম টি-সেট, চায়ের সব সাজ-সরঞ্জাম বার হয়!

গুহার এক কোণ থেকে বার হয়, দু'টি টিনের কৌটা। একটাতে খানিকটা চিনি, অপরটাতে একটু চায়ের গুঁড়া। কন্‌ডেন্সড্ মিল্কের ডিবাও একটা বেরোয়। পেতলের একটা ছোট পাতলা ঘটি,—ওপর ও ভেতর দিক মাজা ঝক্‌ঝক্ করছে কিন্তু তলাটা কালিতে ঝুল-কালো হয়ে আছে,—তাতে জল ভরা ছিল। হাতে নিয়ে বলেন, দেখুন তো এতোখানি দরকার হবে? একটু ফেলে দিই?

আমি বলি, কেন এইভাবে জল নষ্ট করছেন?

তিনি বলেন, ঘরের কাছেই দেখলেন ত কেমন ধারা বয়ে চলেছে। জলের অভাব কোথায়? কোনও কিছুরই অভাব নেই এখানে—ত' জল!

গুহার মধ্যিখানে তিনটে পাথর উনানের মত করে রাখা। ঘটিটায় চায়ের গুঁড়ো ফেলে তার ওপর চাপান। কয়টা শুকনো সরু কাঠি ও ডাল দিয়ে আগুন জ্বালান। আগুন ধরতে চায় না। সরু বাঁশের একটা চোঙ্ মত বার করে জোরে ফুঁ দেন। দপ্ করে জ্বলে উঠে, আবার নিবে যায়। ধোঁয়া ওঠে। তখন ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকান। ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে বলেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে বাইরে গিয়ে বসতে বলা উচিত ছিল—এ ধোঁয়ায় আপনি থাকবেন কি করে? আপনি তাই করুন, আবার বেরুতে একটু কষ্ট হবে আর কি!

আমি বলি, আপনাকে ত থাকতেই হবে ভেতরে, তবে আমিও থাকি।—আপনি উনুন ধরান।

জোর করে বসে থাকি বটে, কিন্তু চোখ জ্বলতে থাকে, জল বেরিয়ে আসে। তবুও থাকি। এদিকে ছোট গুহাটি ধোঁয়া জমে ভরতে থাকে দরজা দিয়ে বেরোয় না—অন্য নিকাশেরও পথ নেই। মাথাও ঘুরতে থাকে, মনে হয়, বুঝি দম্ বন্ধ হয়ে এল।

বৈরাগী বুঝতে পারেন। বলেন, এসব অভ্যেস নেই আপনাদের, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন?

অগত্যা বাইরেই এসে বসি। কিছু পরে ভেতর থেকে ডাক পড়ে,—এবার চলে আসুন। জল ফুটছে

আর হামা দিতে হয় না। কোমর বেঁকিয়ে, মাথা খুব হেঁট করে ঢুকি। বৈরাগীজি হেসে বলেন, বাঃ, দু'বার ভেতর বাইরে করেই অভ্যেস হয়ে গেল দেখছি!—এবার কাপ-এর ব্যবস্থা করতে হবে—কি বলেন?

বার হয় দু'টি টিনের লম্বা কৌটা!—দেখিয়ে বলেন, এতে খেতে পারবেন তো? ভীষণ গরম হবে কিন্তু! রুমাল আছে নিশ্চয় পকেটে?—বসুন একটু। বাইরে থেকে এ-দু'টো ভাল করে ধুয়ে আনি।

ফিরে এসে ঘটির মুখে কাপড়ের একটা ছোট টুক্‌রো জড়ান—চা ছাঁকবার জন্যে। ন্যাকড়ার গাঢ় লাল ও কালচে রঙ্‌ দেখে বুঝতে পারি—এই জন্যেই একে রাখা।

টিনের কৌটা দু'টির মধ্যে একটু করে জমা-দুধ ঢালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, চিনি কতখানি খান, বলুন।

আমি বলি, চিনি খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছি—এক চামচেরও কম লাগবে।

মনে মনে ভাবি, মিথ্যা বললাম! না—তাই বা কেন? আজ এখন থেকেই না হয় কমিয়েই দিলাম—মনে থাকবে আজকের এই ছোট্ট ঘটনা!

তিনি বুঝতে পারেন। হেসে বলেন, চিনি আমার রয়েছে এখন। একজন মাঝে মাঝে দেন—তাই পাবার অসুবিধে নেই। না থাকলে পেতেন না। বেশী চিনি না হলে এখানে চা জমে কখনও? এই দেখুন, এতোখানি দিলাম।—বলে তিন চার চামচের মতো ঢালেন।

রুমাল জড়িয়ে চা-ভরা-কৌটা ধরে চা-পান শুরু করি। তিনি ধরেন শুধু-হাতেই। বলেন, ও আমার সহ্য হয়ে গেছে—গরম লাগে না। যেমন ধোঁয়াও চোখে লাগে না।

গায়ের চাদরটা কাছে টেনে নেন্‌। একটা খুঁটে কি বাঁধা ছিল—গেরো খুলে বার করেন। দেখি, আটটি লাড্ডু। আড়চোখে আমার দিকে তাকান। মুখ খুশীতে ভরা। তখনি আবার গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে শান্ত হয়ে মিনিট-খানেক বসেন। ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করেন। তারপর, অতি-যত্নভরে আমার সামনে রেখে বলেন, নিন্‌, প্রসাদ নিন্‌।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, এ-সব হচ্ছে কি? এ-খাবার আনা হয়েছে কেন? তাই বুঝি আমি যখন ঘরে চাবি দিতে গেলাম—বললেন, আসছি ঘুরে একবার? এই জন্যেই বাজারে তখন যাওয়া হয়েছিল? পয়সা পেলেন কোথা থেকে? কাছে কতো টাকা আছে শুনি একবার।

ছেলে মানুষ। অপ্রস্তুত হয়ে যান। বলেন, টাকা পাব কোথা থেকে? এক পয়সা নেই—দরকারও নেই। আজ আপনি আসবেন এখানে, ভাবছিলাম চায়ের সঙ্গে কি দেবো? শুধু চা খাবেন—সেটা মনে কি রকম লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুকাল আগে এক যাত্রী প্রণাম করে একটা টাকা দিয়েছিল। আমি কিছুতেই নেবো না—যতো তাকে বলি টাকার কোন দরকার নেই আমার, আমি পয়সা-কড়ি নিইও না, রাখিও না,—সে কোন মতেই শুনবে না, পায়ের কাছে ফেলে রেখে, হাতজোড় করে তাকিয়ে থাকে, ছল্‌ছল্‌ চোখে চায়। মনে কি রকম লাগলো—টাকাটা তুলে রেখে দিলাম। এতকাল সেটা পাথরের পাশে গোঁজাই পড়ে ছিল—আজ হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়লো—তাই দিয়ে কিনে এনেছি।

আমি রাগের ভাণ করে বলি, খুব অন্যায় করেছেন। আমার জন্যে এই ভাবে খরচ করার কোন মানে হয় না। আর ঘরে অতিথি এলে তাকে চা-খাবার খাইয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে এই হিমালয়ের গুহাতেও? এ সবই যদি করা দরকার মনে হয়—তবে আর এখানে আছেন কেন? আসামে থাকলেই হোত!

তিনি চমকে ওঠেন। বলেন, আসামের কথা আপনি জানলেন কি করে?

আমি হেসে বলি, সারলক্ হোম্‌স্ পড়েছিলেন তো?

তিনি বলেন, বাঃ! পড়েছি বই কি। কোনান্ ডয়েলের একটা গল্প আমাদের ইন্টার-এর পাঠ্যেও ছিল।

আমি বলি, সেই সারলক্ হোম্‌স্-এরই কথা—খুব সহজেই, ওয়াটসন্, খুব সহজে। আসামে আপনার বাড়ি বুঝতে কোন কষ্টই হয় নি—আপনার মুখের চেহারা ও বাংলা কথার টানের ও উচ্চারণের মধ্যে!

তিনি হেসে ওঠেন, ঠিকই ধরেছেন।

ভাবি, কথাটা যখন উঠলই, জিজ্ঞাসা করি না ঘর-বাড়ির কথা। ছেলে-মানুষ—এই ভাবে চলে এলোই বা কেন?

প্রথমটা একটু সঙ্কোচ করেন, তারপর সব বলেন।

বাবা-মা নেই। দাদা আছেন,—সংশোধন করে বলেন, আছেন মানে ছ'বছর আগে ছিলেন। এখনকার খবর জানি না। কেন না, গত ছ'বছর আর খবর রাখি নি। এখানে যে এসেছি ও আছি তাঁদের আর জানাই নি। তাঁরা নিশ্চয় খোঁজ-খবর অনেক করেছিলেন, বার করতে পারেন নি।

গুরুদেব বলেন, এ-সব খবরাখবর রাখলে প্রথম দিকে কাজের বিঘ্ন ঘটায়। তাই, সে-সব সংযোগ আর রাখি নি। কিছু দিন একটু মন চঞ্চল হোত—এখন সেটা কেটে গেছে।

তাঁর জীবনের ছোট্ট ইতিহাস শুনি। ইন্টারমিডিয়েট্ যখন পড়েন, তখন যুদ্ধ বাধে। সেনা-বিভাগে যোগ দেন। বর্মায় অনেকদিন ছিলেন। সেখানে সৈনিক জীবনের নানারকম নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সেই সময়েই তাঁর মনের পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তারপর দেশে ফি: ভারতের কয়েক জায়গায় ঘোরেন। তীর্থগুলিও দেখেন। শেষে সব ছেড়ে এইখানে বসে গেছেন।

বলেন, ভগবানের অশেষ কৃপা। গুরু পেয়ে গেলাম যোশীমঠে। দেখেন নি তাঁকে? এবার দর্শন করে যাবেন ফেরার পথে। আনন্দ পাবেন।—বলে হাত তুলে কপালে ঠেকান।

গুরুদেবের নাম শুনে তখনি বলি, দর্শন আমি তাঁকে করেছি।

উত্তরাখণ্ডে সেই মহাত্মার কথা সকলেই জানেন। একশো বছরের ওপর বয়স, শোনা যায়। সাধুরাও সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেখলেই ভক্তি জাগে।—এর কয়েক বছর পরে ১৯৫৯ সালে যোশীমঠে তিনি দেহরক্ষা করেন।

এই ভাবেই বৈরাগীর সঙ্গে পরিচয় হয়। যে দু'দিন বদরীনাথে থাকি, রোজই দেখা হয়। আমার ঘরেও আসেন। ফেরার সময় আমার সঙ্গে-আনা বাকি চা, দুধের গুঁড়া, চিনি—সব তাঁকে দিয়ে আসি। বলি, এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরব—এ-সব সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?

তিনি নিতে রাজি হন না। জোর করি। হেসে বলেন, আচ্ছা তবে রেখে দিই। যখনি খাবো, আপনার কথা মনে হবে।

বাড়ি পৌছানোর সংবাদ চিঠি লিখে জানাবার জন্যে বার বার বলেন। আশ্চর্য! যে কয়টি সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় সকলেরই এই অনুরোধ!

কলকাতায় ফিরে তাঁদের একজন স্বামীজিকেই পত্র লিখে খবর দিই, তাতে অন্য সকলের—বিশেষতঃ বৈরাগীর উল্লেখ করে লিখি, যেন তাঁদেরও খবরটুকু বলে দেন।

ক'দিন পরেই বৈরাগীর এক চিঠি! অভিমানে ভরা। লিখেছেন, সেদিন তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে আপনার

নিরাপদে পৌঁছানোর খবর শুনলাম। আমাকেও নাকি জানাতে লিখেছেন। খবর শুনে খুশী হলাম। কিন্তু, তিনটি মাত্র পয়সা খরচ করে আমাকে লেখা বুঝি সম্ভব হলো না ?

চিঠি পড়ে ভাবি, একটা পোস্ট-কার্ড লিখলেই হোত! তখনি উত্তর লিখি তিন পয়সা বাঁচানোর কোন প্রশ্নই নেই। তাই, আগেকার বাঁচানো পয়সা খরচ করে এবার খামেই লম্বা চিঠি লিখছি। আলাদা চিঠি লিখি নি কেন না ভেবেছিলাম খবরটুকুই ত দেবার কথা। দিয়েছিলামও। সহর থেকে চিঠি লিখে আপনার সেই সুন্দর শান্ত গুহার আব্‌হাওয়া কেন দূষিত করবো!

তারপর, প্রায় প্রতি বছরেই বদরীনাথ অঞ্চলে কোথাও না কোথাও হু'জনের দেখা হয়। পরিচয়ের গভীরতাও বাড়ে। শতোপন্থেও তাঁর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাই। সে কাহিনী যথাস্থানে হবে।

এক বছর ক'দিন এক সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসছি। বৈরাগী অতি সঙ্কুচিত ভাবে এসে বলেন, দেখুন, একটা কথা বলি। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না, জানি। যদি আপনার কোনরকম অসুবিধে না হয়—আমাকে একটা ঘড়ি দিতে পারেন? একটুও অসুবিধে হলে কিন্তু কোন মতেই নেবো না। হয়েছে কি জানেন। গুহায় একা থাকি। রোজই রাতে একবার ঘুম ভেঙে গেলেই তখনি জপে বসে যাই। ভোর হতেই চলে যাই তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। এখানে আকাশের আলো দেখে সব সময়ে রাত্রের গভীরতা ঠিক ধরা যায় না। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে ভোর হয়ে গেছে ভেবে স্নান করতে চলে গেছি, স্নান সেরে ফিরছি মন্দিরের ঘড়িতে বাজছে শুনি রাত হু'টো!—বলে হাসতে থাকেন।

প্রশ্ন করি, কিন্তু শুধু লেঙটি পরে হাতে রিষ্ট ওয়াচ বেঁধে ঘুরতে পারবেন তো?

তিনি বলেন না, না, রিষ্ট-ওয়াচ নয়, ও পরা চলবে না। পকেট-ঘড়ি এখন মেলে না?

বলি, তাই বা রাখবেন কোথায়? পকেট তো নেই! ট্যাকও নেই। কোমরে তো একটা দড়ি!

বলেন, তা বলেছেন ঠিক। কিন্তু, ঐ দড়ির সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে নেবো।

আমি বলি, তাহলে একটা গল্প শুনুন। বিলিতি গল্প। শেষ পর্যন্ত সে-অবস্থা যেন না হয়, দেখবেন। গল্পটার নাম ছিল—All for a hat—শুধু একটা টুপির জন্যেই সব। এক সাহেবের অবস্থা বেশ ভাল। কিন্তু, তাঁর মতে ধনদৌলতের জাঁকজমক দেখিয়ে মানুষের বাস করা কখনই উচিত নয়। তিনি তাই তাঁর নিজের বাড়ি করলেন—ছোট করে, ঠিক যতটুকু একান্ত প্রয়োজন। কাজ চলার মত ছোট একটা মোটরগাড়ীও কিনলেন। কিছুদিন পরে এক দোকানে বেশ ভাল মাথা-উঁচু একটা হ্যাট—টুপি দেখে তাঁর পরবার ভারী লোভ হল। প্রথমে মনকে সংযত করার চেষ্টা করলেন, শেষে বোঝালেন, শুধু তো একটা টুপি! ওতে আর কি হয়েছে? কিনলেন। তারপর রোজ বাড়ি ঢুকতে দরজাতে টুপি ঠেকে যায়—দরজা অগত্যা ভেঙে বড় করতে হোল। নতুন দরজার আকারের সঙ্গে ঘরের আকার মেলে না। তাই ঘরও ভেঙ্গে বড় হোল। এ-দিকে টুপি-মাথায় ছোট মোটরে উঠতে পারেন না—বড় মোটর কিনতে হোল। তার জন্যে গ্যারেজ-ঘরও ভেঙে বাড়াতে হোল। শেষ পর্যন্ত, তাঁর সেই ছোট্ট বাড়ি দেখতে দেখতে বিরাট অট্টালিকা হয়ে গেল!—শুধু সেই টুপিটুকুরই জন্যে!

বৈরাগী হেসে গড়িয়ে পড়েন, বলেন, না, না—সে-সব ভয় নেই! বেশ গল্পটা কিন্তু।

কলকাতায় ফিরে ঘড়ি কিনে পাঠিয়ে দিই। খুব খুশী হয়ে চিঠি দেন।

বছরখানেক পরের কথা। হঠাৎ এক লম্বা চিঠি,—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। হয়তো, আগে না লিখে আমি অন্যায় করেছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই সে-ঘড়িটা আজই একজন পাহাড়ীকে দিয়ে দিলাম। সে-লোকটি অনেকদিন ধরেই চাইছিল। কিন্তু, তার চাওয়ার জন্যেই যে দেওয়া, তা ঠিক নয়। প্রকৃত কারণ, সাধুদের কোন কিছু রাখা কখনই উচিত নয়—ঘড়িও নয়। তা ছাড়া, এটি সঙ্গে রেখে মনে এক অস্বস্তি জেগেছিল,—ঠিক সময়ে দম্ দেওয়া চাই, কোথায় রাখি, কখন হারায়,—সব সময়েই মনের এই বিকৃতি!—তাই, আজ ঘড়িটি দিয়ে মুক্ত হলাম। স্বকৃত ভুল—সংশোধন করলাম। ক্ষমা করবেন।

চিঠির নীচে দেখি, বৈরাগী-নাম ত্যাগ করে তিনি "ত্যাগী" হয়েছেন!

আমিও খুশী হয়ে জানাই, ঘড়ি তো আপনার। দিয়ে দিয়েছেন—খুব ভাল করেছেন।

তারপরও বৎসরান্তে যখনি দেখা হয়, চোখে পড়ে—যৌবনের সেই স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি, লজ্জিত-বিনম্র-স্বভাব—কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের নির্মম নিষ্পেষণে রুক্ষ শুষ্ক হয়ে এসেছে—যেমন ভোরের ফোটা রঙীন্ ফুল দুপুর-রোদের প্রখরতায় শুষ্ক ম্লান হয়ে আসে।

দেখে মনে মনে বলি, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী!'

কিন্তু, তখনি আবার দৃষ্টি পড়ে, সেই দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর উগ্র-কঠোর রূপের মধ্যেও এক সৌম্য অচঞ্চল জ্যোতির উন্মেষ! রমণীয় নয়, কমনীয় নয়,—দিব্য মঙ্গলময়।

৯

আর এক বছরের কথা। সে বছর একা গিয়েছি। সাধারণতঃ এই সব পথে একজন সঙ্গী থাকা ভাল। বিদেশ বিভুঁই। তায় বিরাট হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। পাহাড়ের বুকে কোন এক সুসভ্য সহরে সুস্থির হয়ে দিন কাটানো নয়। পথে পথে দিন কাটে। নিত্য নতুন স্থানে রাত্রি-বাস। তাই, মনে ভয়-ভাবনার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়—যদি অনিয়ম অত্যাচারে অজানা দেশে হঠাৎ কখন শরীর অসুস্থ হয়! সে ক্ষেত্রে পরিচিতের বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ মনে সাহস আনে। তা ছাড়া, প্রাণ খুলে দু'টা মনের কথাও বলা চলে। এ সবদিক থেকে দৈনন্দিন পথিক জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দের একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কিন্তু, এই সঙ্গী-নির্বাচনে সতর্কতা চাই। বন্ধু হলেও সব সময়ে বা সর্বক্ষেত্রে এই সব পথে যে মনের বা মতের ঠিক মিল থাকে এমন নয়। নিজের নিজের ঘরের মধ্যে বাস করে প্রতি মানুষেরই ব্যক্তিগত কতকগুলি স্বভাব গড়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এই পাহাড় পথে যে ভাবে দিন যাপন করতে হয় তাতে এই সব মজ্জাগত অনেক অভ্যাসেরই ব্যতিক্রম ঘটে। ভেতর ভেতরে অজানিত ভাবে মানুষের ত্যক্ত মন তিক্ত হয়ে ওঠে, অলক্ষ্যে স্বার্থপরতা উঁকি মারে,—তারপর একদিন হঠাৎ সামান্য ঘটনার সূত্র ধরে বন্ধুত্বের বন্ধন খুলে লজ্জা-সরমের মুখোস্ ছিঁড়ে মনের দুর্বল ভাবগুলি কুৎসিত আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তখন, যাত্রার সব আনন্দ ত যায়ই, এইভাবে যাত্রা পণ্ড হয়ে মাঝ-পথ থেকে দল ভেঙে ফিরে যেতেও দেখেছি।

এই বছরেরই একটি ছোট্ট ঘটনা।

রামপুর চটী। ধর্মশালায় উঠেছি। দোতলার এক ঘরে আছি। সন্ধ্যার আগে নীচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির উপর দেখা একজন যাত্রীর সঙ্গে। বাঙালী দেখে দু'জনেই আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করলাম। কলকাতা থেকে তাঁরাও আসছেন। বড় দল। কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও আছেন। একটু পেছিয়ে পড়েছেন। এখনও সবাই এসে পৌঁছন নি, বললেন। আমাদের পাশের ঘরে উঠেছেন।

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করে কম্বল মুড় দিয়ে শুয়ে পড়েছি। সারাদিন হাঁটা, আবার শেষরাত্রে উঠে পথ চলা সুরু হয়। এ-অবস্থায় এক ঘুমেই রাত কাটে। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুই বৃদ্ধের গলা। পাশের ঘর থেকেই আসছে। তুমুল বচসা চলেছে। কখন কি নিয়ে শুরু হয়েছে জানি না। আমার কানে যখন গেল, তখন বিবাদের বিষয় হচ্ছে—একজনের জিনিস আর একজন ব্যবহার করেছেন কেন? কৈফিয়ত গ্রাহ্য হচ্ছে না। অপরজনও ছাড়বার পাত্র নন্—চীৎকার করে বলেন, সেদিন আপনিও তো আমার শিশি থেকে সরষের তেল নিয়ে মেখেছিলেন!

অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়া চলতে থাকে। যাত্রী-ভরা ধর্মশালার ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ আব্‌হাওয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ে—লজ্জায় আমার মন ভরে ওঠে। বেশ বুঝি, এঁদের যাত্রার আনন্দ গেছে, হয়তো অকালে মাঝ পথে যাত্রা সাঙ্গ হবে।

এই সব কারণে সঙ্গে কেউ যেতে চাইলেও আমি সহজে রাজি হই না। নির্ভরযোগ্য কাউকে না পেলে একাই বার হয়ে পড়ি।

একা ঘুরে বেড়ানোর একটা বিশিষ্ট অনুভূতি আছে। সহস্র যাত্রী, তবুও একা। যেন স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা একটি পাতা। স্রোতের টানে চলে, অথচ জলের অংশ নয়। বিচ্ছিন্ন। নিজের মনে চলি। মন অজানা এক আনন্দে ভরপুর। যেখানে ভাল লাগে, থাকি। আবার চলি। আপনা হতেই সংযত বাক্। কথা বলি মনে মনে নিজেরই সঙ্গে। গহন বিজন বনের মধ্যে, অথবা আকাশ-ছোঁয়া মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের জনহীন পথ দিয়ে একা যেতেও কখন একলা-ভাব মনে জাগে নি। চারিদিকের পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে আত্মসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। কখনো

বা মনে হয়, কে যেন এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী সঙ্গে চলেছে। মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলি। সুস্পষ্ট অনুভব করি, হাতে তার হাত ধরে এগিয়ে চলেছি! কে সে,—জানি না, জানার প্রয়াসও করি না, ইচ্ছাও হয় না। শুধু বুঝি, কে যেন চলেছে সব সময়ে আমারই সঙ্গে—পা ফেলি তারই পায়ের তালে তালে! এ এক অতি বিচিত্র অথচ অতি সত্য অনুভূতি!

এ শুধু আমার একারই নয়। বিদেশী তুষার-শিখর-অভিযাত্রীদের কাহিনীতেও এই ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি। তাঁদের কেউ কেউ এই অদৃশ্য অজ্ঞাত সঙ্গীকে নিজের আহার্যের অংশও হাত বাড়িয়ে সাদরে দিতে গেছেন,—কথা বলেছেন,—তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙেছে, মনে পড়েছে—কোথাও কেউ নেই—তিনি একা! অথচ তাঁর সমস্ত সত্তা ও চৈতন্য দিয়ে সেই অপর কার উপস্থিতি কি স্পষ্টভাবেই না অনুভব করেছেন!

বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় এর যুক্তিযুক্ত মনোবিজ্ঞান-সম্মত কৈফিয়ৎ দেবেন, জানি। কিন্তু, তবুও, কেন জানি না, এই অদ্ভুত অনুভূতি মনে এক অভিনব আনন্দ ও অসীম সাহস আনে। একা ঘোরার এও এক দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা।

সেবারও এইরকম একাই গিয়েছি। বদরীনারায়ণে পৌঁছেছি। সেখানে হঠাৎ দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁরও হিমালয়ে ঘোরা স্বভাব। বিশাল দেহ, বিপুল দাড়ি। মুখভরা হাসি। আমাকে দেখেই দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলেন, আরে! তুমিও আবার চলে এসেছ! চমৎকার হয়েছে। চলো, আজ এক সাধুর দর্শন করাতে নিয়ে যাবো তোমাকে।

বন্ধুটি অদ্ভুত মানুষ। তখন প্রায় ষাট বছর বয়স। তাঁর যৌবন-কালের দু'টি কাহিনী শোনাই।

বিয়ে দেবার জন্যে তাঁর মা'র বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু বিবাহ-জীবনে যেতে বন্ধু কোনমতেই রাজি নন্। মাও ছাড়েন না, পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। একদিন তিনি ছেলেকে বলেন, 'দেখ, এবার আর অমত করা চলবে না। গঙ্গার ঘাটে যেতে এক ব্রাহ্মণের একটি মেয়ে দেখে এসেছি। অতি শান্ত, সুশ্রী। কিন্তু, বাপ গরীব—তাই এমন মেয়েরও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তুমি নিশ্চয় একবার দেখে আসবে, দেখলে তোমার

পছন্দ হবেই। যাবে কিন্তু নিশ্চয়,—যাবে বলে আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি।' বন্ধুটি হেসে মাকে বলেন, 'একেবারে কথা দিয়ে এলে, যাবো বলে! ভাল, তোমার কথা রাখবো।'

তারপর, একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে তাঁদের বাড়ী গিয়ে বন্ধু উপস্থিত। পরনে ভিজে কাপড়, খালি গায়ে গামছা জড়ানো। মেয়ের বাবাকে ডেকে পরিচয় দিয়ে বলেন, 'মা বলেছেন, তাই এসেছি। মেয়েকে এখুনি নিয়ে আসুন, সাজাতে হবে না—যেমন আছে তেমনি আনুন।'

ভদ্রলোক আশ্চর্য হন। তবুও—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—মেয়েকে তখনি ডেকে আনেন।

বন্ধু দেখামাত্রই পাত্রীকে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমার নামটি কি? ভারী সুশ্রী মেয়েটি তো—বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এমন সুন্দরী মেয়ে আপনার—এর বিয়ের জন্য ভাবনা? আমি নিজে দাঁড়িয়ে এঁর বিয়ের ব্যবস্থা করবো।'

যেমন কথা, তেমনি কাজও। মাকে এসে সব ঘটনা বলেন। দিন কয়েক-এর মধ্যে একটি ভাল পাত্র সন্ধান করে নিজের খরচায় মেয়েটির বিবাহও দেন।

মা এর পর বিবাহের কথা আর কখনো তোলেন নি।

বন্ধুর গুরুদেবের সন্ধান পাওয়াও অদ্ভুত ঘটনা।

১৯১৫-১৬ সাল। তখন তিনি কলকাতায় কলেজে পড়েন। খিদিরপুরে থাকেন। একদিন বিকালবেলা কলেজ থেকে ফেরার পথে গড়ের মাঠে গেছেন ফুটবল খেলা দেখতে। খেলার শেষে ভাবলেন, পকেটে শুধু একটা আধুলি আছে, ওটা আজ আর ভাঙাবো না—হেঁটেই বাড়ী যাই।

রেস-কোর্স-এর বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কোথাও জন-মানব নেই। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ দেখেন, অপর দিক থেকে হন্‌হন্ করে হেঁটে আসছেন আলখাল্লার মত লম্বা ঝোলা জামা গায়ে একজন সাধু। চোখে তাঁর রঙীন্ চশমা। কাছে আসতেই তিনি দাঁড়ালেন এবং হিন্দীতে বললেন, বদরীনাথ যাবার জন্যে খরচার কিছু পয়সা দিতে পারো?

বন্ধুর পকেটে শুধু সেই একটি মাত্র আধুলি। কিছু না ভেবে আধুলিটি বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনিও নিয়ে চলতে শুরু করলেন। বন্ধুও

এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তার মনে সন্দেহ জাগল, লোকটির হাতে কালো রঙের বড় লম্বা কমণ্ডলু দেখলাম না? সে তো মুসলমান ফকিররা ব্যবহার করে! ইনি তো বললেন, বদরীনাথ যাবেন। তবে কি লোকটি— ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, সাধুটিও কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ও তারি দিকে তাকিয়ে দেখছেন। বন্ধুকে ফিরতে দেখে বলেন, কি সন্দেহ হোল ঝুটা বলে?—বলে হেসে চলে গেলেন।

বন্ধু বাড়ী ফিরে গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে রাখছেন, ঝনাৎ করে আধুলিটি পকেট থেকে মেঝেতে পড়লো!—আশ্চর্য! কোথা থেকে ফিরে এলো!

এই ঘটনার বছর বারো পরের কথা। গুরু লাভের আকাঙ্খায় বন্ধুর মন তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কোথাও মনোমত সন্ধান পান না। হরিদ্বারে সেবার পূর্ণকুম্ভ। সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়ায়—চারিধারে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এক জায়গায় একজন সাধুকে কেন্দ্র করে ভিড় জমেছে। বন্ধু গিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। দেখেন, সৌম্যমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ সাধু। চোখে তাঁর রঙীন্ চশমা। রঙীন্ চশমা! বন্ধু ভাবেন, কোথায় যেন দেখেছি! সাধুজি তাঁকে সস্নেহে কাছে ডাকেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, এতদিন পরে আবার দেখা হলো। তুমি আসবে জানতাম, কেননা এবার সময় হয়েছে—তোমায় দীক্ষা দেবো।—তারপর, একটু হেসে বলেন, কেমন যাদু দেখলে?

এই সেই বন্ধু। পরের উপকার ও সেবা করে দিন কাটান। পূজা অর্চনায়, স্তোত্র-পাঠে প্রচুর উৎসাহ। সুযোগ পেলেই সাধু-সঙ্গ করেন। আমাকে বলেন, চলো, সাধুটির দর্শন করে আসবে। শুনেছি উঁচুদরের। কয়েকবছর আছেন এখানে। অনেকে বলেন, বাঙালী। চলো দেখে আসি।

আমি যেতে রাজি হই না। বলি, তুমি ঘুরে এসো। তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

বন্ধু ছাড়েন না। পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা সঙ্গ রাখি।

তপ্তকুণ্ডের একপাশে যে বাড়ীগুলি, তারই নীচের একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। ঘর তো নয়, খুপ্‌রি। দরজাও তেমনি। মাথা অনেক-খানি হেঁট করে, দেহ সঙ্কুচিত করে কোন রকমে ঢুকতে হয়। ঘরের

বাইরে পাথর-বাঁধানো চাতাল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে তাকাই। দেখি, জনচারেক মেয়ে-পুরুষ ভেতরে বসে আছেন। একপাশে এক উলঙ্গ সাধু। বন্ধুকে বলি, ভেতরে স্থানাভাব, তুমি গিয়ে দর্শন করে এসো, আমি বাইরে এখানে অপেক্ষা করছি। কোন ক্ষতি নেই।

বন্ধু একটু ইতস্তত করে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রণাম করে বসেন।

সাধুটি আমায় দেখতে পান। মৃদু হেসে আমাকেও ডাকেন। হিন্দীতে বলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলে এসো। আর একজনের জায়গাও করে নেওয়া যাবে এখানে।

ভাবি, অযথা বাক্যব্যয় না করে বসাই ভালো। ঢুকে বসিও, কোন রকমে একটু স্থান করে।

সাধুটির চেহারা এবার ভাল করে দেখি।

বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। তাম্রবর্ণ। তপঃক্লিষ্ট দেহ। তবে শীর্ণ নয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মনে হয়, যোগাভ্যাসে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অঙ্গে ভস্মাবরণও নেই। নগ্নকান্তি। যৌবনশ্রী। টানা চোখ। টিকলো নাক। মুখে অল্প দাড়ি। চোখে মুখে প্রশান্ত ভাব। অথচ, বুদ্ধি-দীপ্ত। মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো যেন যুবক পরমহংসদেবের মতো চেহারা। ঘরের ভেতর দেখি, একধারে একটি ছোট্ট বেদী। তার উপর কয়েকটি দেব-দেবীর ছবি—শিব, দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও।

দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে সাধু অবধূত স্মিতমুখে আলাপ করেন। সকলে নানান্ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে অল্প কথায় উত্তর দেন। আমার সঙ্গীটির সঙ্গেও কথা বলেন। বেশীভাগ হিন্দীতে। কখন বা ইংরাজিতে। বিশুদ্ধ ইংরাজি। সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ।

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, তুমি চুপ করে কেন? কোন জিজ্ঞাস্য থাকে প্রশ্ন করতে পারো।

বলি, আপনাদের কথা শুনছি। আমার নিজের কোন প্রশ্ন নেই।

বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে পরিচয়ের প্রয়োজন কিছুই নেই। তবুও।

হাইকোর্টের নাম শুনে অবধূত বলেন, এবার দু'জন নতুন জজ্ হোল না? তাঁদের নাম কি?

শুনে আশ্চর্য হই। সেদিনই সকালে এখানে পৌঁছে কলকাতা থেকে

চিঠি পেয়েছি। বাড়ীর খবর আছে, দেশের বিস্তারিত সংবাদও আছে। তাতেই জেনেছি যে নতুন দু'জন জজ হয়েছেন—তাঁদের নামও উল্লেখ করা ছিল।

বলি, আজই খবরটা পেয়েছি।—নামও উল্লেখ করি। শুনে তাঁদের পূর্ব্ব পরিচয় দেন, বলেন, তিনি তো সার্ভিসে ছিলেন। অপরটি কে?

জিজ্ঞাসা করি, আপনি এ-সব জানলেন কি করে?

উত্তর দেন না। হাসতে থাকেন।

আমি আমার বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিই। বলি, আসানসোলে থাকেন। কয়লাখনির কালো রাজ্যে বাস হলেও চেহারাটি যেমন সুশ্রী, মনটিও তেমনি নির্মল। ভক্ত, সজ্জন।

বন্ধু সলজ্জ ভাবে বলেন, ওর কথা শুনবেন না।

স্বামীজি মৃদু হাসেন। বলেন, কয়লার মধ্যেও রত্ন থাকে। শুধু বিজ্ঞানের কথা নয়। এই চোখ দেখেছে। তখন এই শরীর ছিল বিলেতে। লণ্ডনে এক সাহেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। ন্যায়নিষ্ঠ। ধার্মিক। সৎপথে থেকে দিনযাপন করেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তাঁর হাতের রেখায় ছিল, হঠাৎ ধনলাভ। তাঁকে সেকথা বললে, বিশ্বাস করতেন না, হেসে উড়িয়ে দিতেন। বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহ দিত, ডার্বিতে টিকিট কেনো। হাতের রেখায় রয়েছে যখন পেয়ে যাবে নিশ্চয়।

তিনি বলেন, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। ভাগ্যে যদি থাকেই, দেখা যাক—কিভাবে আসে! আমি আমার নিজের কাজ করে যাবো।

ছোট্ট একটি কয়লার দোকান। বাইরের দিকে থাকেন। পিছন দিকে অন্ধকার ঘরে কয়লার বস্তা জমানো। নিজে ঘুরে ঘুরে পরিচিত মহলে বিক্রী করেন। একদিন হঠাৎ অসময়ে এসে হাজির। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেন, ভীষণ আশ্চর্য ব্যাপার! হাতের রেখা সত্যিই ফলেছে! কয়লার মধ্যে একটা সোনার চাঁই—স্বর্ণপিণ্ডক—নাগেট্!

সত্যিই তাই! আইন মতো সেটা অবশ্য গভর্নমেন্টে জমা দেওয়া হোল, কিন্তু তাঁরও অর্থাগম হয়েছিল।—কয়লার মধ্যেও সত্যি রত্নও পাওয়া যায়।

তাঁদের আলাপ-আলোচনা আবার ভগবদ্‌মুখী হয়। চুপ করে শুনি। তিনি আমাকে আলোচনার মধ্যে টানতে চান। আমি অনিচ্ছুক। আবার বলি, আমার প্রশ্ন কিছু নেই। তাই চুপ করে শুনছি।

হঠাৎ মনে জাগে, বিলেত-ফেরৎ শিক্ষিত পুরুষ, তবুও সর্বস্ব ত্যাগ করে, উলঙ্গ হয়ে এই কঠোর জীবন বরণ করলেন কেন? পেয়েছেনই বা কি? একবার আলাপ করে দেখলে হয়।

তাই, বিনীতভাবে তাঁকে জানাই, যদি সত্যিই আলাপ করার সুযোগ দিতে চান, তবে একলা আপনার সঙ্গে মিলতে চাই। কোন সময়ে আপনার অসুবিধে হবে না, বলুন, তখন আসব। অবশ্য আপনার কোন রকম আপত্তি বা অসুবিধে থাকলে—এ প্রশ্ন ওঠে না, এবং আমিও আসতে চাই না।

তিনি হাসেন। বলেন, বেশ তো, একাই কথা হবে। কোন অসুবিধে নেই। আসতে পারবে—রাত ন'টার পর? তখন চারিদিক সব শান্ত থাকবে। কিন্তু, শীত আছে মনে রেখো।

আমিও একা থাকি। নিকটেই আছি। অতএব, আমারও কোন অসুবিধা নেই, জানাই।

সকলকে নামকীর্তন করতে বলেন। বন্ধু মুক্তকণ্ঠে মধুর সুর ধরেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে···'।

সকলে সমবেত কণ্ঠে যোগ দেন। একজন অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন দেখে অবধূত বলেন, দেবস্থানে দেবতার নামগান মুক্তকণ্ঠে নিতে লজ্জা কিসের? গলা ছাড়ো।

ছোট ঘর নাম গানে ভরে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, সবাই চোখ বুজে। অবধূতের ধীর স্থির নিস্পন্দ মূর্তি। বন্ধুর নিমীলিত নয়ন থেকে ধারা নেমেছে।

রাত ন'টার অনেক আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরী হয়ে আছি। ঠিক সময়মত অবধূতের কাছে যেতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে আর এক সাধুর সঙ্গে আলাপের কথা। হিমালয়ে নয়। মাকে নিয়ে ব্রজ-পরিক্রমায় চলেছি। বৃন্দাবন থেকে যাত্রা শুরু হয়। চুরাশী ক্রোশের পরিক্রমা। প্রায় মাসখানেক লাগে। তিন চার হাজার যাত্রী এক সঙ্গে চলে। কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ বা টাঙায়, অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। দিনের পর দিন এই ভাবে চলা। এক অভিনব আনন্দময় জীবন। চারিদিকে সবারই মুখে শ্রীরাধিকার নাম। রাত্রে চৌকিদারও পাহারা দিতে ঘোরে 'রাধে' 'রাধে' ডাক দিয়ে। নিত্য নতুন জায়গায়

রাত কাটানো। সঙ্গে কারো তাঁবু থাকে, নইলে অনেকে গাছতলাতেই শয্যা পাতেন, পথে বড় গ্রাম পেলে ধর্মশালা বা পাকাঘরেও আশ্রয় মেলে। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী ঘিরে এই তীর্থযাত্রা গড়ে উঠেছে। এই পথেরই এক অঞ্চলে এক বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। তিনিই নিয়ে গেলেন এক বৈষ্ণব মহাত্মার দর্শন করাতে। শ্যামকুণ্ডের এক নিভৃত অন্তরালে পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট কুটি। সঙ্গী বাবাজীর অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সুমুখে দাঁড়িয়ে। পরনে সামান্য এক টুকরা কাপড়। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। রুক্ষ, শুষ্ক মূর্তি। কিন্তু, সুমিষ্ট হাসি। টানা চোখ দু'টি ভরে প্রেমের অশ্রু টল্‌মল্‌ করছে। তাঁর চোখের দিকে চাইতেই হঠাৎ মনে এলো—কুমারিকায় যে ঘরটিতে থাকতাম তারি একটি ছোট্ট জানলা দিয়ে ভারত-মহাসাগরের সুনীল বারিরাশির দৃশ্য দেখা যেতো। এঁর চোখের পাতাদু'টির মধ্যে দিয়েও মনে হয় এক শান্ত গভীর প্রেম-সাগরের যেন সন্ধান দেয়। নত হয়ে পায়ের ধূলা নিই। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেন। মৌনী। একটা শ্লেট্‌ পেন্‌সিল্‌ নিয়ে প্রয়োজন মত লিখে প্রশ্ন করেন, উত্তর দেন। এই ভাবেই আলাপ হয়। বিদায় নেবার আগে শ্লেটে লিখে এগিয়ে দেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও।

প্রশ্ন করি, তাতে প্রয়োজন কি?—তিনি মধুর হাসতে থাকেন। আমি লিখে দিই।

এর কয়েক বছর পরের কথা। হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। 'প্রীত্যাস্পদ' বলে সম্বোধন করেছেন। লিখে জানিয়েছেন,—'বন-যাত্রার সময় শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গ রঙ্গে শ্যামকুণ্ডতীরে নিকুঞ্জ কুটীরে দীনজনকে দর্শন করে গিয়েছ। তোমার ঠিকানাটি লিখে রেখেছিলাম এই কারণে, ভবিষ্যতে যদ্যপি বিশেষ কোন সেবার দ্রব্যের এ স্থানে অভাব প্রয়োজন ঘটে তা হলে পত্রদ্বারা জানাব। উপস্থিতক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুখার্থে একটী সেবার দ্রব্যের প্রয়োজন বিধায় তোমাকে পত্র দিতে বাধ্য হলাম। যদ্যপি সেবা করতে পার তো পরমানন্দ লাভ করব। সেবাটী এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করকমলের একটী উৎকৃষ্ট ১নং বংশী। বংশেরই হোক কিংবা কাষ্ঠনির্মিতই হোক—মোটা সাইজের গম্ভীর সুমিষ্ট স্বরযুক্ত ও ধ্বনি সুদূরবর্ত্তী চলে।'—চিঠিতে তারপর বাঁশীটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া, কি ভাবে পাঠাতে হবে তারও নির্দেশ

লেখা। শেষে লিখেছেন, 'সময় সময় রসময়ের বংশীগান করতে প্রাণে বড়ই সাধ হয়, কিন্তু উত্তম স্বরযুক্ত বংশী এস্থানে মেলা দুর্ঘট, তন্নিমিত্তই তোমাকে শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় প্রীতি সম্বন্ধে জানালাম।'

চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেইদিনই কলকাতার এক প্রসিদ্ধ বাজনার দোকানে গিয়ে চিঠির বর্ণনামত বাঁশীর সন্ধান করলাম, পাঠাবারও আয়োজন করে এলাম। কিন্তু, তারপরই তাঁর আর এক চিঠি এল। তাতে জানিয়েছেন, বাঁশীটি ক্ল্যারিওনেট্ হলেই ভালো।

দোকানদারের কাছে আবার তখনি যাই। তাঁরা হেসে বলেন, ক্ল্যারিওনেট্ কি যে সে লোক বাজাতে পারে,—ওর রীতিমত শিক্ষা থাকা দরকার, স্বর বার করাও শক্ত।

বলি, এক কাজ করুন। একটা ক্ল্যারিওনেট্ই পাঠান, সেই সঙ্গে একটা ভাল বাঁশের বাঁশীও দিন।

সেই মত পাঠানোও হয়। চিঠিতে দোকানদারের কথাগুলি উল্লেখ করে লিখি, ক্ল্যারিওনেট্‌টি যদি বাজাতে না পারেন আপনার বংশীধারীর কাছেই শিখে নিয়ে তাঁকে শোনাবেন।

বাঁশীগুলি পেয়ে উল্লাস ভরে তিনি আনন্দ জানান। চিঠির মধ্যেও যেন তাঁর বাঁশীর সুর ভেসে আসে! চিঠিতে তাঁর আশ্রমের নামটিও বড় মধুর ছিল—'ঘন মাধবের ঘেরা'।

সেই একদিনের অল্প পরিচয়। তবুও গভীর প্রেমে ভরা মনের নিকষে স্বর্ণরেখা রেখে গেছে, স্মৃতির আলোকে কারণে অকারণে ঝিক্‌মিক্ করে।

১০

রাত ন'টা বাজে। টর্চ হাতে বার হই। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কোটের উপরই গরম চাদর জড়াই, মাথা কান চাপা দিই। নিঝুম বদরীপুরী। জনহীন পথ। গতিহীন, শব্দহীন। শুধু অলকানন্দার নৃত্যকলরোল। অনন্ত কল্লোল।

অবধূতের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। দরজার মধ্য দিয়ে একফালি আলো বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে থেকে দেখি, অবধূত একপাশে বসে

আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে দু'টি যুবক। বেশভূষায় বাঙালী বুঝতে পারি। একজনের হাতে রুটি। অবধূতকে খাইয়ে দিচ্ছে। তিনি চুপ করে বসে আহার করছেন। খাওয়া শেষ হোলো। অপর ছেলেটির হাতে ঘটি। দেখি, জল খাইয়ে দিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখও মুছিয়ে দিল। অতি যত্ন-ভরে খাওয়ানো, মোছানো। যেন, মায়ের হাতে ছোট ছেলে খাচ্ছে। তারপর, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ছেলে দু'টি বার হয়ে গেল। এখন তিনি একা। হেঁট হয়ে দরজা দিয়ে আমি প্রবেশ করি। ঘরের চারিধারে এক-ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। একপাশে ছোট লম্বা একটা বেদীর মত। পাথরের। ওপরে কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। একজন মানুষ কোনরকমে শুতে পারে। তারই উপর তিনি পা মুড়ে বসে আছেন। একপাশে কাগজপত্রের বাণ্ডিল। লেখাপড়ার সরঞ্জাম। দু'তিনখানা বইও আছে মনে হোল। ঘরের মাঝখানে ছোট অগ্নিকুণ্ড। একটা বড় কাঠ—আধপোড়া পড়ে আছে। আগুন নেই। আর একদিকে সেই দেব-দেবীর ছবিগুলি।

আমাকে দেখে অবধূত মৃদু হাসেন। কাছে ডাকেন। বেদীর উপর তাঁর পাশে বসতে বলেন। বসিও তাই।

হিমালয়ের নিঃশব্দ নিভৃত রাত্রি। ক্ষুদ্র প্রদীপের স্তিমিত আলোক। পাশেই এক নগ্ন সন্ন্যাসী। মনে অস্বাভাবিক ভাব আসাই স্বাভাবিক। তবুও, সাধারণ ভাবেই সব কিছু নেবার চেষ্টা করি। সহজভাবে তাঁকে বাংলায় সম্বোধন করি। বলি, দেখুন, প্রথমেই দু'টো কথা আপনাকে বলে রাখি। আমি বাংলাতে কথা বলবো। হিন্দী আমার আসে না, যেটুকু বলার চেষ্টা করি—বাধ্য হয়েই বলতে হয়, ভুলও হয় প্রচুর। ইংরাজিতে তার চেয়ে কথা বলা সহজ, কিন্তু ইংরাজি বলার দরকার দেখি না। অবশ্য, আমাদের বাংলায় কথা বলা মানে—ইংরাজি বাংলা মেশানো। নিজের ভাষায় কথা বললে কথা বলাটা সহজ হবে। আপনি অবশ্য যাতে ভালো মনে করেন তাতেই বলবেন।—বলে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি হিন্দীতে বলেন, বেশ তো, বাংলাতেই বলো। তাতে বোঝার কোন অসুবিধে হবে না।

বিজ্ঞের মত বলি, তা আমি জানি।

তখনও সেই বন্ধুর দেওয়া খবর অনুযায়ী আমার ধারণা, তিনি বাঙালী। কিন্তু, তিনি সেদিন অথবা তার পরে কখনও বাংলায় কথা বলেন নি। হিন্দী

বা ইংরাজিতে বলতেন। আমি বাংলাতেই অনেক সময় বলতাম—তিনি পরিষ্কার বুঝতেন দেখতাম। পরে শুনেছিলাম, তিনি সম্ভবতঃ বাঙালী নন, দক্ষিণ দেশীয়।

অবধূত বলেন, দ্বিতীয় কথাটি কি ?

উত্তর দিই, আপনার সঙ্গে যথোচিত আচার-ব্যবহারের কথা। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, সুযোগ পেলেও, বেশী মিশি না। ভাবি তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে আছেন, বিরক্ত করার দরকার কি ? ওঁ'দের সঙ্গে ঠিক কিভাবে আচরণ করা উচিত, কেমনভাবে কথা বলার রীতি—আমার জানা নেই। আপনার সঙ্গে তাই অতি সহজ সাধারণভাবে কথা বলব, কোন কিছু বাধা বা সঙ্কোচ না রেখে। নিশ্চয় জানবেন, তার মধ্যে এতোটুকু অশ্রদ্ধা বা অসম্মানের উদ্দেশ্য নেই। এ-ভাবে আলাপ করায় যদি আপনার আপত্তি থাকে বা অসঙ্গত মনে হয়, তবে মৌখিক পরিচয় করেই চলে যাবো—তাতেও নিশ্চয় জানবেন আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

দেখি, তিনি হাসছেন। নির্মল হাসি। আমার ডান হাতটা ধরে কর-রেখাগুলি দেখেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। আমার মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলার কথা। প্রশ্নোত্তর করে শিক্ষকের হাতে দিলে তিনি খাতার উপর চোখ বুলিয়ে এমনি ভাবেই তাকাতেন; মনে হোত—বিদ্যের দৌড় ধরে ফেলেছেন !

অবধূত বলেন, ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করবে, নিঃসঙ্কোচে কথা বলবে। কোন বাধা নেই। অনেক ঘুরেছ, নয় ? এখনও ঘোরা আছে।

বলি, হাতের রেখায় লেখা আছে দেখলেন ?

তিনি বলেন, প্রশ্ন থাকে করতে পার।

আমি বলি, ও-তে আমার কৌতূহল নেই। নিজের জীবনের অতীত ঘটনা জানা আছে, ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ নেই। যা ঘটবার ঘটবে, নিজে সব কিছুর সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারলেই হোল। গণনায় ভুল হলে মিথ্যা আশা বা আশঙ্কায় মনকে অযথা উদ্বিগ্ন করার সার্থকতা দেখি না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করি, আপনার হাত দু'টি তো দেখছি, বেশ কর্মক্ষম আছে,—তবে ঐ ছেলে দু'টি এসে খাইয়ে দিয়ে গেল কেন ? আপনি নির্জীব হয়ে বসে ছিলেন দেখলাম !

তিনি বলেন, ওঃ ! এই কথা ! ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। ভগবানই

এ-শরীরের জন্যে আহার জুটিয়ে দেন। তিনি দিলে ও খায়, না দিলে পায় না। বলতে পার—অজগর-বৃত্তি।

অতি-সহজ কণ্ঠে কথাগুলি বলেন।

মনে পড়ে, মহাভারতে শান্তিপর্বের কথা। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে ইচ্ছা-মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির আদি উপস্থিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম সম্বন্ধে নানান্ প্রশ্ন করছেন। পিতামহ উপদেশ দিচ্ছেন, বহু উপাখ্যান শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে মোক্ষধর্ম পর্ব অধ্যায়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন অজগর-ব্রতের কাহিনী। ব্রতচারী এক ব্রাহ্মণ। নির্লোভ, শুদ্ধস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, মেধাবী, প্রাজ্ঞ। তবুও, শিশুর মত দিন যাপন করেন। লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না। ধর্ম, অর্থ, কামে সম্পূর্ণ উদাসীন। বলেন, যদি লোকে দেয়, তবে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি। অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইমত যদৃচ্ছাগত বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকি। শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই। দৈহিক সুখ অনিত্য। এই উপলব্ধি করে পবিত্রভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে অজগর ব্রত পালন করছি।

ভাবি, শুনতে ত ভালই লাগে। কিন্তু এভাবে থাকা কি সম্ভব? প্রশ্ন করি। অবধূতের উত্তরে যা জানি তা এই :

নিজের আহার্যের জন্যে তিনি নিজে কোন প্রয়াস করেন না। কয়েক বছর এমনই চলছে। কেউ খাবার নিয়ে এসে বা তৈরী করে খাইয়ে দিয়ে গেলে খান, নয়ত অভুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি দল এখানে গড়ে উঠেছে। স্থানীয় কয়েকজন তাতে আছেন, কয়েকটি সাধুও আছেন! এ-ব্যাপারটি আমি নিজে পরে লক্ষ্য করি। কেন না, এই বিপক্ষ-দলের দু'একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের কারো কারো মতে অবধূতের এই নগ্ন বেশে সহরের মধ্যে, মন্দিরের এত কাছে বাস করা শোভন নয়। তাঁরা বলেন, 'বাইরে গুম্ফায় থাকলেই ত পারেন,—যদি তিনি উলঙ্গই থাকতে চান!' অবধূত কিন্তু মন্দিরের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে অসম্মত,—যদিও তিনি কিছুকাল থেকে মন্দিরের ভেতরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অঙ্গে কোন আবরণ দেওয়ার প্রশ্ন তাঁর কাছে ওঠে না,—কেন না, তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের সংস্কারে বাধে। অবধূত বা পরমহংস যিনি, তিনি সমদর্শী। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। তাই বিধি-সংযমের অতীত অবস্থায় চলে যান।—তবুও, ইনি সাধারণতঃ পা দু'টি মুড়ে যে-আসন করে বসে থাকতেন তাতে দর্শকের লজ্জা

পাবার বা আপত্তি করার কোন কারণ থাকত না। অথচ, এই নিয়ে বিপক্ষ-দল তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, সাধু-সন্দর্শন-প্রার্থী যাত্রীদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে। ফলে, যদিও এক সময়ে অবধূতের দর্শন পেতে বহু যাত্রী যেতেন—এখন তাঁরা কমই যান। কখনো কোন যাত্রী না এলে তাঁর শরীরও অভুক্ত থাকে।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এমন ভাবে পাঁচ-সাত দিনও যায় তো?

তিনি হেসে বলেন, পাঁচ-সাত দিন কেন? দু'তিন সপ্তাহও কখন চলে গেছে। এই তো এইবার প্রায় সপ্তাহ দুই পরে ওই ছেলে দু'টি হঠাৎ একদিন এলো। তার পরদিনই এদের দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি। সপ্তাহ খানেকের ওপর হোল থেকে গেছে। এই বাড়িরই ওপরে একটা ঘরে থাকে। রোজ আসে। এই শরীরকে ভোজন দিয়ে চলে যায়। এরা যখন থাকবে না, আর অন্য কেউ যদি না আসে এ-শরীরও আহার পাবে না। তাতে ক্ষতি নেই। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।—বলে ঊর্দ্ধপানে তাকান। নির্বিকার ভাবে কথাগুলি বলা। কারো উপর কোন আক্রোশ নেই, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই। শরীরের এতো বড়ো প্রয়োজনটাও যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়ে গেছে! অথচ, দুই মুঠা উদরান্নের জন্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীময় কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! সভ্যতার প্রগতির যুগেও—বিজ্ঞানের এত প্রসারেও—এ-সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। ভাবি, ক্ষুধা কি এমন ভাবে জয় করা যায়?—প্রশ্নও করি।

উত্তরে অবধূত শারীরতত্ত্বের নানারূপ কথা বলেন। শরীর ধারণের পক্ষে খাদ্যের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদের কি মত, তাও জানান। বলেন, বিজ্ঞানে বলে, মানুষ কোন খাদ্য না খেয়েও দু'মাসেরও বেশী বেঁচে থাকতে পারে। শরীর-রক্ষার দিক থেকে খাদ্যের চেয়েও দেহের প্রয়োজন হল জল। জল না পেলে মানুষের এক সপ্তাহ বা দশদিনের বেশী প্রাণ থাকে না। অথচ, জলের অভাবে তখনও সে তৃষ্ণায় মরে না—যদিও কথায় বলে 'তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা যাচ্ছি',—তখন মৃত্যু ঘটে নিরুদনে—dehydration-এ। এ-তো বিজ্ঞানের কথা। তার উপরও যোগাভ্যাসের ব্যাপার আছে। যোগ-সাধনায় মানুষের অনেক সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে, নতুন শক্তিও সে লাভ করে। শরীর বা জীবন-ধারণের জন্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে যে-সব বস্তু একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়—কিংবা মানুষের মধ্যে যে-সকল

আদিম বৃত্তিও থাকে—যোগ-বলে সেগুলি শুধু দমন করাই সম্ভব, তা নয়, সেই সব শক্তি ভগবদ্‌মুখী করে আত্মসিদ্ধির পথে প্রয়োগ করতে হয়—তার প্রভূত ফলও পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে সুপ্ত ঐশী শক্তি জাগ্রত করে নিতে পারলেই সব কিছু সম্ভবপর হয়। সাধারণ মানুষ তখন তার সামান্য বহিঃ-প্রকাশ দেখতে পেলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে—এ-সব অস্বাভাবিক কিছু। সে বোঝে না যে ভগবদ্-দত্ত প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে সে-ই বরং অস্বাভাবিক হয়ে গেছে—তাই যা তার অন্তর্নিহিত অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ভেবে বিস্মিত হচ্ছে।

এইভাবে অবধূত বলে যান। চুপ করে শুনি। কিছু বুঝি, অনেক কিছুই বুঝি না। কিন্তু বেশ বুঝি, তাঁর জীবনে এ-শুধু তত্ত্ব-কথাই নয়।

এই দীর্ঘ-অভুক্ত থাকার সম্বন্ধে এর অনেকদিন পরে সংবাদ-পত্রে একটি খবর পড়ি।

সে এক মর্মান্তিক আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ। দারুণ বর্ষার সময়। আসানসোল অঞ্চলে এক কয়লার খনিতে হঠাৎ প্রবল-বন্যার এক বিপুল ধারা প্রবেশ করে। প্রায় জন চল্লিশ কর্মীর খনির গহ্বরে সলিল-সমাধি ঘটে। মাটি থেকে প্রায় ৪৫০ ফিট নীচে। এতগুলি প্রাণ হানির আশঙ্কা চারিদিকে গভীর শোকের ছায়া ফেলে। জলনিকাশের ব্যবস্থা চলে।—দিনের পর দিন জল তোলা হয়। কুড়ি দিন পরে এগারোটি জীবন্ত মানুষ সেই খনির গহ্বর থেকে উদ্ধার পেলো। মৃত্যুর দুয়ারে আঘাত করে প্রাণবন্ত মানুষ অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন উপবাসী। বুভুক্ষু। তবুও, সজীব! প্রশ্ন ওঠে, কুড়ি দিন শুধু জল খেয়ে ছিল কি করে? সন্ন্যাসী নয়—যোগী নয়—তবু অনায়াসে মানুষ এতদিন বাঁচে কি করে? শুধু তাই নয়। প্রায় দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাটিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কুড়ি দিন কোথায়? মাত্র চার-পাঁচ দিন তো আমরা আটক ছিলাম!

মানুষের অন্তর্নিহিত অপরিমিত শক্তির পরিচয় দেয়। অজানা তার সীমা।

অবধূতের সঙ্গে আলাপ করি। নানান্ বিষয়ে কথা ওঠে। আলাপনের মধ্যে তাঁর পূর্বাশ্রমের কিছু আভাস পাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। ডিগ্রী ছিল। বিলাতেও শিক্ষা-

প্রাপ্ত। আইন সম্পর্কে জ্ঞান আছে। সমাজে বিধি নিয়মের প্রয়োজনীয়তা, আইনের কল্যাণকর রূপের বর্ণনা দেন। সে বিষয়ে আলোচনা বেশী অগ্রসর হতে দিই না। বলি, ও-সম্বন্ধে শুধু বইয়ের পড়া বিদ্যা নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তারই ভিত্তিতে নিজের মতামতও গড়ে উঠেছে। আইন-আদালত নিয়ে দিন কাটে। ওর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা গভীর কোন কিছু তত্ত্ব নেই। স্থূল জগতে বা সমাজে শুধু ওর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই আছে। তাই, হিমালয়ে এসে ও-বিষয়ে আলোচনা অচল।—মন্তব্য শুনে তিনি হাসেন।

বিজ্ঞান-বিষয়েও তিনি জানেন দেখি। সে-জগতেও কোথায় কি নতুন আবিষ্কার হয়েছে, কোন দেশে কোন বৈজ্ঞানিক এখন কি নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন,—এ-সবের শুধু খবরই রাখেন না, বিশদভাবে বোঝেন ও আলোচনা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু আবার এ-কথাও বলেন, বিজ্ঞানের সহায্যে মানুষের জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তার লাভ করেছে ঠিকই, তবুও স্থূল জগতের জ্ঞানের বাইরে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকের বহু তত্ত্ব ও তথ্য শেখবার আছে। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তিশালী হলেও তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না, সত্যকার সাধকদের যোগশক্তি অবলীলায় সেখানে পৌঁছুতে পারে।

সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধেও কথা বলেন। নতুন ভাল বই কোথায় কি প্রকাশিত হোল তারও খবর কিছু জানেন, দেখি। বলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা—এ সবই তো সত্য-সুন্দরের সাধনা। ভগবদ্-আরাধনার আর এক রূপ।

পাশ্চাত্য ভাষা, শুধু ইংরাজি নয়, অন্য কয়েকটিও জানা আছে, তার প্রমাণ পাই।

কলকাতায় অনেকদিন ছিলেন। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচিত। বলেন, বিরাট পুরুষ ছিলেন। দেশের কতো বড় কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি, আজকালকার লোক তার বিশেষ খবর রাখে না। এ-শরীর তাঁকে দেখে নি, তখন ছোট ছিল। তোমার দাদার খবর এ রাখে।

আরও অনেকের নাম করেন। তাঁদের কয়েকজনকে চিনি। দু'এক-জনের নাম করে বলেন, এঁরা এ-শরীরের পূর্ব-পরিচয় জানেন। এখনও মাঝে মাঝে খবর করেন।

ভাবি, বাড়ি ফিরে তাঁদের কাছ থেকে এঁর সঠিক পরিচয় নেবো। নেবার সুযোগও পাই। তবুও নেওয়া হয় না। মনে হয়, নিরর্থক এই কৌতূহল। যে মানুষ সব কিছু মুছে ফেলে একান্তে নির্জন-বাস করছেন, যাঁর পূর্বাশ্রমের জীবন এখন বিস্মৃত অতীত মাত্র, কি প্রয়োজন আছে সেই বিগতকালের কুক্ষিগত শবদেহখানি তুলে ব্যবচ্ছেদ করার ?

এখন নৈর্ব্যক্তিক তাঁর দেহ। তাই দেখি, প্রকৃত সাধুরা নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করতে কখনও 'আমি' বলেন না। 'এই শরীর' বলেই উল্লেখ করেন। দেহস্থ 'আমি' পরমাত্মায় লীন হয়েছে, পূর্বের 'আমি' এখন পঞ্চভূতময় শরীরমাত্র।

তাই, যখন রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন এবং স্বাধীনতার পর দেশের কর্তৃপক্ষের কার্য-বিধি সম্বন্ধেও সংবাদ রাখেন দেখি, তখন আশ্চর্য বোধ করি। ভাবি, ঈশ্বরেই যদি এখন স্থিতি এবং নশ্বর যদি জগৎ, তবে সে-জগতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন কি ?

তাই, জিজ্ঞাসা করি, এতো খবর রাখেন কি করে এবং কেনই বা ?

হেসে বলেন, সব কিছু এখানে বসেই পাওয়া যায়। যা অতীত সে তো জানা থাকে, যা ঘটছে তাও চোখের ওপর ভাসে, ভবিষ্যতের ছবিও ফুটে ওঠে। তা ছাড়া, চিঠিপত্রও আসে খবরাখবর নিয়ে। দেশ-বিদেশ থেকে উপদেশ চায়। এই তো এই সপ্তাহেই চিঠি এসেছে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে। দিল্লী থেকেও দেশ-নেতাদের মাঝে মাঝে চিঠি আসে।

চিঠিগুলি দেখাতে যান। আমার ভাল লাগে না। বলি, চিঠি দেখার কৌতূহল আমার নেই। কিন্তু আশ্চর্য লাগে আপনার কথাগুলি শুনে! এ-তো জায়গা থেকে এ-তো চিঠি! এতে আপনার শান্ত নিভৃত-বাসে বিঘ্ন ঘটানোর কথা, সন্ন্যাস-জীবনের এগুলি অন্তরায় বলেই তো আমাদের মনে হয়।

তারপরে, হেসে বলি, এক কাজ করুন—এখানে না থেকে কলকাতা বা দিল্লীতে সেন্টার খুলুন। লোকজনের অনেক সুবিধে হবে। আর সেখানে যদি মন্তর দিতে শুরু করেন তো দেখবেন শিষ্য-ভক্তের অভাব হবে না—বড় বড় মোটর হাঁকিয়ে সব আসতে আরম্ভ করবেন।

তিনি হেসে ফেলেন। প্রাণ খোলা হাসি।

বলেন, সন্ন্যাস-জীবনের এটা একটা বিঘ্ন বই কি, তবে সেটা খুব বড় কিছু নয়। আর, লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ? যদি সন্ন্যাস-জীবনে কোন শক্তি বা জ্ঞানের সঞ্চয় হয়েই থাকে, জগতের হিত-কাজে সেটা লাগানো—সে তো কর্তব্য, তাঁরই কাজ। এতে ধর্ম-জীবনের ব্যাঘাত হবার কোন আশঙ্কা নেই। তবে, এ-কথাও ঠিক—লোক প্রতিষ্ঠার মোহ সাধুদের জীবনেও একটা বড় অন্তরায়। অনেকেরই এতে পতন হয়। একে বলে রুদ্রগ্রন্থি,—লোকৈষণা—এ ছেদ করা খুবই কঠিন।

নির্বাক হয়ে শুনি। জ্ঞানের দম্ভ নয়, শক্তির প্রচার নয়। নিজের সুস্পষ্ট অভিমত স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত করা। বলেন, কত লোক কত কি চাইতে আসে। ভাবে, বুঝি এখানে বসেই সব কিছু পাওয়া যায়, দেওয়া যায়। নিজের ভেতরের শক্তির সন্ধান রাখে না। ধর্ম-কথা,—তার শেষ নেই। পুরানো চিরকালের কথা—শাশ্বত সত্য—সব ধর্মেরই যে-সব মূল তত্ত্ব—আবার নতুন করে বার বার বলা—তাই শোনে। বিদেশী অভিযাত্রীদলেরও অনেকে আসেন এই শরীরের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁদের মধ্যেও দু-একজন আধ্যাত্মিক জগতের অনুসন্ধিৎসু থাকেন। হিমালয়ের হিমশিখরে উঠে তাঁরাও বিচিত্র অনুভূতির কিছু অভিজ্ঞতা পেয়ে যান। কিন্তু, তাঁরা সন্ধান জানেন না, এইসব অভিযান যোগবলের সাহায্যে কতো সহজ হতে পারে। সাজ-সজ্জার বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, বহু অর্থ ব্যয়েরও প্রশ্ন ওঠে না।

এই সম্পর্কে যোগবলের অনন্ত মহিমার অনেক কথাই শুনি। বলেন, সাধারণ মানুষের ধারণা, যৌগিক ক্রিয়ায় শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ঠিক ভাবে যোগ অভ্যাস করলে দেহের ও মনের সমূহ শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। যোগী মানুষ অতি সহজে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে প্রয়োজনমত মানিয়ে নিতে পারে। এমন সব আসন আছে যার সাহায্য নিলে বরফের ওপর অত শীতেও হাত পা শরীর কখনো আড়ষ্ট হয় না। প্রাণায়ামে শরীরের উত্তাপও ঠিক থাকে। এসব যে-সাধুরা জানেন তাঁদের কাছে শীতের রাজ্যেও আগুনের অভাব বোধ হয় না, শরীর গরম করবার জন্যে উত্তেজক পানীয় বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে অবধূত কত রকম আসনের নাম ও গুণাবলির উল্লেখ করেন।

হঠাৎ বাইরে মানুষের পায়ের শব্দ শুনি। দরজার কাছে একজন পাহাড়ী এসে দাঁড়ায়। অবধূত তাকে ভেতরে ডাকেন। প্রণাম করে সে বসে। বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখ। কথার মধ্যে বুঝতে পারি, কার অসুখের ওষুধ নিতে এসেছে। অবধূত পাশ থেকে একটি কৌটা বার করেন, দু'টা সাদা পিল বার করে দেন। সে ভক্তি-ভরে অঞ্জলি পেতে নেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। দেখি, এরি মধ্যে তার মুখ থেকে উৎকণ্ঠার ছায়া সরে গেছে, বুক-ভরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে ফিরে চলে।

অবধূত আমার দিকে তাকান, বলেন, আধুনিক সাল্‌ফা-ড্রাগ-এর এই ওষুধগুলি খুব উপকার দেয়—তবে কড়া ওষুধ। এ-সব কাছে রাখতে হয়, মানুষের কাজে লাগে। এর অসুখও এতেই সারবে। পাহাড়ের গাছ-গাছড়া-শিকড়ও কিছু জানা আছে—তাতেও খুব ফল পাওয়া যায়। কিন্তু, এদের যাই দেওয়া যাক না কেন তাতেই ভাবে, নিশ্চয় রোগ সারবে।

আমি জানাই, আমার কাছেও কিছু ওষুধপত্র আছে। ফেরার সময় দিয়ে যাবো। কাজে লাগবে।

বলেন, ভালই তো।

দেখি, সেই যোগ-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র সন্ন্যাসী-দেহের অন্তরালে এক কল্যাণকামী দরদী হৃদয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রয়োজনমত সাহায্য নিতে মনের সঙ্কীর্ণতা নেই।

যে কয়দিন বদরীনাথে থাকি, তাঁর কাছে আসতে বলেন। যাই। গল্প করি। চলে আসি।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছি, দেখি ঘরে নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজরে পড়ে, একটু নীচে অলকানন্দার বরফ-গলা জলে স্নান সেরে উঠছেন। সুমুখে এসে দাঁড়ান। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ। দেখে মনে জাগে যেন একটি ছোট্ট ছেলে স্নান করে উলঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে! সারা অঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে। অথচ, শীতের অনুভূতির কোনও লক্ষণ নেই। মুখে তৃপ্তির সরল হাসি। একজন ভক্ত এসে কাপড় দিয়ে জল মুছিয়ে দেয়। শিশুর মতোই আরও হাসতে থাকেন। না মোছালে, দেহের জল নিশ্চয় দেহেই শুকাতো!

অথচ, ঘরের পাশেই প্রসিদ্ধ তপ্তকুণ্ড!

কলকাতায় ফিরে আসি। বিজয়ার পর ডাক-যোগে খামে ভরা প্রসাদী ফুল ও সিন্দুর পাই। তার কয়েকদিন পরে তাঁর একখানা চিঠি পেলাম। শীতের সময়ও তিনি বদরীনাথে কাটাবেন। এটা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি এইভাবে সেখানে থেকে আসছেন। বদরী-নাথের বহু উপরে শতোপন্থ ও স্বর্গারোহণীতে তিনি চৌদ্দবার গেছেন এবং একবার চারমাস বরফের মধ্যে সেখানে ছিলেন। তাই শীতের সময় বদরী-নাথে তাঁর এবারও থাকার উদ্দেশ্য শুনে আশ্চর্য হই না। কিন্তু তিনি জানান, ইতিমধ্যে কতকগুলি বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

শীতকালে বদরীনাথে থাকার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মত আছে। সাধারণ বিশ্বাস, বছরের শুধু ছয়মাস কাল নারায়ণ বদরীপুরীতে মানুষের পূজা নেন, বাকি ছয় মাস—অর্থাৎ শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ছেয়ে ফেলে—তখন সেখানে শুধু দেবতাদেরই নারায়ণের পূজার অধিকার। মন্দিরের ভোগ-মূর্তিটি নিয়ে পূজারী কার্তিক মাসে দীপাবলির পর যোশীমঠে নেমে আসেন—সেইখানেই তাঁর পূজার্চনা হয় বৈশাখ মাস পর্যন্ত।

অবধূতের শীত-বাসের সঙ্কল্পে সে বছর আপত্তিটা একটু ঘোরতর ভাবেই ওঠে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়েও মতভেদ আছে।

অবধূত তাঁর সঙ্কল্পের কথা চিঠিতে জানান। একদল লোকের বিরুদ্ধা-চরণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। লেখেন, তারা আদালতের সাহায্য নিয়ে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভগবানে উৎসর্গীকৃত এই শরীর এখানেই থাকবে, সব বাধা তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের কথাও লেখেন। প্রয়োজন তাঁর নিজের জন্যে নয়, এক ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে থাকবেন, তাঁর জন্যে। তাও এমন বিশেষ কিছু নয়। বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে বাইরে যাবার সময় ব্যবহার-উপযোগী জুতা ও টুপি সমেত একটি বর্ষাতি। নিজের কথাও চিঠির শেষে একটু উল্লেখ করেন—সঙ্কুচিত ভাষায়,—যদি সহজে কখনো কোথাও পাওয়া যায়—একটি শির-সুদ্ধ পূর্ণ বাঘ-ছাল,—চিতা নয়, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রেজেস্ট্রী ডাকে জিনিসগুলি গিয়েছিল, শুধু ব্যাঘ্র-চর্মের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রাপ্তি-স্বীকারও পেলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষ। ইংরাজি নতুন বছরের শুভ কামনা জানিয়েছেন ইংরাজি কবিতা লিখে :

Forget not the march of Time,
Forlorn in the lure of clime :
Friend or foe to thee, thou art ;
Dive within and search thy heart :
Who else is there but for you
Head and tail are both untrue.
Fear not the flames of filthy senses
Fret not at the fancy glimpses.
Kill thy ego, the mundane merit
Fill thyself with Divine Spirit.

তারপর লিখেছেন :

Years that have rolled on have given you an opportunity to study good and evil, to witness the pros and cons of events, major and minor, to experience pleasure and pain arising out of activities chosen purely by you through your ego, either selfishly as a man of all potence or selflessly embracing Universal Brotherhood. These locate you today this very moment, decisively over a fulcrum leaving it all for you to sensitively balance the heavily weighing past by carefully adjusting your future. A new day is dawning fast as 1953. Let you smoothly sail towards the goal of life overcoming the surges of emotions. May you thereby enjoy peace, plenty and prosperity herein and Happiness and Bliss anon. May the Lord bless you ! OM.

১৩৫৩ সাল। সে বছরেও বদরীনাথে পৌঁছে তাঁর খোঁজ নিই। দেখি, অন্য আর একটি ঘরে আছেন। হঠাৎ দেখা হওয়ায় খুসী হন। আবার ক'দিন আলাপ-আলোচনায় কাটে। সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী আছেন। খাওয়ানোর আয়োজন তিনিই করেন দেখি। অবধূতের চেহারায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। মস্তক মুণ্ডন করেছেন,—কেশদামের সঙ্গে যৌবনকান্তি

গেছে। কিন্তু, মুখের সেই মিষ্ট হাসি আরও মধুর হয়েছে। কথাবার্তার ফাঁকে আভাস পাই—কয়েকটি লোকের বিরুদ্ধ আচরণ দিন দিন রূঢ় হয়ে উঠছে। মৃদু হেসে বলেন, ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী সব হবে, এই শরীর শুধু তাঁরই কাজ করে যাবে।

সেই বছরে কলকাতায় ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই মেজদাদার আকস্মিক দেহাবসান হয়। সুদূর কাশ্মীরে। স্বাধীন ভারতের ভূস্বর্গ—মৃত্যুর করালছায়ায়-নৃশংস নারকীয় রূপে দেখা দেয়। অকস্মাৎ এই অশনিপাতে ভারতবাসী বিমূঢ় বিক্ষুব্ধ হয়। দেশের বহুস্থান থেকে বহুলোকের শোকতপ্ত সান্ত্বনাবাণী আসে। হিমালয়ের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও চিঠি লেখেন: ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ মর্মন্তুদ। অতি পুণ্য দিবসে তিরোধান করায় নিজের দিক থেকে তিনি সর্বোচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়েছেন। তবুও, সমগ্র জাতির—বিশেষতঃ সনাতনী হিন্দুদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব অপূরণীয় ক্ষতি এনেছে। হয়তো সময়ে সময়ে ভগবানের অভিলাষ হয় যে তাঁর নির্বাচিত বীরসন্তান ও পূজারকদের সহায়তায় বর্তমান সমাজ উন্নয়নের উপযোগী নয়। ভগবদ্ ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি-কামনায় বিশেষ উপাসনা এখানে অনুষ্ঠিত হোল। ওঁ।

সে-বছরও শীতকাল অবধূত বদরীনাথে কাটান।

তার কয়েকমাস পরে আবার যখন সেখানে যাই বদরীপুরীতে প্রবেশ করেই মনে হোল তাঁর কথা। আজই আবার দেখা হবে। এক বৎসর পরে।

যে-ঘরটিতে থাকতেন, গেলাম। তালাবন্ধ। বাইরে গেছেন নাকি? কিন্তু, তাঁর ঘরে তো তালা লাগানো থাকতো না! অন্যত্র কোথাও আছেন, ভাবি।

পরিচিত কয়েকজনের কাছে সংবাদ নিই। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছেও অনুসন্ধান করি। সকলের কাছে একই খবর পাই। অতি সঙ্গোপনে ফিস্ ফিস্ করে সকলে জানান,—তাঁর আর খবর পাবেন কি করে? তাঁর সেই সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে ও তাঁকে—দু'জনকেই যে হত্যা করেছে।

হত্যা! শুনে চমকে উঠি। সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা! হিমালয়-তীর্থে! কে করলে, কে? কেনই বা করলে?

কিন্তু, প্রশ্নের সঠিক উত্তর আসে না। সন্দেহের আকারে শুধু সঙ্কেত পাই। তাঁর বিরুদ্ধ দলের কাউকে ইঙ্গিত করে বলে, ওদেরই কারো প্ররোচনায় সম্ভবতঃ শেষ হয়ে গেছে।

আবার দু'একজন বলে, অপর আর এক সাধুরই এই অপকীর্তি! সেই যে নদীর ওপারে এক গুম্ফায় থাকতেন। দেখেছেন সম্ভবতঃ তাঁকে। তাঁর খুব আক্রোশ ছিল এঁর ওপর। শেষ করে দিয়ে চলে গেছেন কৈলাসে!

স্তম্ভিত হয়ে শুনি।

যদিও, সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসার কাহিনী এই নতুন শুনি না।

কিছুকাল আগে রমণ মহর্ষির এক জীবনীতেও পড়েছিলাম। তিনি যখন গৃহত্যাগ করে প্রথম অরুণাচলে আসেন তখন তাঁর অল্প বয়স—বালকমাত্র। পাহাড়ের কিছু উপরে এক গুহায় আশ্রয় নেন। এক বৃদ্ধ সাধু বহুদিন থেকে সেই গুহার কাছে থাকতেন। তাঁর দর্শন পেতে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা প্রায়ই আসতো, বড় সাধু বলে শ্রদ্ধাও করতো। বালক-সাধু রমণের আসার পর গ্রামবাসীরা তাঁর দিব্যরূপে ও মধুর আচরণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই কাছে বেশী যেতে শুরু করে। অবহেলিত বৃদ্ধ সাধুটি ক্ষুব্ধ হয়ে পাহাড়ের আরও উপরে আর এক গুহায় উঠে যান। এর পর এক একদিন উপর থেকে বড় পাথর এসে পাহাড়ের নীচের দিকে রমণ ঋষির কাছে হঠাৎ পড়তে থাকে। ভাগ্যক্রমে কোন পাথরই তাঁকে আঘাত করে না। তাঁর প্রথমে আশঙ্কা হয়—প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ বশতঃই হয়তো এমন ঘটছে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ কিছুদিন পরে ধরা পড়ে। একদিন তিনি নিজেই দেখতে পান—এ-সবই সেই বৃদ্ধ সাধুটিরই কীর্তি! উপর থেকে ঠেলে ঠেলে পাথর গড়িয়ে ফেলছেন তাঁকে উদ্দেশ করে!

সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসা!

আমার সংবাদ-দাতাদের জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে?

উত্তর পাই, শীতকালের পরও লোকে তাঁদের দেখেছে। তার পরের ঘটনা কারো দেখা থাকলেও সহজে স্বীকার করবে কেন? প্রমাণ আর কি থাকবে? থাকার মধ্যে তো শরীর দু'খানি? ভারী পাথর বেঁধে ঐ অলকানন্দায় ছেড়ে দিলেই—সলিল সমাধি! সাধু-দেহের যা সাধারণ অন্ত্যেষ্টি! তারপর সব নিশ্চিহ্ন! আর অনুসন্ধান করছেই বা কে?

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। সর্বত্যাগী নাগা সন্ন্যাসী। নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন। এখানে ছিলেন, লোকে দেখতে পেতো। এখন নেই, কেউ তাঁর খবরও নেয় না। শুধু ডাকঘরের একটা খোপের মধ্যে জমে আছে তাঁর-নামে-আসা অনেকগুলি চিঠি, কাগজপত্র!

তার ওপর ধূলা জমছে, মাকড়সায় জাল বুনছে!

ভাবি, সর্বত্যাগী শিক্ষিত সন্ন্যাসীরও অবশেষে এই পরিণতি!

অলকানন্দার কূলে গিয়ে বসি।

মনের কোথায় যেন সূচ বেঁধে।

তাকিয়ে দেখি, নদীর কিন্তু সেই একই রূপ। সহস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে তেমনি ছুটে চলেছে। দলে দলে পুণ্যলোভী যাত্রী আসে জলস্পর্শ করতে। সাধু-সন্ত আসেন অবগাহন স্নানে। স্নান শেষে কমণ্ডলু ভরে জল নেন্। কে ভাবতে পারে, ঐ জল ধারার অন্তরালে এক নিহত সন্ন্যাসীর রক্তাক্ত দেহের অংশাবশিষ্ট হয়তো এখনও পড়ে আছে! জলের উপর সূর্যের আলো ঝিক্‌মিক্ করে, অবধূতের মুখের সেই সরল হাসি মনে পড়ে।

মানুষের কৃত পাপ কর্ম। আবার, মানুষেরই গড়া দেবতা। পাপ-স্খালনের ভার দেয় মানুষ সেই দেবতারই উপর। তাই তো দেখি,—গরল-পানে নীলকণ্ঠ ঐ তুষারধবল গিরিশিখর; আবার তারই পাদমূলে কলুষহারিণী গঙ্গা—অলকানন্দা!

কিন্তু, তখনি কবির সেই প্রশ্ন জাগে:

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

মনে শান্ত হবার চেষ্টা করি।

ভাবি, অবধূত ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলতেন। তিনি কি তাঁর দেহের এই পরিসমাপ্তি জানতেন? জানা থাকলে,—এখান থেকে চলে গেলেন না কেন? হয়ত তাহলে এই বিকৃত পরিণতি ঘটতো না। অথবা,—এ শুধু তাঁর আত্মবলি?

এই সূত্রে মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। ভাগ্যবিড়ম্বনার এক করুণ কাহিনী।

এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিবাহ দেবেন। বহু অনুসন্ধান করে সুপাত্র

পেলেন। কিন্তু, তাঁর এক বন্ধু কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, এ-বিবাহে এক বছরের মধ্যেই বৈধব্যযোগ আছে, তাই চলবে না।

কন্যার পিতা পাত্রটিকে হাত ছাড়া করতে চান না, অথচ কোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহসও হয় না। তাই, বন্ধুকে নিয়ে কাশীধামে গেলেন। সেখানে তাঁর বন্ধুর গুরুদেব থাকেন, বিচক্ষণ কোষ্ঠী বিচারক, তিনি যদি এ বিবাহে সম্মতি দেন। গুরুদেব বিচার করে দেখে বিবাহ দিতে আদেশ দিলেন। কন্যার পিতা আনন্দে উৎফুল্ল।

বন্ধু তখন সঙ্গোপনে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার গণনায় কোথায় ভুল হয়েছিল বলুন, আপনারই শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করেছিলাম বলেই তো আমার বিশ্বাস।

গুরুদেব বলেন, তোমার বিচারে ভুল হয় নি। ঠিকই বলেছিলে—এ বিবাহে এক বছরের মধ্যে বৈধব্যযোগ আছে। কিন্তু, এও কি দেখো নি যে এদের এই বিবাহ কোনমতেই খণ্ডন করার উপায় নেই? এ বিবাহ হবেই, বৈধব্যও ঘটবেই।

শেষ পর্যন্ত, সেই মতো ঘটেও ছিল।

ভাবি, অবধূতও কি তাই জানতেন? কে জানে?

১১

শুধু বদরীনাথে আসায় আর মন ভরে না।

তাই সেবার এলাম শতোপন্থ যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বদরীনাথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের আরও উপরে ও নিভৃত অন্দরে যেতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে যাবার একমাত্র সময়। তখন সেখানকার বরফ অনেকখানি গলে যায়, যাতায়াতও সম্ভব হয়।

১৯৫৫ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। ৮ই রাত্রে কলকাতা ছেড়েছি। ১৪ই সকালে বদরীনাথে পৌঁচেছি। ছয়দিনও পুরো লাগে নি। পিপুলকোটি পর্যন্ত বাস্ পেয়েছি। যোশীমঠ পর্যন্ত বাস্ এলে আরও একদিন কমে যাবে। এ-যুগে বদরীনাথ কত নিকটে হয়ে গেছে! ভৌগোলিক দূরত্বের বিচ্ছিন্নতা পৃথিবীর সর্বত্রই মুছে যাচ্ছে।

এ সময়ে যাত্রীর মোটেই ভিড় নেই। হনুমান চটী থেকে এখানে আসার পথে দু'জন মাত্র যাত্রীকে দেখেছি। মে-জুন মাস হলে দিনে হাজারখানেক যাত্রী যায়-ই।

যাত্রার চিরাচরিত নিয়ম, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন, তারপর বদরীনাথ। এবার কিন্তু সোজা চলে এসেছি বদরীনাথে। কেননা, প্রথমেই যেতে হবে শতোপন্থ।

শতোপন্থ অর্থাৎ সত্যপদ।

শুনি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ওই মহাপ্রস্থানের পথ। কেউ দেখান বদরীনাথের উপর দিয়ে, কেউ বা দেখান কেদারনাথের মন্দিরের পিছনের বরফের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। বরফের উপর দিয়ে এই দুই মন্দিরের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়—শোনা যায়, ক্রোশ তিনেক মাত্র ছিল। প্রবাদ, পুরাকালে একই পূজারী দুই মন্দিরে নিত্য সেবাপূজা করতেন। একদিন তিনি এক মন্দিরের পূজা শেষ করে আর এক মন্দিরে যাওয়ার পথে পূজার নৈবেদ্যের অংশ আহার করেন। এই দুষ্কৃতির ফলে দুই মন্দিরের মধ্যে বিরাট তুষার-প্রাচীর মাথা তোলে—সেই সহজ যাতায়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়!

অপর আর এক প্রবাদও আছে: সেই পূজারী প্রতিদিন দুই মন্দিরের পূজা শেষ করে গৃহে ফিরে নিত্য স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করতেন, তাঁকে প্রহারও করতেন। পূজারীর অভিযোগ ছিল, 'আমি দু' পাহাড়ে পূজা শেষ করে এলাম, তবু তোমার গৃহকর্ম শেষ হয় না!'—ব্রাহ্মণী বুদ্ধিমতী। দুই দেবতার কাছে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা শুরু করেন, 'তোমাদেরই পূজার পূজারী আমার প্রাণ নাশ করছে। আমার মরণে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদেরই হতে হবে!'—অবশেষে হর-হরি বিচলিত হলেন, বর দিলেন। একদিনে দুই মন্দিরে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে এক অত্যুচ্চ তুষার-পর্বত উঠল!

মহাপ্রস্থানের পথও তাই দুই দিকের যেদিক দিয়েই যাক না কেন, পর্বতের একই অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে। শুধু শুরু নিয়েই মতভেদ,—পথের শেষ নিয়ে নয়। বদরীনাথের চিরতুষারময় বিরাট গিরিশৃঙ্গগুলির জটাজালে সেই মহাপ্রস্থানের পথ লুপ্ত হয়েছে। মানচিত্রে এই শিখরগুলিকে চৌখাম্বা বলে অভিহিত করা হয়। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৩,৪২০ ফিট। পর্বতের সেই শিখরদেশে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেখানে ওঠার আমার সামর্থ নেই, শিক্ষাও নেই—তাই সাহসও নেই। বই-এ পড়েছি,

অভিযাত্রীদের কেউ কেউ ঐ শিখরগুলি আরোহণ করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথের শেষ সীমা ঐ তুষারশৃঙ্গগুলিরই মধ্যে একটি বিশেষ অংশকে লক্ষ্য করে দেখানো হয়—ঐ স্বর্গারোহণী!

বরফের পাহাড়ের সেই অংশটির অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। তারই দর্শনলাভের আমাদের আকাঙ্ক্ষা। স্বর্গারোহণীর কিছু আগে একটি হ্রদ আছে—শতোপন্থ তাল। তুষার-ধবল গিরিশিখরগুলির পাদদেশে বিচিত্র সৌন্দর্যময় বারিরাশি। সেই হ্রদের তীরে কয়রাত্রি কাটানোরও ইচ্ছা আছে।

বদরীনাথে পৌঁছুতেই মন্দির-কমিটির সেক্রেটারী এসে জানালেন, যাবার সব আয়োজন তিনি করে রেখেছেন।

একটা দিন এখানে বিশ্রাম করে ১৬ই রওনা হব ঠিক হল। জিনিসপত্র এর মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে। যে সব বস্তুর এ পথে একান্ত দরকার—শুধু তাই সঙ্গে যাবে। বাকি বদরীনাথেই পড়ে থাকবে।

এসব পাহাড়-পথে লোমশ ঋষির উপদেশ এখনও মেনে চলতে হয়। পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় যাচ্ছেন। মহাভারতের বনপর্বে তার বর্ণনা আছে। লোমশ ঋষি এলেন পথ-প্রদর্শক হয়ে সঙ্গে যাবেন। জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জামের বহর দেখে ঋষিবর বিস্মিত হন। উপদেশ দেন,—'লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি।'

যাত্রা-পথে সেই 'লঘুর্ভব' উপদেশ আজও মেনে চলতে হয়।

ট্রেন ও প্লেন যাত্রায়ও আধুনিক যুগে সেই 'Travel light'-এরই বিজ্ঞপ্তি!

কলকাতা থেকে এসেছি আমরা দু'জন। শিশিরবাবু এবারও এসেছেন। বয়স তখন তাঁর ষাট হয়েছে। তবুও মনের উৎসাহে ও দেহের সামর্থে কোথাও ভাটা লাগে নি। তিনি সঙ্গে থাকলে অনেক দুশ্চিন্তার ভার সহজেই নেমে যায়। দুর্গম পথের বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নেন্। এ-পথে তাঁকে দেখলে সেই বনপর্বের কথাই আবার মনে পড়ে। হিমালয়ে দুর্গম তীর্থ-যাত্রার জন্যে পাণ্ডবরা প্রস্তুত হচ্ছেন। অনেকে সঙ্গী হয়ে যাবার জন্যে এসেছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করে বলছেন, যাঁরা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের প্রখরতা, শীতের কষ্ট সহ্য করতে না পারেন, তাঁরা সকলেই নিবৃত্ত হোন।

ভোজনপ্রিয় ব্যক্তিদেরও তিনি নিবারণ করে বলেন, যেসব ব্রাহ্মণ কেবল

সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করেন, যাঁরা পক্কান্ন লেহ্য পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভক্ষণ করে থাকেন, তাঁরাও সকলে ফিরে যান।

তে সর্বে বিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্কান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥

মহাভারতীয় যুগের কথা। তবু, এখনও তেমনি প্রযোজ্য।

সেই চিরকালীন বিচার-মতে শিশিরবাবু এ-পথে আদর্শ সঙ্গী। ভোজনের বা শয্যার কোন বিলাস নেই। কম্বল পেতে আর একটা কম্বল গায়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুতে পারেন। বালিশেরও প্রয়োজন হয় না। শুলেই চোখ বোজেন। চোখ বুজলেই ঘুম আসে। তাঁর শুধু শীতের আতঙ্ক। একটু শীত বেশী হলেই গরম পুরো-হাতা সোয়েটার গায়ে, গরম মোজা পায়ে, 'মঙ্কি ক্যাপ' মাথায়—কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোবেন। একটু পরেই ফুস্‌ফুস্‌,—ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ! খাওয়া-দাওয়ার রুচি সম্পর্কেও নির্বিকার। কিছু খেতে পেলেই হল,—রান্না যেমনই হোক। বলেন, এ-পথে এসে অনেকে অভিযোগ করেন, আলু ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না—ক'দিনেই খাওয়ায় অরুচি আসে। আমার তো কিন্তু দিন দিন ক্ষিদে বেড়েই চলেছে। বাড়িতে খাই দু'খানা রুটি, এখানে পাঁচ-ছ'খানাও চলছে। শরীর মুটিয়েছি, নয়? দেখুন তো? মুখটাও তো আরশিতে দেখছি, বেশ ভারি ঠেকছে।

আমি হেসে বলি, তা দেখাবে না? বোধ হয় এক সপ্তাহ পরে দাড়ি কামাতে বসেছেন? কলকাতা ছাড়ার পর নিশ্চয় কামান নি।

তিনি বলেন, ঐখানেই আপনার সঙ্গে তাল রাখতে পারি না। রোজই বসে যান দাড়ি কামাতে।

আমি বলি, ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। কামাতে কষ্ট হয় না—কতটুকুই বা সময় লাগে! অথচ নিয়মমত কামালে মন কেমন প্রফুল্ল থাকে দেখি। ঠিক যেমন একটা করণীয় কর্তব্য পালন করে মনের তৃপ্তি আসে। আবার হয়তো না-কামানো অভ্যেস করলে কামাতে ভাল লাগবে না। ভাল কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, কামানোর সরঞ্জাম এখানেই রেখে দিয়ে যাই। শতোপন্থে ক'দিন দাড়ির ছুটি দেওয়া যাক। ভারও তো কিছু কমবে।

শিশিরবাবু তখনি বলেন, খুব ভাল প্রস্তাব। ওপথে যা দারুণ শীতের

কথা শোনা যাচ্ছে! না-কামানো দাড়িতে খানিকটা কম্ফার্টারের কমফর্ট দেবে! কিন্তু, এখান থেকে ক'মাইল যেতে হবে খোঁজ নিলেন?

জিনিসপত্রের গোছগাছ করা, কেনাকাটা, বাঁধাবাঁধি—এ-সব শিশিরবাবু থাকলে, তাঁরই কাজ। পথঘাট সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া, কতদূর যাওয়া যাবে, কোথায় থাকা হবে—সে-সব ভার আমার উপর।

তাই বলি, আপনি তো জানেন, পাহাড়ের অনেক জায়গা আছে যেখানে মাইল দিয়ে দূরত্ব মাপা বা বোঝা যায় না। সময় দিয়ে মাপতে হয়—অর্থাৎ যেতে কতক্ষণ লাগে। এখানেও তাই। শুনেছি, পথ নেই। যেখান দিয়ে যাওয়া যাবে, সেইটেই পথ। কেউ বলে, এখান থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, কেউ বলে তার কম, আবার কেউ বলে তারও বেশী। যার যেমন মনে লেগেছে। সময়ও লাগে যাত্রীর সামর্থের উপর। একটু বেশী কষ্ট করলে দ্বিতীয় দিনেই ওখানে পোঁছানো সম্ভব। আমরা কিন্তু যাব ধীরে সুস্থে—তিন দিনে। আমাদের হাতে সময়ের যখন টানাটানি নেই, তাড়াতাড়ি করারও কোন সার্থকতা নেই।

সেক্রেটারী আসেন। বলেন, আপনাদের সঙ্গে মাল নিয়ে যেসব লোক যাবে এসে গেছে। এরা সবাই মানা গ্রামে থাকে। শতোপন্থ অঞ্চল এদের জানাশুনা। অত উঁচুতে গাড়োয়ালী বা নেপালী সাধারণ কুলীরা ভার বইতে পারে না। কাল কখন যাত্রা করবেন, বলে দিন।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা শুরু হবে, ঠিক হয়! তার আগে ওরা এসে মালপত্র ওদের সুবিধামত বেঁধে নেবে। কি কি জিনিস সঙ্গে যাবে এবং তার ওজনই বা কত হবে, তখনি দেখে একটা ধারণা করে নেয়।

মালপত্র বইবার জন্য চারজন লাগবে। একজন তো শুধু খাদ্যের বোঝাই বইবে। সেই সঙ্গে আধ মণ কাঠকয়লাও নেবে,—কেননা, সব জায়গায় জ্বালানী কাঠ পাওয়া সম্ভব হবে না। স্টোভ নিলে রান্নার কাজ চলবে বটে, তবে পথে তেল পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, স্টোভে তো আর আগুন পোয়ানো যাবে না। মাল বইবার জন্যে প্রতিজনে নেবে দৈনিক চার টাকা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের।

লোকগুলির নাম জিজ্ঞাসা করি।

ওদের দলপতি যে তার চেহারা দেখে মনে হয়, পঞ্চাশের কাছা-

কাছি বয়স হয়েছে। নাম—উদয় সিং। বাকি তিনজনের যুবা-বয়স। একজনের নাম রতন সিং, আর একজনের পান সিং। অপরটির নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। শিশিরবাবু বলেন, বোধ হয় কথা বুঝতে পারছে না।

তার সঙ্গীরা তাকে বুঝিয়ে বলে।

সে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, আমার নামটা মনে করতে পারছি না কোন মতে। ভুলে গেছি। ঠোঁট কাম্‌ড়ে ভুরু কুঁচকে-ভাবতে থাকে। সবাই হেসে ওঠে। আমরা আশ্চর্য হই। মানুষ নিজের নাম ভুলে যায়! তার সঙ্গীরা বলে, ও ঐরকমই, কেমন ভোলা মন।

সেক্রেটারী 'জানান, মন্দিরের একজন চাপরাসীকেও সঙ্গে দিচ্ছি। করিত-কর্মা লোক। রাঁধতেও জানে। খুব হুঁশিয়ারও আছে। গত বছর ওখানে গিয়েছিল। আপনাদের খাবার তৈরী করবে। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। দুর্গম পথ। কোথায় কখন কি বিপদ আসে বলা যায় না। দু'একজন লোক বেশী থাকা ভাল। বিত্যাদত্‌!—বলে ডাক দেন।

দরজার বাইরে জুতা খুলে রেখে, লম্বা ফর্সা এক গাড়োয়ালী সুমুখে এসে দাঁড়ায়। পরনে লম্বা কালো কোট। মাথায় কালো গোল টুপি। বুকের উপর মন্দির-কমিটির চাপরাস। সবল দেহ। দেখলেই মনে হয় নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

সেক্রেটারীকে বলি ভালই হয়েছে। খুচরা জিনিসের ছোট থলিটা ওর কাছে দেব, ক্যামেরা ও জলের ফ্লাস্কও ওই নেবে। সব সময়ে পথে আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

দুপুরে বিত্যা এসে দেখেশুনে মালপত্র গুছিয়ে নেয়। সেক্রেটারীও আসেন।

কলকাতা থেকে একটা ছোট তাঁবু এনেছি। Himalayan Club-এর সম্পত্তি। সভ্য হিসাবে ভাড়া পেয়েছি। চমৎকার জিনিসটি। প্লাস্টিক্‌-এর তৈরী। উপরটা গেরুয়া রঙ্‌! বরফের রাজ্যে শীত ও বাতাস দুই আটকায়। সবসমেত ওজন মাত্র সের চার পাঁচ! বাঁধা থাকলে তাঁবু বলে বোঝাই যায় না। মনে হয়, যেন একটা হাণ্ডব্যাগ! দু'জন থাকার পক্ষে যথেষ্ট। এ-পথে তাঁবু না আনলে গুহায় রাত্রিবাস করতে হয়। সঙ্গের অন্য-সকলে তাই করবে।

বিছানার মধ্যে আছে খান দুই করে কম্বল। সেক্রেটারী তাঁদের মোটা ভুটিয়া কম্বল আরও দু'খানা দিয়েছেন। বলেন, আপনাদের ওসব ভাল কম্বলের চেয়েও এ জিনিস কাজ দেবে অনেক বেশী। যেখানকার যা'। দেখবেন সেখানকার শীতের কাঁপুনি! তার ওপর মেঘ করে বরফ পড়ে যায় তো কথাই নেই!

আহার্যের মধ্যে সঙ্গে চলেছে,—সকলের জন্যে আধ মণ আটা, দশ সের আলু, ঘি, লবণ, গুঁড়া মশলা।

চাল, ডাল নিয়ে লাভ নেই,—সেখানকার জলে সিদ্ধ হতে চায় না।

বিষ্ণা সাবধানী লোক। বলে, আমাদের এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম হলেও আরও দু'তিন দিনের রসদ বেশী নিয়ে যেতে হবে। ওসব জায়গায় কখন কোথায় কি ঘটে বলা যায় না। যদি কোথাও আটকে যাই—দু'একদিন বেশী থাকতে হয়! তখন তো আর কোন জিনিস পাবার উপায় থাকবে না।

সেই মত ব্যবস্থাও হয়।

চা, চিনি ও গুঁড়া দুধও নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণা বলে, এইটে একটু বেশী করেই লাগবে। সকলেই হর্‌দম্ খাবে। সঙ্গের সকলকেই তো দিতে হবে। ও-পথে এইটেই সবচেয়ে দরকার। শরীর গরম রাখবে, মেজাজও ঠাণ্ডা রাখবে।

পাণ্ডাজী এসে বলেন, দোকানে অর্ডার দিয়েছি—মুগের লাড্ডু ও 'নিম্‌কিন্' করে দেবে। চা-এর সঙ্গে মুখরোচক হবে। নইলে শুধু আলু ও রুটি খেয়ে অরুচি লাগবে। বেশ ভাল করে বন্ধ করে রাখবেন। ক'দিন থাকবেও ভাল—আর তা ছাড়া, মানে কিনা—বলে চোখ ঘুরিয়ে অনুপস্থিত মানা-বাসীদের উদ্দেশ করেই বলেন—মানে, আরও সব থাকবে তো—একটু সাবধানে রাখাই ভাল।

তাঁর এই অহেতুক কটাক্ষ আমার ভাল লাগে না।

শিশিরবাবুর হঠাৎ কি মনে হয়। তাঁর ঝোলা থেকে দুটো কৌটো বার করেন। জিজ্ঞাসা করি, ওতে কি?

বলেন, আসার সময় বাড়ি থেকে যে নিমকি ও মিষ্টি গজা তৈরী করে দিয়েছিল! মনেই ছিল না। এগুলোও নেওয়া যাক। এখানকার পাহাড়ী নিম্‌কিন্ কেমন হবে কে জানে। আমার তো আবার পরের দাঁত! সে-সব চিবোতে পারলে হয়।

আমি বলি, সঙ্গে রাখুন। লোকও তো কম যাচ্ছি না—সকলে মিলেই সব কিছু খেতে হবে। কাজে দেবে নিশ্চয়।

এ-ছাড়া বিস্কুটও কিছু সঙ্গে আছে।

ওষুধপত্রও সামান্য নেওয়া হয়েছে—পেটের অসুখের ও ঠাণ্ডা-লাগার ভয়ে। আস্‌প্রোর ট্যাব্‌লেট্ও আছে। একটু টিন্‌চার আইওডিন, তুলা ইত্যাদিও আছে। আসার সময় কলকাতা থেকে এক ডাক্তার বন্ধু Cardiazol একশিশি দিয়েছিলেন, পাহাড়ের অত উঁচুতে—বরফের মধ্যে যদি প্রয়োজন হয়। সেটাও সঙ্গে রাখি।

সেক্রেটারী বিদ্যাকে বলেন, দমন-পত্র কিছু নিয়ে রেখো।

শিশিরবাবু বলেন, দমন-পত্র! সে-বস্তুটা আবার কি? কাকে দমন করার চিঠি?

সেক্রেটারী জানান, নারায়ণের গলায় তুলসী-পাতার মত সবুজ পাতার মালা দেখে থাকবেন—সেই মালা। এইসব অঞ্চলেই ঐ গাছ হয়। দুর্গম বা পাহাড়ের অনেক উপরে সূক্ষ্ম আব্‌হাওয়ার (rarefied air) জন্যে নিশ্বাসের কষ্ট বোধ হলে—এতে খুব কাজ দেয়। জামার পকেটে রাখবেন, দরকার হলে মাঝে মাঝে হাতের আঙুলে টিপে ঘষে শুঁকলেই কষ্ট কমে যাবে। গন্ধটিও ভাল। সাধু-সন্ন্যাসীরা খুব ব্যবহার করেন।

গরম জামা-কাপড় যা কিছু সঙ্গে এসেছে, সবই চলেছে। এই পথের জন্যেই তো আনা। নইলে শুধু কেদার-বদরীর পথে ক'দিন ও কতটুকুই বা গরম জামার দরকার হয়।

শিশিরবাবুকে বলি, আপনার কান-ঢাকা টুপিটা নিয়েছেন তো?

তিনি হেসে উত্তর দেন, এইখান থেকেই সেটা মাথায় লাগাব, সাতদিন পরে আবার এইখানে এসে খুলব।

বলি, মাথায় যে ক'গাছা চুল আছে, তার সঙ্গে বুনে নিন্। পথে যদি খুলে পড়ে যায়—টের না পান—তখন রিসার্চ চলবে—এটা স্নো-ম্যান্ এর মাথার খুলি কিনা!

হাস্য-পরিহাস ও আনন্দের মধ্যে আমাদের যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে।

ঘরে প্রবেশ করেন হিমালয়বাসী পূর্ব-পরিচিত এক বৃদ্ধ সাধু। আমাদের

যাবার উৎসাহ দেখে বলেন, তাই তো, আপনারা এ-পথে যাবার চেষ্টা করছেন! এ-সব গৃহীদের পথ নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরাই যেতে সাহস পান না অনেক সময়। আপনাদের একটু দুঃসাহসিকতা হচ্ছে। ভেবে দেখুন ভাল করে, যাবেন কিনা।

আমি নজির দেখিয়ে বলি, কেন? এর আগেও তো কত লোক ঘুরে এসেছেন। আর যেতে যদি আমরা নাই পারি, ফিরে আসব।

তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, ফিরে আসা কি সহজ?

আমি হেসে বলি, যাক্, তাহলে যাওয়াটা শক্ত নয়, ফেরাটাই শক্ত!

তিনি বলেন, না না, এ-সব পথ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা নয়। বড় কঠিন যাত্রা। মহাপ্রস্থানের পথ—শুধু ধর্মরাজই একমাত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

তারপর, তাঁর কাছে গল্প শুনি, এই দুরূহ পথের নানাবিধ ভয়াবহ কাহিনী। মৃত্যুর ছায়া-মলিন। তাঁর নিজেরও সেই শতোপন্থ-তালের তীরে কাটানো দিনগুলির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একদল সাধুর বরফের মধ্যে জীবন্ত সমাধি-প্রাপ্তি। পরের বছর নাকি তাঁদের মৃতদেহগুলির উদ্ধার হয়। সারা বছর বরফে চাপা থাকায় তাঁদের ভোজ্য-সামগ্রী বা কোন কিছুই নষ্ট হয় নি, দেহগুলির কোন বিকৃতি ঘটে নি—শুধু প্রাণটুকুই গেছে!

কোন্ এক ইউ-পি-প্রদেশবাসীর সস্ত্রীক ঐ পথে যাওয়ার গল্প শুনি। স্বামীজি বলেন, তাঁকে অনেক করে নিষেধ করেছিলাম—বিশেষতঃ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোনমতেই শুনলেন না, বলেন, সস্ত্রীক না গেলে পুণ্যলাভের অঙ্গহানি হবে।—মরণ টানছিল, মশাই, মরণ! গেলেন জোর করে। তারপর মাঝপথে অতি-দুর্গম এক জায়গায়—সেখানটায় শিরদাঁড়া পথ—যেতে পারেন তো দেখবেন, কি ভীষণ!—সে মহিলাটি ওপর থেকে পড়ে গেলেন—মৃত্যুও নিশ্চয় তখনি ঘটেছে। কিন্তু স্বামী নাকি অপেক্ষাও করেন নি, ফিরে তাকিয়েও দেখেন নি! তীর্থ সাঙ্গ করে একাই ঘুরে এলেন।

শিশিরবাবু গম্ভীর মুখে বলেন, যুধিষ্ঠিরও তো ঐ ধরণের আচরণ করে চলে গিয়েছিলেন? কিন্তু এ-ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল না কি?

স্বামীজি বলেন, ওসব কথা রাখুন। এ-যাত্রা বড় ভীষণ পথে, মশাই। আপনারা যাবেন কিনা ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখুন।

আমি বলি, যাত্রাটা তো কাল করি। তারপর পথের কথা পথেই দেখা যাবে। তবে আশীর্বাদটা করবেন যেন যাত্রা সার্থক হয়।

আরো কত গল্পই না শুনি এই পথের।

সকলেই বলেন, অতি দুর্গম পথ। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টন—এও সকলে স্বীকার করেন।

হিমশিখরগুলির জটাজাল বিস্তার করে ঐখানেই তো সত্যকার হিমালয়। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসভূমি। তাই তো শুনি, ঐ পথে জড়দেহের অবসান সাধুসন্তরা একান্তভাবে কামনা করতেন। কেদারনাথের পিছনে বরফের পাহাড়ের অংশবিশেষে উঠে তাঁরা উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই মরণে নাকি অশেষ পুণ্য! এখন এই ভাবে মৃত্যুবরণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এই পথে যাওয়ার অধিকার-ভেদেরও কথা শুনি। পূর্বে সকলের যাওয়ার নিষেধ ছিল।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৫৯ সালের মাঘ মাস থেকে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ভারতের বহু তীর্থ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তাঁর সেই ভ্রমণের রোজনাম্চা 'তীর্থভ্রমণ' নামে বই-আকারে পরে প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তরাখণ্ডেও গিয়েছিলেন। একশো বছরেরও উপরের কথা। এই মহা-প্রস্থানের পথে তিনি নিজে না গেলেও এই পথের যাত্রী হবার অধিকার কাদের আছে সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন। টেহেরীর রাজার কাছ থেকে তখন অনুমতি নিতে হত। অনুমতি দেওয়ার আগে যাত্রীর শক্তি-পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম ছিল। সেই পরীক্ষার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এই বলে :

"যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থাগমনের আবেদন করিতে হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া, উত্তমরূপ রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে পুনর্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলী বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে

আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।”

ভাবি, এখন সেই টেহেরী-রাজ্যও নেই, রাজাও নেই, সে-সব পরীক্ষাও নেই। কালের গতিতে এ-সব-কিছুরই প্রয়োজনীয়তা মুছে গেছে। সেকালে লোকে বদরিকাশ্রমে আসতো প্রাণ হাতে নিয়ে,—বিলেতের জাহাজেও যেমন চড়তো উইল করে! অজানা দীর্ঘ দুর্গম পথের বিপদের আশঙ্কায় প্রিয়জনের চোখে অশ্রু ঝরত। যাত্রীও কাঁদত। আর এখন যাত্রী আসে হাসিমুখে—মন্দিরের মাত্র কয় মাইল দূরে মোটর চড়ে!

কিন্তু সেই সনাতন সত্যপদের পথ এখনও কি তাই আছে?

‘জয় রাম শ্রীরাম! জয় জয় রাম—জয় সীতারাম!’

আরে! এই যে বৈরাগীজি এসে গেছেন! প্রতি বছরই বদরীনাথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।

সেই মুখভরা হাসি। মাথাভরা জটা। আলিঙ্গন করে বসাই।

বলেন, এইমাত্র খবর পেলাম—আপনারা কাল এসে গেছেন। যাত্রা করছেন কবে?

বলি, কাল রওনা হব। সব গোছগাছ আজ হয়ে গেল।

বলেন, ভালই। দর্শন করে আসুন। খুব আনন্দ পাবেন। দেখবেন, কি অপূর্ব স্থান। যেমন প্রাকৃতিক শোভা, তেমনি বিচিত্র অনুভূতি। ওঃ! —বলে চোখ বোজেন। মুখ গম্ভীর হয়। ভ্রূযুগল কাঁপতে থাকে। যেন কল্পনার রথে চড়ে আবার সেখানে বিচরণ করেন।

জিজ্ঞাসা করি, আপনি গিয়েছিলেন কোন্ বছর?

বলেন, এই তো দু'বছর হল। ভাবি, আবার কবে যাব!

বলি, চলুন না। যাবেন আমাদের সঙ্গে?

শুনে উৎসাহিত হন। কিন্তু তখনি সংযত হয়ে বলেন, যাওয়ার অন্য কোন বাধা নেই। আপনাদের যদি অসুবিধা হয়?

শিশিরবাবু উৎফুল্ল হয়ে বলেন, আমাদের আবার অসুবিধে কি? চলুন সঙ্গে। খুব ভালই লাগবে।

সেইমতই স্থির হয়।

ঘণ্টাখানেক পরে বৈরাগী গম্ভীর মুখে ফিরে আসেন। বলেন, কাল তো আপনাদের যাওয়া চলবে না। দু'দিন পরে বেরুতে হবে।

আশ্চর্য হই। জিজ্ঞাসা করি, কেন, কি হয়েছে?

তিনি বলেন, এইমাত্র ওপারে গিয়েছিলাম। স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, কাল-পরশু দু'দিনই অযাত্রা! তাই তার পর যাওয়াই প্রশস্ত।

আমরা রাজী হই না। বলি, যাওয়ার আয়োজন সব হয়ে গেছে। মানাগ্রাম থেকে সে-লোকগুলিও কাল তৈরী হয়ে আসবে—এখন এ অবস্থায় আর দিন পেছুনো চলে না।

তিনি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনারা বুঝি পাঁজিটাজি এসব মানেন না? তীর্থযাত্রায় এসব মেনে চলতে হয়।

আমি হেসে বলি, ওসব প্রশ্ন এখন থাক্। আপাততঃ আমার একটা সহজ জবাব আছে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কলকাতা থেকে। সেদিন কি যোগ ছিল তা দেখি নি, জানিও না। ভাল-মন্দ যাই থাক—সেটা হয়ে গেছে—আর ফেরা চলবে না। বদরীনাথে থাকা, আমাদের কাছে পথে থাকা মাত্র। তাই এখান থেকে যাত্রার দিনক্ষণ দেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। ঠিক নয় কি?

তিনি হেসে বলেন, তা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো ওটা খাটবে না। আমার যাত্রা যে এখান থেকে শুরু!

অতএব স্থির হয়, আমরা কাল আয়োজন-মতই রওনা হব। তিনি তার দু'দিন পরে যাত্রা করবেন এবং দুই দিনে এই পথ অতিক্রম করে আমাদের একদিন পরে শতোপন্থতালে পৌঁছুবেন। তারপর, এক সঙ্গে সেখানে থাকা যাবে, ফেরা যাবে। শিশিরবাবু তাঁকে বলেন, আপনার মালপত্র আজই দিয়ে যান। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

তিনি গুহায় ফিরে গিয়ে নিয়ে আসেন।

মালপত্রের বহর দেখে আমরা হেসে উঠি। কিই বা আছে! থাকবেই বা কি?—একটি মৃগচর্ম, একটা লোটা ও দু'খানা চটি বই!

বলেন, মৃগচর্মটা শোওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ গরম থাকে। আর এই গায়ের চাদরটা—সেটা তো আমি সঙ্গেই নিয়ে যাব—মাঝপথে একটা রাত্রি তো আমাকে কাটাতে হবে। আর পুঁথিদু'টি নিয়ে চলেছি—তুলসীদাসের

'রামায়ণ' আর 'সত্যনারায়ণের কথা'—সরোবরের কূলে সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ করতে হয়। কেমন ঠিক না?

শিশিরবাবু বলেন, মন ঠিক থাকলে—সবই ঠিক আছে।—জয় রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম!

১২

সকাল দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই প্রস্তুত।

মন্দির পরিক্রমার পর বদরীবিশালকে প্রণাম করে যাত্রা শুরু হল।

পাণ্ডাজী, সেক্রেটারী, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বৈরাগীজিও এসেছেন। মাইল দেড় দূরে মাতা-মন্দির—সেই পর্যন্ত তিনি যাবেন, বললেন।

সার বেঁধে আমরা চলেছি। দলের পুরোভাগে মাল নিয়ে রতন সিংরা চারজন। তাদের পিছনে আমরা দু'জন ও আজকের কিছুক্ষণের সঙ্গী বৈরাগী। সকলের শেষে বিন্তা। তার এক কাঁধের উপর থেকে ঝুলছে জলের ফ্লাস্ক, অপর কাঁধ থেকে একটি ছোট্ট ঝোলা—তাতে ক্যামেরা ও খুচরা কয়েকটা জিনিসপত্র আছে।

আপাততঃ সোজা পথ। পাহাড়ী ভাষায়—ময়দান। চড়াই নেই, উৎরাইও নেই। মাইল দুই এই রকমই যাবে, শুনি। বাঁ দিকে ঊর্ধ্বমুখী স্তব্ধ নারায়ণ পর্বতশ্রেণী, ডান দিকে কিছু নীচে নিম্নমুখী গতিশীলা অলকানন্দা। নদীর পরপারে নরপর্বত গিরিশ্রেণী।

সোজা সহজ পথ হলেও ধীরে ধীরে চলি। শরীরের যা কিছু শক্তি-সামর্থ সঞ্চয় করে রাখতে হবে। সম্মুখের দুর্গম পথের কত রোমাঞ্চকর কাহিনীই শুনেছি। ভাবি, সে-সব পথের কষ্ট সইবার শক্তি যেন থাকে, বিপদ বইবার মনের জোর যেন পাই। কেন জানি না, মনে ভয়ের কোন ছায়া পড়ে না। কি এক অজানা শক্তির উপর নিশ্চিন্ত মনে সম্পূর্ণ নির্ভর করি—বিমল আনন্দে সারা মন ভরে ওঠে। চরণ চলতে থাকে। যেন, পথ-হারা পথিক বহুকাল পরে আপন ঘরের পথ খুঁজে পায়।

একটা সামান্য ব্যাপার অসামান্য রূপে হঠাৎ মনে জাগে।

পকেটে হাত দিতে দেখি—শূন্য! আজ সঙ্গে কপর্দকও নেই। পয়সা

কড়ি যা কিছু ছিল—বদরীনাথে রেখে এসেছি। এ-পথে এক পয়সারও প্রয়োজন নেই। কোন কিছু কেনবার জিনিসও নেই, বেচবার দোকানও নেই। পথের উপর কোন লোকালয় বা গ্রামও নেই, টাকাকড়ি দেবার-নেবার লোকও নেই।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পথের পথিক। সাতদিন কাটবে। অথচ, অর্থের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শহরে বাড়ির বাইরে যেতে হলে পকেটে কিছু পয়সা—দরকার না হলেও—রাখতেই হয়; কে জানে, যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয়! না রাখলে মনে একটা অসহায় ভাব আসে।

আর, এই সাত দিনের জীবনে টাকার কোন মূল্য নেই। অর্থ নিরর্থক। তাই, এই শূন্য-পকেট অভাবের অস্বস্তি জাগায় না। মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি আনে।

জীবন-পথিক। অর্থ নেই, তবুও নিঃস্ব নই! ক্ষণিক হলেও অর্থ-মুক্তির একটা অভূতপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করি।

বদরীনাথ থেকে প্রায় মাইল দেড় দুই দূরে মানাগ্রাম। শতোপন্থের পথে পড়ে না। অলকানন্দার অপর পারে। এ-পার থেকে দেখতে পাই।

ক'বছর আগে ওখানে গিয়েছিলাম। বসুধারায় যাবার সময়। নদীর উপর লোহার ঝোলা পুল। সে-বছর প্রচণ্ড তুষারপাতে পুল ভেঙে গিয়েছিল। নদীর জলস্রোতের উপর সে-সময়েও বরফের প্রচণ্ড স্তূপ জমেছিল। তারই উপর দিয়ে যাতায়াত করেছিলাম। অতি সাবধানে। বরফের সেই স্তূপের মুখে প্রকাণ্ড গহ্বর হয়েছিল, তার ভেতর থেকে নদীর জলধারা প্রখর বেগে ছুটে আসছিল, ধার থেকে বরফের চাঙড় ভেঙে ভেঙে জলে পড়ে ভেসে চলেছিল। বরফের সেতুর কোথা দিয়ে পার হওয়া নিরাপদ, পাহাড়ী সঙ্গীরা দেখিয়ে দিয়েছিল!

মানাগ্রাম এ-অঞ্চলে বড় গ্রাম। প্রায় তিন-চারশো লোকের বসতি আছে। এরাই, শুনি, গন্ধর্বজাতি। এখন লোকে বলে, মার্চা। চাষবাস করে, ভেড়া-ছাগল পোষে, তিব্বতীদের সঙ্গে ব্যবসা করে। শীতের সময় নীচে নেমে যায়। সম্প্রতি এখানে ভারত-সীমান্তের পুলিসের ছাউনি হয়েছে। এই দিক দিয়ে মানা পাস্ হয়ে তিব্বত যাবার পথ। সেই দিক থেকে নেমে আসছে সরস্বতী নদী। পুরাণে কথিত আছে, সরস্বতী বেদের দ্রবময়ী

দ্বিতীয় মূর্তি। জলরূপিণী সরস্বতী এখানে অলক্ষ্যবাহিনী নন্, লক্ষ তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে ছুটে আসছেন। খর-ধারায় দুই দিকের পাথর কেটে। বসু-ধারায় যাবার পথে তারই উপর এক জায়গায় বিশালকায় পাথর পড়ে একটি প্রাকৃতিক সেতু রচিত হয়ে আছে! ভীমসেন পুল নামে এর প্রসিদ্ধি। প্রবাদ, মহাপ্রস্থানের পথে মধ্যম পাণ্ডব এই নদী পারাপারের জন্যে ভীমকায় পাথরগুলি এমনিভাবে ফেলেন। সৃষ্টির কারণ যাই হোক—স্থানটি মনোরম। বদরী-যাত্রী মাত্রেই এই পথটুকু স্বচ্ছন্দে গিয়ে উপভোগ করে আসতে পারেন। সোজা রাস্তা। চলার কষ্ট নেই। অথচ, দেখার আনন্দ আছে। মানাগ্রামও সেই সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পুরাণ-কথিত এই মানসোদ্ভেদ তীর্থ। মণিভদ্রাশ্রম। এরই পশ্চিমদিকে চড়াই-পথে বসুধারা। পুরাণে তারও উল্লেখ আছে। মানাগ্রামের কাছে পাণ্ডারা অনেক কিছুই দর্শনীয় দেখান। বহু উঁচু এক পাহাড়ের গায়ে কালো রঙ্-এর বিচিত্র রেখা—অনেকটা ঘোড়ার আকারের—দেখিয়ে বলেন, ঐ শ্যাম-ঘোটক! শ্রীকৃষ্ণ কৈলাস-যাত্রা শেষ করে ফিরছেন। তিব্বতে থোলিং মঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেখানে দেখেন তিব্বতীরা জব্বু-মাংস নৈবেদ্য-রূপে উৎসর্গ করছে! তাই দেখতে পেয়েই তিনি উচ্চৈঃশ্রবায় চড়ে তখনি এখানে চলে আসেন এবং নারায়ণে লুপ্ত হন। অশ্বটি লিপ্ত হয়ে থাকে ঐ হিমালয়ের গায়ে!…একটা বিরাট পাথরের স্তূপ, দেখলে মনে হয় স্তরে স্তরে জমে আছে। পাণ্ডারা বলেন, ব্যাস পুস্তক—ব্যাসদেবের সব পুঁথি। এই শুনি, ব্যাসভূমি। কাছেই গণেশগুম্ফা। পাণ্ডাজি হেসে বলেন, তিনিই তো ব্যাসদেবের স্টেনো ছিলেন! আরো কত কি! মনে পড়ে, কুলু উপত্যকার পথেও ঐ ধরণের একটি প্রস্তর-স্তূপ দেখিয়ে ব্যাসদেবের পুঁথির কাহিনী সেখানকার অধিবাসীরাও শুনিয়েছিল।

ভাবি, ব্যাসদেবের সঠিক ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকলেও তাঁর স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে সর্বত্র জেগে আছে। যেন তাঁর রক্ত মাংসের শরীর এই সেদিন চলে গেছে, ভুজপাতার পুঁথিগুলি এখন পাথর হয়ে জমে আছে! ভারতবাসী মাত্রেই ভাবতে আনন্দ পায়, ব্যাসদেব আমার স্বদেশবাসী, আমার ঘরের পাশেই তাঁর ঠাঁই। তাই বুঝি দেখি, ভারতের বহুস্থানে ছড়ানো—ব্যাসভূমি!

মানাগ্রামের কিছু নীচেই অলকানন্দার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম। কেশব

প্রয়াগ। সরস্বতী সোজা নেমে আসছেন, অলকানন্দার ধারা বাঁ দিকের উপত্যকা দিয়ে বয়ে এসেছেন। অলকানন্দার সেই ধারা ধরে আমাদের গতিপথ। ওপারে দূরে মানাগ্রামের বাড়িগুলি আঁকা ছবির মতো পড়ে থাকে। এপারে পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। চারিপাশে গমের ক্ষেত। ক্ষেত ঘিরে পাথর সাজিয়ে বুক-উঁচু পাঁচিল! দুই দিকে একটানা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। ফুট দুইমাত্র চওড়া হবে। যেন গ্রামের গলির মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি। কখনো বা সেই পথ রোধ করে আর একটা পাঁচিল উঠেছে। সাজানো পাথরগুলি ধাপের কাজ করে; পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে ক্ষেতের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়।

মানাগ্রামের প্রায় সামনাসামনি এপারে মাঠের মধ্যে ছোট একটি সাদা মন্দির। মাতা-মূর্তির। পৌরাণিক ঋষি নর-নারায়ণের জননী। ঋষিদ্বয় বিষ্ণুর অবতার। মন্দিরের কাছাকাছি কোন লোকজনের বসতি নেই। অন্য কোন মন্দিরও নেই! একান্তে একাকিনী মাতা দেবী বিরাজ করছেন।

এই সম্পর্কে এক সুন্দর উপাখ্যান আছে।

ঋষি নর-নারায়ণ দুই ভাই গৃহত্যাগ করে যখন চলে আসেন তখন তাঁদের জননীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবেন। কিন্তু, একাগ্র তপস্যায় মগ্ন থাকায় মায়েব কাছে কোন খবর আর পাঠানো হয় না। বছরের পর বছর যায়, জনক-জননী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে পিতা ধর্মরাজ ও মাতাদেবী তাঁদের সন্ধানে বার হন। বদরীনাথের কাছে তাঁদের আসতে দেখে নর-নারায়ণ চিন্তিত হয়ে ওঠেন—মা এসে তাঁদের তপস্যা ক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন। তাই, তাঁরা দু'জনে বদরী-ভূমির দুইদিকে—অলকানন্দার দু'ই কূলে—দু'টি পর্বতের আকার পরিগ্রহ করে রইলেন। কিন্তু, পরে মায়ের দুঃখে বিচলিত হয়ে ঋষি নারায়ণ তাঁর কাছে আসেন এবং বদরিকাশ্রমের নিকট মায়ের বসবাসের সম্মতি দেন। সেই থেকে মাতা মূর্তি জনহীন প্রান্তরে একাকিনী এই ছোট মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন। দৈনন্দিন সেবা-পূজার কোন নিয়ম নেই, ব্যবস্থাও নেই। সারা বছর মন্দির বন্ধই থাকে। বছরের একদিন মাত্র—বামন দ্বাদশীর দিন—পুত্র নারায়ণ আসেন মায়ের কাছে। বদরীনাথের মন্দির থেকে নারায়ণের ভোগমূর্তি—উদ্ধবদেব-

বিরাট শোভাযাত্রা করে আসেন। এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে। নারায়ণের প্রধান পূজারী রাওয়াল নিজে এসে মাতার পূজা করেন। বিশেষ ভোগ হয়। বিশ্ব-কল্যাণের জন্যে হোম-অগ্নি জ্বলে। দিন-শেষে মাতা-পুত্রের একদিনের মিলন-উৎসব সাঙ্গ হয়। ভগবান নারায়ণ আবার নিজ বৃহৎ মন্দিরে অগণিত ভক্তবৃন্দ নিয়ে ফিরে যান। মাতার ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষণিক-খোলা দুয়ার আবার বন্ধ হয়। পুত্রের মঙ্গলকামী জননী বোধ করি আবার বৎসরের নিঃসঙ্গ নিরম্বু উপবাসের দিনগুলি গুণতে বসেন!

সাধারণ বিশ্বাস, এখানে বসে ধ্যান করলে গৃহস্থের বিপথগামী সন্তান সৎপথে ফিরে আসে; সংসার-আসক্ত মন মায়ার বাঁধন কাটিয়ে বৈরাগ্যের সন্ধানও পায়।

মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাতার দর্শন করি। পাথরের মূর্তি। মনে হয়, অধর প্রান্তে যেন ম্লান, অথচ মধুর, হাসির অস্ফুট রেখা। ভাবি, পাথর বলেই বোধ করি এত সইতে পারেন, জননী বলেই অতো স্বল্পেই তৃপ্তির হাসি ফোটে!

মন্দিরে প্রণাম করি। মন ভরে, মাথা পেতে, মায়ের আশীর্বাদ নিই। আবার পথ চলি।

মনে আসে অনেক দিন আগেকার এক ঘটনা।

বাংলা দেশের এক শহরে গিয়েছি। সেখানকার এক বড় জমিদারির মালিকদের মধ্যে মামলা শুরু হয়েছে। মাত্র দু'পুরুষ আগে এই জমিদারি গড়ে ওঠে। বিপুল সম্পত্তি। জমিদার জীবিতকালে রাজা উপাধি পান। তাঁর পুত্র, পৌত্রগণও সেই সূত্রে তখনও 'কুমার' বলে পরিচিত। নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের বিষে যখন জর্জরিত হয়ে উঠেছে, তখন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে দখল নিতে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। শহরের কাজগুলি শেষ হলে এক বৃদ্ধ কর্মচারীর কাছে শুনলাম, শহর থেকে কিছু দূরে সেই রাজাবাহাদুরের সময়ের আর এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে। সেটি দেবোত্তর, তাই এই মামলার বিষয়ীভূত নয়। সেইখানে এখনও বৃদ্ধা রাজরাণী একাকিনী বাস করেন। দেবোত্তরের অবস্থা শোচনীয়। সেই রাণীমারও এখন কেউ খোঁজ খবর নেন্ না। প্রাসাদ, মন্দির সব ভেঙে পড়ছে। অথচ, সেই প্রাসাদের কারুকার্য, রূপার আসবাবপত্র এককালে দর্শনীয় বস্তু ছিল। এখনও অনেক কিছু পড়ে আছে, শুনি।

প্রয়োজন না থাকলেও, দেখার আগ্রহ জাগে। মনে বিশেষ করে কৌতূহল তোলে, সেই রাজরাণীর নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর কাহিনী। বৃদ্ধ কর্মচারীকে নিয়ে দেখতে যাই।

শহর থেকে বেশ দূরে। দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে। বড় বড় গাছের বন হয়ে আছে। আম-কাঁঠাল ইত্যাদি নানান্ ফলের ও বহুবিধ ফুলের এককালীন সাজানো বাগান এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তারই মধ্যে মাথা তুলে এক বিপুল অট্টালিকা এবং ঊর্ধ্বমুখী এক মন্দির চূড়া। গাছগুলির উপর বহু দূর থেকে দেখা যায়। দেখে মনে পড়ে, ইন্দো-চায়নায় দেখা ঘন বনের মধ্যে আঙ্কোর ভাট্-এর বিস্ময়কর মন্দির-নগরের দূর থেকে দৃশ্য। কী মহান্, অথচ কী করুণ! যেন অতীত গৌরবের নিভে যাওয়া চিতার ঘন কালো ধূমরাশির জমাট কুণ্ডলী!

বিকেলবেলা। তবুও, মনে হয় সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে।

প্রাসাদের বাইরে ইঁটের সূক্ষ্ম কারুকার্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিস্মিত হয়ে দেখি।

কর্মচারী বলেন, উপরে চলুন। ঘরের আসবাবপত্র দেখবেন। সাবধানে দেখে উঠবেন। চারপাশে ভাঙা ইঁট, ঝোপ্ঝাপ্। সাপের বাসা।

উপরের ঘরে ঢুকে চম্‌কে উঠি। রূপার তৈরী সোফা সেট। ঘরের মাঝখানে রূপার পালঙ্ক। কিন্তু, ওকী! দেওয়ালের গায়ে গায়ে, খাটের রূপার ছতরী ঘিরে প্রকাণ্ড সব সাপ জড়িয়ে আছে!

কর্মচারী বলেন, এগিয়ে চলুন। ওগুলো সাপ নয়। দেওয়াল বেয়ে, ছাদ থেকে—ঘরের চারিদিকে ও-সব বট-অশ্বত্থের ঝুরি নেমেছে। রূপোর পাকে পাকে ঝুরির পাক খেলেছে।

সত্যই তাই। কালের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিগতকালের রাজার ধনদৌলত-সুখসম্পদের জাজ্বল্যমান প্রতীকগুলিকে মহাকাল ধ্বংসের নাগ-পাশে বেষ্টন করেছে। মানুষের গড়া কতো আশা-আকাঙ্ক্ষার সাজানো সংসার—এই তার চিরন্তন পরিণতি! মানুষ গড়ে, কাল ভাঙে। তবু, মানুষ আবার গড়ে। আবার কাল ভাঙে। ভাঙা-গড়ার নাগর-দোলায় মানব-শিশুকে বসিয়ে মহাকাল ঘোরাতে থাকেন।

কিন্তু, ভাবি, রাজরাণী থাকেন কোথায়? একবার দেখা হয় না? কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করি।

দর্শনের ব্যবস্থা হয়। শুনি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রাণীর সাজসজ্জায় সময় নেবে।

কর্মচারী ম্লান হেসে বলেন, রাজবেশের আয়োজন নয়। একরকম বিবস্ত্রই থাকেন। কয়েক বছর আগে পক্ষাঘাত হয়েছিল। শরীরের একটা অংশ পড়ে গেছে। বয়সও হয়েছে আশীর কাছাকাছি। কাছে সব সময়ে থাকেন ওঁর এক বহুকালের পরিচারিকা। সব কাজ, দেখাশুনা তিনি একাই করেন। এই দুঃখদৈন্যের দিনেও ছেড়ে যান নি। রাণীমা ওঁকে মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন, ভালো বিবাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে আসেন। সেই থেকে ওঁর নিত্য সহচরী হয়ে আছেন। আমরা দু'একজন পুরনো কর্মচারী মাঝে মাঝে আসি। রাণীমা এখান থেকে কোথাও যেতে চান না।

শারীরিক অবস্থার কথা শুনে বলি, ওঁকে তবে বিরক্ত করে কাজ নেই। দেখা না করাই ভালো।

কর্মচারী জানান, দেখা করলে তিনি খুশীই হবেন। আর, এখন একবার খবর দিয়ে দেখা না করে গেলে মনে আঘাত পাবেন। কেউ তো আসে না দেখা করতে! একমাত্র ছেলে—কুমার বাহাদুর—বছর পনেরো হোল হঠাৎ মারা গেলেন, আগে তাঁর কাছেই থাকতেন। এখন নাতি-নাতনিরা আছে, কলকাতাতেই থাকে। কখনো এদিকে মাড়ায় না। কোন খোঁজখবরও নেয় না। জমিদারীর টাকা সেখানেই সব যাচ্ছে, খরচও হচ্ছে। শুনি, সে টাকায় রেস্-এর ঘোড়াও নাকি ছুটছে।

ভেঙে-পড়া বিরাট প্রাসাদের একপাশে একতলায় ছোট্ট দু'টি ঘর। কোন রকমে বাসের উপযোগী করে রাখা। তারই সামনে বাঁধানো রোয়াক। সেইখানে একটি চেয়ারে রাণীমাকে নিয়ে এসে বসিয়েছে। পরনে গরদের থান। পায়ের কাছে সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। মাথার উপর দিয়ে সর্বাঙ্গে জড়ানো অতি সূক্ষ্ম কাজ করা দামী শাল। কতক অংশ পোকায় কেটেছে, কোথাও বা ছিঁড়েছে। রাণীমার একটি হাত অক্ষম, অপর হাতটি থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। সারা অঙ্গ শালে ঢাকা। শুধু মুখখানি খোলা। কাঁচা সোনার রঙ, শুনেছি। আজ চোখে দেখি। ভাবি, রাজ-রাণীর রূপ এমনি তো হওয়া চাই। মুখে জরা ও বার্ধক্যের বলিরেখা। তবুও, সারা মুখ যেন জল্‌জ্বল্‌ করে। টানা চোখ দু'টিতে শান্ত-করুণ দৃষ্টি।

শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করি। আর একটা চেয়ার এনে রাখা ছিল, মৃদু কণ্ঠে বলেন, বোসো। তোমার আসার কারণ সব শুনলাম। দেখো, যদি সম্পত্তি বাঁচে! এ আমার স্বামীর নিজের হাতে সব গড়া। আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। মনে হয়, সেদিনের কথা। চোখের সুমুখে কি পরিবর্তনই না দেখলাম!

পুরানো দিনের গল্প করেন। কথার তুলিতে, ভাবের আবেগে, যেন ছবি ফুটে ওঠে। একদিনের ঘটনা বলেন:

তখন সবে নতুন মোটর আমদানি হয়েছে। রাজাবাহাদুরের কেনার সখ হোল। এক মহালের প্রজাদের কাছে টাকা তোলা হোল। নতুন মোটর এলো। তাতে চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। প্রজারা গ্রাম থেকে দলে দলে দেখতে আসে। ঘোড়া নেই, তবু গাড়ী ছোটে। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি থাকি অন্দর মহলে। লোকের মুখে গল্প শুনি। সে-বছর পূজার সময় আর এক বড় মহালের বহু প্রজা এসেছে। ভোগপ্রসাদ পাবে। প্রকাণ্ড উঠানে সারি বেঁধে খেতে বসেছে। পরিবেশন করতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাতা হাতে আমি বেরিয়ে এলাম। নিজের হাতে একধার থেকে দিতে শুরু করেছি। চারিদিকে চাঞ্চল্য জাগলো—'একী! রাণীমা আপনি নিজে? একি করছেন?'—আমি তখনি অভিমান দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি তো তোদের গরীব রাণী। তোদের রাজাকে তাঁর প্রজারা মোটর কিনে চড়তে দেয়—আমাকে কে কি দেয়? আমি তোদের গরীব মা!'—কিছুদিনের মধ্যেই সেই মহালের প্রজারা ক' হাজার টাকা তুলে আমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে গেল। সেই টাকাতেই এই এখানকার সম্পত্তি কেনা, দেবোত্তর করা—আমার শ্যামরায়ের ঝোলা ঝোলানো।

চুপ করে শুনি। কথা বলে ক্লান্ত হন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ভাবি, অক্টোপাস্-এর মতো আঁকড়ে ধরে মন্দিরের গা বেয়ে যে বিরাট অশ্বত্থ গাছটি উঠেছে—তাই কি দেখছেন?

নাতিদের কথা তুলি। শুনেই বলেন, আহা! তারা শহরে থাকে। ছেলেমানুষ। নানা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সময় পায় না; তাই আসতে পারে না। যেখানেই থাক, ভাল থাকলেই আমি খুশী। সময় পেলেই নিশ্চয় আসবে। আমি এখানে আমার শ্যামরায়কে নিয়ে আছি।

কোনো অভিযোগ নেই, কথার ফাঁকে কোনো অভিমানও নেই। ঠোঁটের

কোণে যেন করুণ হাসির রেখা ফোটে। অথচ, কি নিঃসঙ্গ, নিদারুণ দুঃখের দিনগুলি কাটান।

বেশীক্ষণ বসি না। এমন ভাবে বসে থাকায়, কথা বলায় তিনি কষ্ট বোধ করেন, দেখি। আবার অভিবাদন করে চলে আসি। কিন্তু, স্মৃতিপটে সেই মাতৃমূর্তির ম্লান অথচ মধুর ছবিখানি চিরতরে আঁকা হয়ে থাকে।

১৩

মাতা-মূর্তির মন্দির ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছি।

ওপারে বসুধারা দেখা যায়। ওরই কাছে মাতা-মূর্তির পতি ধর্মরাজের তপস্যাভূমি। কেউ বলে, অষ্টবসুরও সাধনাস্থল। পাহাড়ের বহু উপর থেকে এক জলধারা লাফিয়ে পড়ছে। প্রায় চার শত ফিট উঁচু থেকে। নামার পথে বাতাসের বেগে জলের রাশি অসংখ্য কণায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উড়ে যায়। সূর্যের আলো সেই বাষ্পমণ্ডলীতে প্রতিফলিত হলে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙের ছটা ফোটে।

মনে পড়ে, ক'বছর আগে ঐ জলধারার পাদমূলে বসে সেই স্বর্গীয় শোভা প্রাণভরে পান করেছিলাম।

আজ এপার দিয়ে যেতে পাহাড়ের বুকে সেই ধারার উচ্ছ্বাসধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনি।

আনন্দে চমকে উঠি—যেন অতি-প্রিয়জনের হঠাৎ-শোনা কণ্ঠস্বর।

বেশী চড়াই-উৎরাই এখনও আসে নি। তবে, অলকানন্দার বিস্তৃতি শীর্ণ হয়ে এসেছে। বাঁ দিকের গিরিশ্রেণীও অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে। এবার আর মাঠ-ক্ষেতের উপর দিয়ে পথ নয়। পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলেছি। বাঁ দিকে পাহাড়ের গা উঁচু দেওয়ালের মত উঠে গেছে, ডান-দিকে সোজা নেমে গেছে নদীর জলে। প্রায় চার পাঁচশো হাত নীচে। তবুও যাবার মত যথেষ্ট পথ আছে। তাই, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলি। একটা মোড় ঘুরে দেখি, উদয়সিংরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে। পিঠের উপর বোঝা নেই, কাছেও কোথাও রাখা নেই।

শিশিরবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার ক? এরা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে? মালও দেখছি না?

বিস্থা জানায়, সামনে একটু পরেই দেখবেন, পাহাড় একেবারে ধসে পড়ে আছে। 'বহুৎ খতরনাক্' জায়গা আছে। তাই, ওদের বলে দিয়েছিলাম, আগে গিয়ে সেই জায়গাটায় মালপত্র পার করে রেখে দিয়ে যেন ফিরে আসে। আপনাদের ওখানটায় যাবার সময় ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, স্থানটা একটু বিপৎসঙ্কুলই বটে।

পাহাড়ের মাথা থেকে প্রকাণ্ড একটা ধস নেমে সোজা নদীর মধ্যে পড়েছে। পার হতে হবে সোজাসুজিই। নীচে নামবার উপায় নেই, উপরে ওঠবারও পথ নেই। বিস্থা বলে, এ-জায়গা প্রতিবছরই ভাঙে, এবছরও ভেঙেছে। এইটুকুই সাবধানে পার হয়ে যেতে পারলে হলো —তারপর আর কোন ভয় নেই।

শিশিরবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, তাতো বুঝলাম। কিন্তু, এখানটা যাওয়া যাবে কি করে? পা রাখবার কোন জায়গাই তো দেখছি না। সোজা ভাঙা পাহাড়ের গা! ফসকালে একেবারে ঐ তো নীচে নদীর মধ্যে! বোধ হয় সাত আট শো ফিট হবে? কি বলেন?

বলবো আর কি?

বিস্থা সাবধান করে দেয়, ওদিকে তাকাবেন না। আসুন, হাত ধরাধরি করে পার করিয়ে দিই। শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। কোন ভয় নেই।

জানি, এটা ওর মুখের আশ্বাস বাণী নয়, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। বিপদ কোন কিছু ঘটবে না।

কেন জানি না, আমাদেরও মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোথা থেকে এই অগাধ নির্ভরতা আসে, কেনই বা আসে—তার উত্তর খুঁজে পাই না। মনে মনে শুধু বুঝি, যতো দুর্গমই হোক—সব পথ নিশ্চয় পার হয়ে যাবো।

যাই-ও তাই। কেমন করে আসি ঠিক বুঝি না। দেখি, সেই চার-পাঁচ শত হাতের ব্যবধান যে দুর্গমতার সৃষ্টি করেছে এরা কয়জনে যেন তার পারাপারের সেতু হয়ে দাঁড়ায়—সামনে, পেছনে, পাশে হাত ধরে—একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে পার হয়ে আসি। যেন লোফালুফি করে একটা বল এধার থেকে ওধারে নিয়ে গেল। মাটিতে পা ছিল বটে, কিন্তু পায়ের তলায় জোর ছিল না, বালি-

মাটি-পাথর ঝুরঝুর করে সরে পড়ে যাচ্ছিল। তবুও তারা তাদের নিজেদের পা এগিয়ে দিয়ে কেমন জোর করে রাখে, বলে, এরি ওপর পা রেখে নির্ভয়ে ভর দিয়ে চলুন,—আমার পায়ে কিছু লাগবে না—চলুন আপনি।—গিয়েছিও কোথাও তাই। তারা যে কেমন ভাবে নিজেরা দাঁড়িয়ে ছিল, বুঝলাম না।

বুঝি নি তখন। কিন্তু বুঝেছিলাম ফেরার সময়। তখন আর অমন দুর্গম মনে হয় নি, অতো সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় নি। ততদিনে এ-ধরণের ভাঙা পাহাড় দিয়ে চলা অভ্যাস হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতায় ও তাদের দেখে তখন শিখেছি—সেই ঝরা বালি-মাটি ও পাথরের উপর প্রথমে পায়ের জুতার চাপ দিয়ে কেমন পাটুকু রাখার মতো নির্ভরযোগ্য স্থান করে নেওয়া যায়, এক হাতে পাহাড়ের গা ধরে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা চলে। তাই ফেরবার পথে শুধু একজনই পাশে এসেছিল সতর্কতার জন্যে। পার হতে সময়ও লেগেছিল অল্প।

বেশ বুঝি, ভয় মাত্রেই মানসিক বিকার। অন্ধকারের ভয় আলোয় কেমন কেটে যায়!

লক্ষ্মীবন।

পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। কিছু আগে ছাড়িয়ে এসেছি—চমৎোলী। সেখানেও খানিকটা সমতল ক্ষেত্র, একটি গুহা। কিন্তু, আজ তাঁবু ফেলা হবে এইখানে—লক্ষ্মীবনে। বেলা থাকতে এসে পৌঁছেছি। সেই ভাঙা পথটুকু ছাড়া আর কোথাও দেরী হয় নি। চড়াইও পাই নি। শুনি, বদরীনাথ থেকে এসেছি আজ সাড়ে সাত মাইল।

লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করেছিলেন, তাই নাম—লক্ষ্মীবন। তপস্যা এখানে করুন বা না করুন, এই নামকরণের সার্থকতা আছে। বদরীনাথ ছাড়ার পর কোথাও গাছ নেই। চারদিকে শুধু পাহাড় ও পাথর। এইখানে এসে দেখি, অল্প নীচে—অলকানন্দার তীরে কতকগুলি গাছের ঝোপ। ভূর্জবৃক্ষের বন। সেখানটায় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভূর্জগাছের সাদা সাদা ডাল। এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে। রক্তাভ বল্কলগুলি রঙীন কাগজের মত ডালে ডালে আঁকড়ে রয়েছে, কোথাও বা খুলে ঝুলছে। একটু টানলেই পরতে পরতে পাক খুলে উঠে আসে। ছালগুলির গায়ে লাল ও সাদা রঙের বিচিত্র চিত্রণ—যেন শ্বেত ও রক্তচন্দনের ফোঁটা ছড়ানো। মনে পড়ে, ‘কুমার-

সম্ভবে'র বর্ণনা—'ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ'। বনের ছায়া ছুঁয়ে অলকানন্দার একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। জলস্রোতের কলকল ধ্বনি। গাছের শাখায় শাখায় পাখীদের কল-কাকলী। পরপারে তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। তারই একটির বুকে দীর্ঘ সরল শ্বেতরেখা। দূর-থেকে-দেখা বসুধারা। নীচের দিকে আবছায়া—বাতাসে উড়ে-যাওয়া জলকণার বাষ্পমণ্ডলী। যেন, শ্বেতবরণী দীর্ঘাঙ্গিনী সুর-সুন্দরী—সূক্ষ্ম-রেশমী-ঘাগরা-পরা!

চারিদিকে স্তব্ধ কঠোর গিরিশ্রেণী। তারি মধ্যে, চকিত চরণে নামে লক্ষ্মীশ্রী। শৈলকানন শোভিতা।

একটা পাথরের উপর আমরা দু'জন বসি। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ উড়ে আসে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামে। কন্‌কনে হওয়া ছোটে।

শিশিরবাবু চিন্তিত হয়ে বলেন, উদয়সিংদের দেখা নেই এখনো। মাল এসে পৌঁছুল না। তাঁবু খাটালে তার মধ্যে বসা যেতো।

বিষ্ণা ছুটে আসে। বলে, জলের মধ্যে বসে ভিজবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। উঠে চলুন। ঐ গুহার ভেতরটা পরিষ্কার করে এলাম—ঐখানে আপাততঃ বসবেন।

চারিদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো। তাদেরই ভেতর এখানে ওখানে চার পাঁচটি গুহা। খুব বড় না হলেও দু'তিনজন করে থাকা চলে। মাথা সোজা করে ভেতরে সব জায়গায় দাঁড়ানো সম্ভব না হলেও—স্বচ্ছন্দে বসে থাকা বা শোয়া যায়। গুহার মুখগুলি খোলা। অবস্থা বুঝে গুহার ব্যবস্থা করতে হয়—কোন্ দিক দিয়ে বাতাস বইছে, কোন্ গুহায় ঠাণ্ডা বাতাস বেশী ঢোকার আশঙ্কা; কোন্ গুহার মেঝে উঁচু-নীচু পাথরে অসমতল কম।

দেখে শুনেই একটি গুহার ভেতর বিষ্ণা পরিষ্কার করেছে। আমাদের একটা বর্ষাতি পেতেছে। বলে, এখন এখানে বসুন। মালপত্র এলে তাঁবু খাটানো যাবে। উদয়সিংরা মাঝপথে নিশ্চয় কোথাও বসে গেছে, নইলে এখনো দেখা নেই কেন? এসে বলবে, জিনিসপত্র পাছে ভিজে যায় তাই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা, ভেড়া-ছাগল চরাতে কোন গ্রামবাসীরা হয়তো এ-অঞ্চলে এসেছে—তাদেরই কোন দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসে গেছে ছিলিম খেতে!

আমরা বলি, তা থাক্। ঐ ভারী বোঝা নিয়ে চলা—কম কষ্ট নয় তো। আমরা খাসা আসছি খালি হাতে!

বিস্থা ঝোলা থেকে নিমকি, গজা বার করে দেয় ফ্লাস্ক থেকে জল ঢালে। আমরা দু'জনে খাই। তাকেও দিই।

শিশিরবাবু সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন, দেখুন, দেখুন ভাল্লুক নাকি?

ভাল্লুকের মতই বটে, তবে ভাল্লুক নয়। গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কুকুর। কালো রঙ্। গা-ভরা ঝাঁকড়া লোম। তিব্বতী মাষ্টিফ্! বাইরে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দেয়, সর্বাঙ্গ থেকে ফুলঝুরির মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর, বলা-কওয়া নেই, কোন সঙ্কোচ বা ভয় নেই, ভেতরে ঢুকে এসে বসে—একেবারে আমাদের গায়ে গা ঠেকিয়ে।

বিস্থা একটা পাথর তুলে তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দিতে যায়। কুকুরটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন আমাদের মায়া জাগে। অমন ভীষণ শরীর —দেখলে ভয় লাগার কথা। কিন্তু, মুখ তুলে যখন আমাদের দিকে তাকায়—দেখি, কি শান্ত চোখের দৃষ্টি! হিংস্রতার লেশমাত্র নেই। চোখের ভাষায়, যেন মনে হয়, বলে, এই যে তোমরা পৌঁছে গেছ? এসো, একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসা যাক্—উঃ! যা শীত!

শিশিরবাবু বলেন, এযে এসে বসলো—যেন কত কালের পরিচয়। কার কুকুর এটা—কোত্থেকে এলো? উদয়সিংদের কারো হবে নিশ্চয়?

বিস্থা বলে, কই তাদের সঙ্গে ত কোন কুকুর দেখি নি।

শিশিরবাবু বলেন, দাঁড়া, তোকেও কিছু খেতে দিই। বলে পকেট থেকে দু'টুকরা বিস্কুট বার করে দেন। কুকুরটি তখনি খায়। লম্বা লকলকে জিব বার করে নিজের পা চাটতে থাকে। আনন্দে লেজ নাড়ে। আমাদের মুখের পানে মুখ তুলে তাকায়। আরও নিবিড় হয়ে ঘেঁষে বসে। তারপর ছড়ানো সামনের পা দুটোর মধ্যে মাথা গুঁজে আরামে চোখ বোজে।

কৈলাস-মানস সরোবরের পথের একদিনের এক ঘটনা মনে আসে। সঙ্গে এক শ্রদ্ধেয় স্বামীজি ছিলেন। তিনি তার আগেও তিনবার কৈলাস ঘুরে এসেছেন। অনেক বছর ঐ হিমালয় অঞ্চলে কাটিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস। হিমালয়ের সেই দুর্গম পথে তার প্রমাণও পাই। অবাক হয়ে দেখি, ছোট্ট এতোটুকু মানুষ, কিন্তু মনের কি জোর! হঠাৎ একদিন তাঁরই মধ্যে আর এক চেহারা দেখলাম। সেদিন পথের ধারে তিব্বতীদের একটা তাঁবুর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের ভীষণাকার

কুকুরটা চীৎকার করে ছুটে এলো। সকলেই ভয় পেলাম। পাবারই কথা। তবু, তারই মধ্যে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে লাঠি উঁচিয়ে আমরা পার হয়ে এলাম। স্বামীজি, কিন্তু, কোনমতেই এলেন না। আমাদের তিব্বতী গাইডকে দিয়ে কুকুরটাকে পথের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে তবে এলেন। সেদিন হঠাৎ তাঁর মুখে ভয়ের পাণ্ডুর ছায়া দেখেছিলাম—ছোট ছেলের ভয় পাওয়ার মতো। আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনি, একবার তাঁকে কুকুরে কামড়েছিল ; তাই এই অতি-সতর্কতা।

ভয় জাগে এমনি ভাবেই। পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

বৃষ্টি থেমেছে। ফোঁটা কয়েক পড়েই বন্ধ হয়েছে। উদয় সিংরা এসে পৌঁছয়। বিষ্টা এরি মধ্যে গুহার কাছে একটু জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছিল। দেখতে দেখতে সেখানে তাঁবু পড়ে। তাঁবুর তিনদিক মাটির ভেতর গুঁজে দেওয়া হয়। তারপর, তাঁবু ঘিরে চারপাশে বিঘত-খানেক নীচু ছোট্ট পরিখামতো কাটা হয়। বিষ্টা বলে, এ-সব জায়গায় ঠিক নেই—যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। তাঁবুর গায়ের জল ঐ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে চলি রান্নামহলে। একটি স্বতন্ত্র গুহায় উনুন জ্বালার ব্যবস্থা হয়েছে। উদয় সিং কতকগুলা শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলেছে। রতনসিং এসে ঢোকে। কাঁধের উপর কেরোসিন্ তেলের একটা টিন। কিছুদূরের ঝরণা থেকে খাবার জল ভরে এনেছে।

শিশিরবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, টিন-এ তেলের গন্ধ নেই তো ?

বিষ্টা হেসে জানায়, বদরীনাথ থেকে আনার আগে ভাল করে ধুইয়ে এনেছি।

পান সিং আসে। কাঁধের উপর একরাশ শুকনো কাঠ, ডালপালা। সত্যই তো! এখানে যখন কাঠ পাওয়া যায়, অযথা কয়লা খরচ করে লাভ কি ?

নাম-ভোলা ছোকরাটি একটা কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসে। উদয় সিং-এর হাতে এগিয়ে দেয়। উদয় সিং তামাকু খেতে বসে। সর্দারের হাত থেকে অন্য সকলে প্রসাদ পাবে।

উনানের উপর চায়ের প্রকাণ্ড কেটলি চাপে। চা তৈরী হলে সবাই মিলে চা খাই।—তাঁবুতে ফিরে এসে আবার এক কাপ করে চেয়ে পাঠাই। আনতে আনতেই জুড়িয়ে যায়।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শিশিরবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো! কুকুরটার কথা জিজ্ঞাসা করা হোল না?

বিষ্টা বলে, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের কারো নয়। হয়তো কাছাকাছি ভেড়া ছাগল চরাতে কেউ এসেছে—ফিরে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে।

সন্ধ্যার মধ্যেই খাওয়া সারা। বাইরে কন্‌কনে শীত। তাঁবুর দরজা ভালভাবে বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। কোনদিকে বাতাস ঢোকার যেন ছিদ্র পর্যন্ত না থাকে। দিব্য আরামে রাত কাটে। তাঁবুর মধ্যে তেমন শীত বোধ হয় না।

ভোর হয়েছে। শিশিরবাবু তাঁবুর বাইরে গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে! তুই এখানে শুয়ে! সারারাত এই শীতের মধ্যে!

জিজ্ঞাসা করি, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?

শিশিরবাবু বলেন, সেই কুকুরটা! তাঁবুর দরজার বাইরে সারারাত শুয়ে ছিল। গায়ের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো জলের কণা জমে গেছে দেখছি।

কুকুরটা গা ঝাড়া দেয়। শব্দ পাই।

শিশিরবাবুর গলা শুনি, আরে! আবার আমার সঙ্গে চললি কোথায় এখন?—আচ্ছা আয়।—চেঁচিয়ে আমাকে বলেন, মহাপ্রস্থানের পথ। একটা কুকুর সঙ্গে না থাকলে যাত্রা পূর্ণাঙ্গ হোত না। এ চমৎকার হোল।

দশটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁবু তুলে আবার যাত্রা।

এসব অঞ্চলে রোদের তত তেজ নেই। তাই, আহারের পাট চুকিয়ে সারাদিন হাঁটার নিয়ম,—তাতে যতদূর যাওয়া যায়। দিনের মধ্যে আবার জিনিসপত্র খোলা, তাঁবু খাটানো—এ সকলের হাঙ্গামা থাকে না। লম্বা একটানা সময় হাতে থাকে। যেন, ছেলেদের হাতে লাটাই-ভরা সুতো। সুতো খোলে, ঘুড়ি আকাশে উঠতে থাকে,—বাতাস থাকলেই হোল। এখানে চলার দম ও মনের জোর থাকলেই হোল।

লক্ষ্মীবন ছাড়ার আগে একটা গুহার মধ্যে কিছু আলু ও কাঠ কয়লা রেখে আসা হয়, মাটি ও পাথর চাপা দিয়ে। ফেরবার পথে এখানে কাজে লাগবে।

উদয় সিং-এরই এটা পরামর্শ,—মিথ্যে কেন এ ক'দিন বয়ে নিয়ে যাওয়া, আবার এখানে ফিরিয়ে আনা? ফেরার পথে যেখানে যা লাগবে, যাবার সময় সেখানে তা রেখে যাবো।

শিশিরবাবু ভাণ্ডারী। তাই, সতর্কতা আছে। জিজ্ঞাসা করেন, লোকসান যাবার ভয় নেই?

সকলে আশ্চর্য হয়। বলে, নেবে কে? আর অন্যের জিনিস ছোঁবেই বা কেন? অসম্ভব!

ভাবি, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সম্ভব-অসম্ভবের ধারণা কেমন গড়ে ওঠে। শহর হলে বলতে হোত, এ-ভাবে ফেলে রেখে যাওয়া, ফিরে এসে পাওয়া—অসম্ভব!

অলকানন্দার কিছু উপর দিয়ে চলেছি। সামনেই দেখছি, নদী আবার বাঁ দিকে পাহাড়ের আড়ালে ঘুরে গেছে। সেইদিকে অলকানন্দার হিমবাহ (glacier) শুরু। বদরীনাথ ছাড়ার পর ঘোড়ার খুরের আকারে নদীর গতিপথ বেঁকে গেছে। বদরীনাথে নারায়ণ পর্বত ও নীলকণ্ঠ শিখর—মন্দিরের পিছনে দেখা যায়। আমাদের এখানেও যেতে হবে সেই সব পাহাড়েরই পাশ দিয়ে, তবে অপর দিকের অংশ বাঁ হাতে রেখে। অর্থাৎ, নীলকণ্ঠ শিখরকে অর্দ্ধ পরিক্রমা করা হবে।

বাঁকের কাছে সামনে থেকে আর একটি প্রশস্ত হিমবাহ এসে অলকানন্দার হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে। ভগীরথ খরগ্।

বহুদূরে সেই হিমবাহের শেষভাগে বরফের চূড়া দেখা যায়। শুনেছি, ঐ হিমবাহ ধরে গেলে পাঁচ-ছয় দিনে গোমুখে পৌঁছানো যায়। দুর্গম বরফের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে সে পথ। ঐ তুষার-শিখর ও হিমবাহগুলি থেকে অপর দিকে নেমে যাওয়া ধারাগুলি ভাগীরথী-গঙ্গার উৎস, আর এদিকে নেমে-আসা ধারাগুলি অলকানন্দা-গঙ্গার নদীরূপ সৃষ্টি করছে।

সেই দুই বিরাট হিমবাহের সঙ্গমস্থলে এসে পৌঁছুই। নদীর স্বচ্ছ নীল জলের চিহ্ন মেলে না। দুই দিকেই ছড়ানো ভাঙা পাথর ও ধুলা-মাটি-বালি-মাখা বরফের স্তূপ। হিমবাহ দু'টিকে দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন, রক্তহীন, বিবর্ণ দুই বাহুর মিলন। হাতে হাত মিলিয়ে দুই বিশাল কঙ্কালের মত পড়ে আছে। তারি মধ্যে কোথাও বা গলে-যাওয়া বরফের ফাঁকে আঁধার-ভরা

গহ্বর। যেন, কঙ্কালের দৃষ্টিহারা চোখের শূন্য কোটর। দয়ামায়াহীন মরণোত্তর এক জগতের সঙ্কেত দেয়।

বিস্তার ডাকে চমক ভাঙে।

অলকানন্দার অপর পারে—হিমবাহ-সঙ্গমের কিছু আগে—দু'টি গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত একটি পার্বত্যনদীর উপত্যকার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, ঐ ওদিকে দেখুন অলকাপুরী।

অলকাপুরী! নাম শুনেই মনে পুলক জাগে। মন-ভরা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে উৎসুক দৃষ্টি দিই।

এপার থেকে দেখি গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে একটি ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী শৈল-সোপান বেয়ে সর্পিল গতিতে নেমে এসেছে—অলকানন্দায় আত্মবিসর্জন দিতে। বহু দূরে উপত্যকার শেষ সীমায় তুষারশীর্ষ গিরিশিখর। সুনীল আকাশের পটে শ্বেত পাথরে গড়া মন্দির চূড়ার যেন আকৃতি আঁকে। তারই উপর একখণ্ড সাদা মেঘ যেন পতাকা উড়ায়। তখনি মনে আসে কবির বর্ণনা—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরেষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র।
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য॥

ভাবি, ঐ কি সেই মেঘদূত? কবির কাব্য-সুধার সিঞ্চনে অমর হয়ে এখনও ওখানে বিরাজ করে? দেখি, শিখর ঘিরে নিম্নদেশ থেকে ধোঁয়ার মতে কুয়াসার কুণ্ডলী ওঠে। মনে হয়, 'বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌত হর্ম্য'গুলিতে বুঝি ধূপধুনার আরতি শুরু হল!

ঐ কি সুমুখে—হংসদ্বার?—'ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।'

ঐ পথেই কি বলাকাসারি উড়ে চলে মানস সরোবরে? প্রকৃতই তো, এরই অল্প দূরে মানা-গিরিসঙ্কট। এখনও মানসে যাবার সেও এক পথ।

ঐ ক্ষীণধারা নির্ঝরিণীর উর্ধ্বগতি রেখাপথ কোথায় নিয়ে যায়? সত্যই কি সেই অলকাপুরীতে?

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ।

যেখানে শুধু আনন্দেই নয়নে অশ্রু ঝরায়। অন্য কোন কারণে নয়। যেখানে কুসুম শরেই শুধু মনস্তাপ জাগায়। অন্য কোন সন্তাপে নয়।

প্রকৃতই কি ওখানে:

যত্রোন্মত্ত ভ্রমরনিকরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

কবি কালিদাসের অমর অলকাপুরী! ধনপতি কুবেরের অক্ষয় সুখ-সম্পদ। অতুল রূপরাশি। বিরহী যক্ষের বিচ্ছেদ-ক্রন্দনের অশ্রুবাষ্পভরা।

সেই অলকাপুরীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আজ মনে মনে আবার 'মেঘদূতে'র স্তুতি করি।

অকস্মাৎ অন্তরের অন্তঃপুরে গোপন দৃষ্টি পড়ে। সাশ্চর্যে দেখি, কোথায় সেই 'মেঘদূতে'র আনন্দ-দ্যুতি! এতদিন সেই কাব্যের মধুর ঝঙ্কার ও অমৃত রস যে-মনে অসীম আনন্দের সঞ্চার করেছে, আজ সে-মনের সন্ধান পাই না।

সেই মহাকাব্যের 'নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া' আজ মনে কোন মায়ার জাল বোনে না। অন্তরে সেখানে মাথা তুলে বসে এক গৃহত্যাগী মন। সম্মুখে শিব-সুন্দরের শ্মশানক্ষেত্রের দিকে সে উন্মুখ নয়নে চেয়ে আছে। পাষাণ-হৃদয় হিমালয়ের কঠিন-কঠোর রূপ তাকে আকৃষ্ট করে। কামনার মোক্ষধাম—সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি—সেই অলকাপুরী এখন তার নয়নে কবিকল্পনার অঞ্জন মাখায় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভোগ, মণি-মাণিক্যের চাকচিক্য—ক্ষুদ্রমানবের বিরহ-মিলনের মহান গীতিকাব্য,—সে যে 'শুধু স্বপ্ন ক্ষণপ্রভ'।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ আজ মহাপ্রস্থানের পথ। সেই হিমবাহের শ্মশানভূমির দিকে ধীরে ধীরে মন এগিয়ে চলে। 'মেঘদূতে'র মধুর সুর আজ আমার জীবনে প্রথম সুর হারায়।

১৪

অলকানন্দার হিমবাহে এসে পৌঁছেছি।

পথের উপরের বরফ এখন এখানে অনেক জায়গায় গলে গেছে। তবে চারিদিকে বরফের পাহাড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন, এখনি তুষার-স্তূপ নামিয়ে দিয়ে আবার সব ভরিয়ে দিতে পারে—এমনি উদ্ধত রুদ্রভাব।

বরফের খোলস ছেড়ে এখানে-ওখানে চারপাশে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি পাথর। নানান আকারের। বিচিত্র বর্ণের।

এখানকার পাথরগুলির আকার, রঙ্ ও রেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশের পাথরগুলির মতো এদের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা নেই ; —নিষ্প্রভ রুক্ষ শুষ্ক। দেখেই বোঝা যায়, তুষার-আবরণ এদের অভ্যস্ত জীবন। হিমরাজ্যের অধিবাসী বলে যেন আভিজাত্য প্রকাশ করে। মুক্ত রৌদ্র-বাতাসের স্পর্শ তাদের চমক লাগায়। আশেপাশে বরফ-গলা জলের ধারা কল্‌কল্ রবে হেসে ওঠে। তাদের ঘিরে ঘিরে জলের স্রোত ছুটে চলে। এঁকেবেঁকে—ছলছল শব্দ তুলে—পাথরের উপর থেকে পাথরে লাফিয়ে।

আমরাও চলি পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, ধারাগুলির পাশ দিয়ে। পায়ের জুতা যথাসম্ভব জল থেকে বাঁচিয়ে।

পথ-রেখা নেই। যেখান দিয়ে কোন রকমে যাওয়া যায়—সেইখান দিয়ে যাই, সেই আমাদের পথ। শুধু গন্তব্য-স্থানের দিকে দৃষ্টি আছে। বিষ্টা আঙুল দিয়ে দেখায়, ওই ! ঐদিকে আজ আমাদের তাঁবু পড়বে।

কিন্তু পথ-দেখানোর অন্য লোকের আমাদের প্রয়োজন নেই।

সেই কুকুরটিই এগিয়ে চলেছে। পথ দেখিয়ে। খানিকটা ছুটে যায়। দাঁড়ায়। পিছনে ফিরে তাকায়। ঠিক আসছি দেখে আনন্দে লেজ নাড়ে। আবার এগিয়ে চলে। আবার দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়। পেছিয়ে পড়েছি দেখে ছুটে ফিরে আসে কাছে। কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলে। আবার এগিয়ে যায়।

পথ জুড়ে বড় বড় পাথর পড়ে। হাতে ভর দিয়ে একটা পাথরের উপর উঠে আর একটা পাথরে ডিঙিয়ে চলি।

কুকুরটা অক্লেশে পাশের একটা বড় পাথরের উপর উঠে মাথা বেঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা নির্বিঘ্নে পার হলে সে ছুটে নেমে আসে। লেজ নাড়তে নাড়তে হেলে দুলে আবার এগিয়ে চলে।

শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, সাধে কি আর অত ওকে খাওয়াচ্ছি ! ধর্ম ! চলে আয়, দুটো বিস্কুট খেয়ে যা।

হেসে বলি, ঘুষ দিয়ে ধর্ম রাখার চেষ্টা হচ্ছে তো ? কিন্তু আশ্চর্য ! কুকুরটা এল কোত্থেকে ? আমাদের সঙ্গেই তো চলল দেখছি।

ধর্ম কিন্তু বিস্কুটের লোভে আসে না। চুপ করে দাঁড়িয়েছে। কান খাড়া। একদৃষ্টে একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে।

শিশিরবাবু বলেন, হল কি ওর ? অমন করে দেখছে কি ?

হঠাৎ তীরবেগে কুকুরটা ছুটে যায়।

ওর গতিপথ লক্ষ্য করে দেখি, অনতিদূরে ধূসর রঙের খরগোশ। মানস-সরোবরের পথেও ঐ ধরণের দেখেছিলাম। পর্বত-মূষিক শ্রেণীর। হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু লেজ নেই। কুকুরটার দিকে সেও মুখ তুলে তাকিয়ে 'আছে। লম্বা দু' কান সোজা করে। অবাক দৃষ্টিতে। কুকুরটাকে হঠাৎ ছুটতে দেখে তার একাগ্রতা ভাঙে। স্প্রিংএর মত লাফাতে লাফাতে সেও ছোটে, দুটো পাথরের মাঝখানে একটা গর্তে ঢুকে যায়। কুকুরটা সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক শুঁকতে থাকে, সামনের পা দুটো দিয়ে মাটি-বালি খোঁড়ে।

শিশিরবাবু ডাক দেন, ধর্ম! খুব হয়েছে, চলে আয় এদিকে। নিরীহ নিরামিষাশী একটা প্রাণী—আর তাকেই তুমি গেলে তাড়া করে! তোমার এখানেও সেই স্বভাব!

হেসে বলি, ভুলে গেলেন হিতোপদেশের শ্লোকটা—'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা সঃ কিং নাশ্নাত্যুপানহম্?'

কুকুরটা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরে আসে। লজ্জায় নয়, বোধ করি বিফলতার বিষণ্ণতায়। আবার পথ দেখিয়ে চলে। আমরাও এগিয়ে চলি। ফিরে দেখি, সেই পাথরটার কাছে খরগোশটা আবার বেরিয়েছে, পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে বসেছে, সামনের পা দুটো তুলে নাড়ছে, কানও নাচছে!

শিশিরবাবু বলেন, কুকুরটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে!

কিছুক্ষণ থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ পাচ্ছিলাম। এবার তার কারণ বুঝলাম।

বাঁদিকে নীলকণ্ঠ পর্বত। তারই অঙ্গ বেয়ে বহু ধারা নেমেছে। দীর্ঘদিন যে তুষাররাশি পর্বতের অঙ্গীভূত হয়ে স্থির ও স্তব্ধ ছিল, গ্রীষ্মের খরতাপ সূর্যের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে সেই নির্ঝরিণীদের নিদ্রা ভেঙেছে।

আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের মাথা থেকে ধারাগুলি ধেয়ে নামে ধরণীর বুকে। মুক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে। স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয় শতভাগে বিদীর্ণ করে তারা ছুটে চলে শ্যামল ধরিত্রীর দিকে, পৃথিবীর মানুষের আশা মেটাতে—ক্ষুধার অন্নের ভাণ্ডার ভরাতে, তৃষ্ণার সুশীতল বারি পাত্র হাতে!

পথে দেখে এসেছি বসুধারা, একটি ধারামাত্র। তারই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। এখানে দেখি বহুধারা।

নামও শুনি—সহস্রধারা।

সামনেই পাঁচটি বড় বড় প্রপাত চোখে পড়ে। ভাবি, পুরাণ-কথিত এই কি পঞ্চধারা তীর্থ? বদরীনারায়ণ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনায় হিমগিরির নৈঋর্ত দিগ্‌ভাগে অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে। তীর্থগুলির নামকরণও আছে—প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষ ও কুরুক্ষেত্র। ভগবানের আদেশে এই পঞ্চতীর্থের দেবতারা এইখানে তপস্যা করেন, শুনি।

সেই ধারাগুলি নেমে যেখানে নদীর আকারে বয়ে চলেছে, সেখানে পৌঁছুলাম। ওপারে যেতে হবে। পুল নেই। প্রয়োজনও নেই। কেন না, জলের গভীরতা নেই। সমতলভূমিতে জলস্রোতগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছোটায় খুব বেশী টানও নেই। তবে, তুষারগলা জল,—মনে হয়, বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা। যেমন রৌদ্রের চেয়ে রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ অসহ্য মনে হয়।

জুতা মোজা খুলে পার হই। শিশিরবাবুও প্রস্তুত হন। রতনসিং ছুটে আসে। বলে, আপনার ওসব খুলতে হবে না—পিঠে করে পার করিয়ে দিচ্ছি।

শিশিরবাবু আপত্তি করেন। বলেন, দরকার নেই কোন।

রতনসিং শোনে না। উদয়সিং ও পানসিংও আসে। রতনসিং ও পানসিংএর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়—কে বয়ে নিয়ে যাবে। উদয়সিং হুকুম দেয়, রতনসিং নিয়ে যাবে, ওই প্রথম এসেছে। শিশিরবাবুকে বলে, আপনি চুপ করে বসুন, কষ্ট করবেন না। এরা রয়েছে কিসের জন্যে?

রতনসিং টপ করে তাঁকে তুলে নেয়। যেন, ছোট একটা ছেলেকে নিচ্ছে। পিঠে নিয়ে জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে চলে। শিশিরবাবু হেসে চেঁচাতে থাকেন, আরে বাবা! ফেলে দিবি, ফেলে দিবি! করছিস কি?

সবাই হেসে ওঠে।

নাম-ভোলা সে-ছেলেটি ওপারে একটা পাথরের উপর বসে পা দোলাচ্ছে। ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে জলে ফেলছে। সেও এদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

ওপারে গিয়ে সামান্য চড়াই। তারপর আবার উঁচুনীচু পথ-চলা। অল্প বৃষ্টি নামে। তার মধ্যেই বর্ষাতি-কোট-গায়ে চলি। দেখতে দেখতে কোথা থেকে ঘনঘটা করে মেঘ আসে। জোরে জল নামে। পথের পাশে ছোট্ট এক গুহায় আশ্রয় নিই। হু-হু করে বাতাস ঢোকে। কন্‌কনে শীত। পা নাচাই, হাতে হাত ঘষি। পকেট থেকে দস্তানা বার করে হাতে লাগাই।

বিত্তাকে বলেছিলাম, বদরীনাথ থেকে কয়েক প্যাকেট বিড়ি-সিগারেট যেন সঙ্গে আনে। জানি, পথের মধ্যে পেলে উদয়সিংরা খুশী হবে খুব।

বিত্তা বার করে তাদের দেয়। আনন্দে তাদের মুখ ভরে ওঠে। যেন, কি অমূল্য সম্পদ পেল। তখনি ধরিয়ে টানতে থাকে। আমাদের সঙ্গে এ-পথের সম্বন্ধে নানান্ গল্প করে। প্রাণ খুলে কথা কয়। নিঃসঙ্কোচে। যেন কত দিনের বন্ধু সব।

বিত্তাও সিগারেট ধরায়। সঙ্কোচ ভরে। ওরই মধ্যে যথাসম্ভব আড়াল রেখে টানে।

মানুষে মানুষে সরল মিলনের যে সহজ সুন্দর রূপ, পাহাড়ী হলেও চাপরাসের চাপে সে তা হারিয়ে ফেলেছে।

এইবার সেই শিরদাঁড়া পথ শুরু হল! ইংরাজি ভাষায় Rajor-edged ridge।

মানুষের শিরদাঁড়ার মত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতিকায় যে-সব জীবজন্তু ছিল—যাদের কঙ্কাল এখন যাদুঘরে রক্ষিত হয়ে বিস্ময় জাগায়—তাদেরই মধ্যে ডাইনোস্যর (Dinosaur)-এর শিরদাঁড়ার মত। সেই বিরাটকায় জীবের আকার বহু সহস্র গুণ করলে যত প্রকাণ্ড হয়—সেই রকমই এক প্রাণীর কঙ্কাল যেন দুই দিকের গিরিশ্রেণীর মাঝখানে দীর্ঘাকারে শায়িত আছে। তারি উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। একটা সরু লাইনের উপর দিয়ে চলা। দুই দিকেই পাহাড়ের ঢালু গা। নীচে তিন-চারশ ফিট সোজা নেমে গেছে। কোন রকমে ভার সামলে চলি। কোথাও সামনে পথ জুড়ে পাথরের স্তূপ—এগিয়ে যাবার উপায় দেখি না। বিত্তার হাত ধরে এক পাশের সেই ঢালু গায়ের উপর কোন রকমে পা রেখে পার হই। যদি হঠাৎ পদস্খলন হয়—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি। বিত্তা বলে ওঠে, ওদিক তাকাবেন না—শুধু পা-টুকুর ওপর নজর রেখে পা ফেলুন।

ভাবি, এ কি অর্জুনের অস্ত্র-শিক্ষার একাগ্রতার কথা! গাছ নয়, ডাল নয়, পাতা নয়—শুধু পাখী; তারও আবার কেবল চোখটুকু দেখা! 'অন্য দিকে দেখো না'—কথাগুলি বলা তো সহজ। কিন্তু না তাকিয়ে উপায় কই? চোখের দৃষ্টি কে যেন সজোরে টেনে নিয়ে যায়। দেখি, বহু নীচে মাটি বালি—ছোট বড় পাথরে-ভরা রুক্ষ কর্কশ ধরিত্রীর দেহ। মাঝে মাঝে

বিদীর্ণ হয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, উপরের মাটি-বালির আস্তরণের অভ্যন্তরে সাদা বরফের স্তর,—কোথাও বা সেই সব তুষার গলে জলের ধারা বার হচ্ছে। সুন্দরী প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা নয়—মৃত্যু-মলিন হিমশীতল শ্মশান-ক্ষেত্রে যেন এক বিকৃত শবদেহ পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শাণিত অস্ত্রে কে যেন কেটে কেটে রেখে গেছে—ক্ষতদেহের অভ্যন্তরে বিবর্ণ সাদা সাদা মেদ-মজ্জার কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে!

মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। কিন্তু তবুও এই ভয়াবহ পথে, কেন জানি না, মনে মরণের ভয় জাগে না। কেমন এক নির্বিকার নিশ্চিন্ত অনুভূতি। দয়া মায়া স্নেহ—মানব মনের কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। চারিদিকের আকাশচুম্বী তুষার-শিখরগুলির মহান্ সৌম্য দ্যুতি,—জটাধারী নগাধিরাজের ধ্যানগম্ভীর বিরাট স্তব্ধ মূর্তি মনের ভিতর এক অপার্থিব ভাব আনে। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ মনে হয়। আত্ম-পরের ভেদ ঘোচে। মনে ভয়-ভাবনার লেশ থাকে না। অন্তরে বাইরে যেদিকে তাকাই সবই মনে হয় বিরাট এক শক্তির অংশমাত্র। ক্ষুদ্র মানব সেখানে অতি নগণ্য অণু পরমাণু মাত্র। তার বাঁচা মরা—হিমালয়ের অঙ্গে ধূলিকণার থাকা না থাকার মতনই—অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

মনে পড়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা। কারও কারও মতে এই পথেই না গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানে? মহাভারতকারের বর্ণনা—"দুঃসহোগ্রদুঃখগ্রস্ত" পাণ্ডবগণ। "ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ।" মহাগিরি হিমবন্তের এই তুষার রাজ্যে এসে তাঁরা দেখেন—"মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্।" দুর্গম পথে সবাই চলেছিলেন সারি বেঁধে—'যোগযুক্তা'—'যোগধর্মী'। অকস্মাৎ পশ্চাতে দ্রৌপদীর পতন ঘটল। ধ্যান থেকে স্খলিতমানস হয়ে। "যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।"

বিমর্ষ সন্ত্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ধর্মরাজ দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে চলেন। একে একে প্রিয় ভ্রাতাদেরও পতন হয়। তবুও যুধিষ্ঠির নির্বিকার। পিছন ফিরে তাকান না। ফিরে তাকানো? সে তো স্বর্গান্তরায়রূপ স্নেহেরই নিদর্শন! সে-স্নেহের বন্ধন মুক্ত হয়েই তো স্বর্গপথে তিনি চলেছেন।

রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের মনে যে এই নির্বিকার স্নেহ-শূন্য ভাবের আবির্ভাব অসম্ভব নয়—মনে মনে আজ স্পষ্ট অনুভব করি।

শুধু সেই মহাভারতীয় যুগের কাহিনীই নয়; মনে পড়ে বদরীনাথে সেই বৃদ্ধ স্বামীজির মুখে শোনা গল্প—উত্তরপ্রদেশবাসী সেই যাত্রীটির কথা। এই-খানেই না তাঁর সঙ্গিনী সহধর্মিণীর পতন সত্বেও ফিরে তাকান নি! এখন ভাবি, হয়তো সেও সত্য হবে।

এই সূত্রে আর একটি আধুনিক ঘটনাও মনে আসে।

হিমালয়ে নয়। হাওড়া স্টেশনে। একটি পশ্চিমগামী ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। তারই এক কামরায় বসে এক সাধু যাত্রী। দু'টি যুবক তাঁর দর্শনে এসেছে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে থেকে সহযাত্রীরা বুঝতে পারেন, ছেলে দু'টি দূর থেকে স্টেশনে এসেছে শুধু তাঁরই সঙ্গে, তাঁর যাবার পথে দেখা করতে। শেষ সময় পর্যন্ত তারা বসে থাকে,—যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকা যায়! ঘণ্টা বাজে। ট্রেন ছাড়ে। অন্য যাত্রীরা তাদের নেমে যেতে তাগাদা দেয়। চলন্ত গাড়ি থেকে তারা লাফিয়ে নামে। তাদেরই একজনের অকস্মাৎ বিপদ ঘটে। নামতে গিয়ে পড়ে যায়। চারিদিকে আতঙ্কিত রব ওঠে। যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেন থামায়। লোকজন ছোটে। ভিড় জমে। যে যেমন পারে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। স্ট্রেচার আসে। তার অচৈতন্য দেহখানি নিয়ে চলে যায়। আবার ট্রেন ছাড়ে। সকলের এত উত্তেজনা, এত করুণ কলরব,—কিন্তু সাধুটির অদ্ভুত আচরণ! সম্পূর্ণ নির্বিকার,—নীরব, নিশ্চল। একবারও নিজের স্থান ছেড়ে নড়েন নি—জানলা দিয়ে তাকিয়েও দেখেন নি। সারাক্ষণই স্থির হয়ে বসেছিলেন। ট্রেন ছাড়লে বিক্ষুব্ধ সহযাত্রীরা তাঁকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করতে থাকে। তাঁকেই তো দেখতে আসার জন্যে ছেলেটির এই বিপত্তি, অথচ এ কী তাঁর অমানুষিক আচরণ! 'গেরুয়াধারী ভণ্ড সন্ন্যাসী!'

সাধু তাতেও নির্বিকার। প্রতিবাদ করেন না। কোন কথাও বলেন না। মুখমণ্ডলে অন্য কোন ভাবও প্রকাশ পায় না। প্রশান্ত আত্মভোলা মূর্তি!

মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়িয়ে মহাভারতের সেই কাহিনীর ও আধুনিক যুগের এই ঘটনাগুলির উপর নতুন আলোকপাত হয়।

এই আলোকের প্রকৃত স্বরূপ কি, কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে—সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শুধু বুঝি, জগতের সব কিছু দেখার গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। মনে হয় যেন এতদিন সিনেমা-হল্-এর অন্ধকার ঘরে কৃত্রিম আলোকে রুপালী পর্দার উপর মানুষের চলন্ত ছবি দেখছিলাম।

হঠাৎ যেন চারিদিকের বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়ে দিনের শুভ্র আলোয় ঘর ভরিয়ে দিল। সিনেমার সেই সব উজ্জ্বল জীবন্তপ্রায় মূর্তিগুলি সে-আলোয় বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল, পটের উপর সুন্দর দৃশ্যাবলী তাদের পরিপ্রেক্ষিত (perspective) হারিয়ে ফেলল। যাদের মনে হচ্ছিল যেন সজীব মানুষ—এখন দিনের তীব্র আলোক নির্মমভাবে প্রকাশ করে তাদের অলীক রূপ, মিথ্যা পরিবেশ। শুধু চিত্র মাত্র,—মায়ায় রচিত সংসার-মঞ্চে সুসজ্জিত নটনটীর অভিনয়। ক্ষণিকের কপট মান-অভিমান, দু' দিনের অলীক স্নেহ-ভালবাসা।

এ কার আলো? কিসের আলো?—তাই ভাবি।

১৫

বিকেলে এসে পৌঁছুলাম চক্রতীর্থে।

ঘণ্টা পাঁচ-ছয় চলেছি। ভাবলাম, কয়েক মাইল নিশ্চয় এগিয়েছি। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হই,—নন্দীবন থেকে মাত্র পাঁচ মাইল! এত ধীরে ধীরে সাবধানে চলা! অলক্ষ্যে সময় কেটেছে, পথ এগোয় নি। তাতে ক্ষতি নেই। ধীরে সুস্থে যাব, ঠিক আছে। হাতে সময়ের টানাটানি নেই।

সার্ভের ম্যাপ্-এ এ-স্থানটির নাম লেখা আছে মাজ্না। গ্রাম নেই, কোন বসতিও নেই। মাজ্না নামের অর্থ জানি না। কিন্তু চক্রতীর্থ-নামকরণের ব্যাখ্যা শুনি।

চারিদিকে আকাশচুম্বী তুষার-কিরীট গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে প্রায় চক্রাকারে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। মনে হয়, পাহাড়ে ঘেরা যেন গোলাকার বৃহৎ হ্রদ ছিল—এখন শুকিয়ে গিয়ে পাথর-বিছানো ময়দান-রূপে পড়ে আছে। তারই বুকে দু'একটা ঝরণার ধারা এখনও এঁকে বেঁকে চলেছে।

চক্রতীর্থ নামের পৌরাণিক কাহিনীরও প্রচলন আছে। নারায়ণ যখন যোগাসনে বসেন, এইখানে তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখেছিলেন। আবার শুনি, অর্জুন এই পুণ্যতীর্থে তপস্যা করে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন।

প্রান্তরের একটু উপরে রাশীকৃত পাথরের মধ্যে কয়েকটি গুহা। তারই কাছে তাঁবু ফেলা হয়। একটা পাথরের উপর বসে গরম চা পান করি। তুষার-শিখরগুলির উপর অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পড়ে। বিচিত্র বর্ণের ছটা ফোটে। দেখে মনে রঙের পরশ লাগে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। আকাশের লাল আলো ম্লান হয়। বাতাসের হিমস্পর্শ শিহরণ জাগায়। তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। ভেতরে ছোট লণ্ঠন জ্বলে। সেই লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলো তাঁবুর ছোট্ট দরজার মুখে দিনের নিবে-আসা শেষ আলোটুকুকে বাইরে ঠেলে দেয়। বাইরে মনে হয় গাঢ় আঁধার, তারই মধ্যে পাহাড়ের আরো-কালো বিকট বিশাল দেহ। হঠাৎ সেই পাহাড়ের মাথায় ফুটে ওঠে সাথী-হারা একটি মাত্র তারা। জ্বল্ জ্বল্ করে কাঁপতে থাকে। মনে করিয়ে দেয় একচক্ষু দানব স.ইক্লোপের ভয়াবহ দৃষ্টি!

তাঁবুর বাইরে ও ভেতরে বসে মনের এ কি পরিবর্তন!

খাওয়া দাওয়া শেষ.করে কম্বল-শয্যা নিই।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনি। শিশিরবাবু বলে ওঠেন, তাই-তো! বৃষ্টি শুরু হবে নাকি? সন্ধ্যেবেলায় আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল—এত মেঘ এরই মধ্যে জমল কোত্থেকে?

কিন্তু, আশ্চর্য! তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ার কোন রকম শব্দ শুনি না। অথচ আবার বাজ পড়ার শব্দ ওঠে। দু' জনে কৌতূহলে মুড়িসুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসি। দেখি, মেঘহীন সুনীল আকাশ। তারার আলোয় ফুটফুট করছে। যেন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। তবে শব্দ ওঠে কোথায়? বিনা মেঘে সত্যই কি এদেশে বজ্রপাত হয়?

এই অশনি-নিনাদের কারণ বুঝি পরের দিন।

চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলেছি। অল্প চড়াই। সামান্য হলেও পাহাড়ের এই চৌদ্দ হাজার ফিট উঁচুতে সহজেই ক্লান্তি আসে। গলার ভেতরে কেমন শুষ্ক ভাব। জল খেলে ক্ষণিকের জন্যে ভেজে বটে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। আবার তখনই শুকিয়ে ওঠে। যেন, তপ্ত বালির উপর দু' ফোঁটা জল পড়েই খট্‌খটে হয়ে যাওয়া। মাথাও একটু ভার হয়ে থাকে। ন্যক্কার-বোধও কখন জাগে। চোখে রঙীন্ চশমা। কন্‌কনে বাতাস যাতে না লাগে; বরফের উপর রোদের প্রখর-আলোর কঠোর-দীপ্তি চোখে আঘাত না করে। সারা শরীরে ও মাথার ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি ভাব। চশমা খুললেই বুঝতে পারি—চোখের পাতাও ভারী মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি কিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হয় যেন গাঢ় নিদ্রা থেকে এই মাত্র উঠেছি—ঘুম-ঘোর এখনও কাটে নি।

বেশ বুঝি, হিমালয়ের এই উচ্চ-স্তরের সূক্ষ্ম বিশুষ্ক আব্‌হাওয়া অনভ্যস্ত

শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দু'এক দিনের পরিচয়েই এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর হবে। হয়ও তাই দেখি।

চড়াই-শেষে পাহাড়ের অপরদিকে নামা। পায়ের তলায় বালি-মাটি-পাথরের কুচি ঝুরঝুর করে ঝরতে থাকে। বিষ্টার হাত ধরি। লাঠিতে ভর দিই। লম্বা লাঠির এখানেই প্রয়োজনীয়তা বুঝি।

তার পর আবার উঁচুনীচু পথ। ছড়ানো পাথরের উপর থেকে আর এক পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে চলা। পায়ের তলায় দেহের ভারে পাথর টল্‌মল্ করে ওঠে। যেমন গোমুখের পথে। কখনো বা আবার সেই শিরদাঁড়া পথ।

চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে। হঠাৎ আবার শুনি গতরাত্রির সেই প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত শব্দ। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখি।

দূরে নীলকণ্ঠ পর্বতের গা থেকে বরফের স্তূপ ভেঙে পড়ছে। হিমানী-সম্প্রপাত—Avalanche!

যেখানে বরফ ভাঙছে তারই আশপাশে বাষ্প ও তুষারকণা পুঞ্জীভূত হয়ে সাদা মেঘের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন নিদ্রিত বিশালকায় এক পশুরাজ হঠাৎ জেগে হুঙ্কার রবে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাহাড়ের নীচের অংশ ধূসর ও পিঙ্গলবর্ণ। তুষারশূন্য। চক্ষের পলকে দেখি উপরের সেই শুভ্র বাষ্পমণ্ডলী ভেদ করে সাদা বরফের লেলিহান জিহ্বা নীচে সেই পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎবেগে নামতে থাকে। চারিদিকে ছোট বড় শব্দ ওঠে। এপারের পাহাড়গুলি সেই শব্দ লোফালুফি করে প্রতিধ্বনি তোলে।

তারপর হঠাৎ আবার সব শান্ত। শব্দহীন, গতিহীন। যেন, স্বপ্ন; —কোথাও কিছু ঘটে নি।

অথচ দূরে দেখি—এই ক্ষণিক প্রলয়ের রেখে-যাওয়া সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি। এই কিছু আগে যেখানে বরফ ছিল না, সেখানে বরফ ছেয়ে গেছে। যে তুষার-স্তূপ থেকে হিমানী-সম্প্রপাত হল—সেখানে অবশিষ্ট তুষার-অঙ্গে অপূর্ব বর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বরফের সাদা ধব্‌ধবে রূপ আর সেখানে নেই—ভেঙে যাওয়া অংশে নীল সবুজ স্বচ্ছ শক্ত তুষার দেখা যায়—যেন ভাঙা নীল কাঁচের বোতল। তারই উপর সূর্যের কিরণ বর্ণ-বিন্যাস জাগায়।

স্তম্ভিত হয়ে দেখি। ভাবি, অকস্মাৎ ধ্যান ভেঙে নটরাজ বুঝি তাঁর প্রলয় নাচন শুরু করেছিলেন। নৃত্যের তাণ্ডব তালে ধূর্জটির শুভ্র জটাভারের কয়েকটি বাঁধন খুলে তাঁর ভস্ম-ধূসর অঙ্গে ছড়িয়ে গেল। নৃত্যশেষে এখন আবার যোগীরাজের সেই চিরন্তন ধ্যানস্তব্ধ শান্ত মূর্তি!

আশঙ্কাহীন ব্যবধান রেখে সব কিছু দেখা। তাই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিশ্চিন্ত মনে হিমালয়ের এই প্রলয়ঙ্কর রূপের বিরাট সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি। কিন্তু জানি, তুষার-শিখর-অভিযানকারীদের কাছে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়। সেই ধ্বংসোন্মুখ তুষার-স্তুপের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাছে এই হিমানী-প্রপাত মঙ্গলময় সৌন্দর্যের বার্তা আনে না,—ভ্রূকুটি-কুটিল নিশ্চিত-মরণের দূত মাত্র! তবু অজানা কিসের এক আকর্ষণে তাঁরা দুর্জয় সাহস সঞ্চয় করে সেই মৃত্যুসঙ্কুল তুষার-রাজ্যে এগিয়ে যান,—কোন্ বরফের স্তুপে ava-lanche-এর কতখানি আশঙ্কা আছে—কোন সময়েই বা ঘটতে পারে—কি উপায়েই বা সেই বিপদ কাটানো সম্ভব—এ সবই তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় জানা থাকে,—তবুও কখনও কখনও রুদ্র হিমালয়ের এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাত ধূলিকণার মত তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মরণের মধ্যে অমর জীবন লাভ করে তাঁরা হিমালয়ের বুকে বিরাজ করতে থাকেন।

শিশিরবাবু বলেন, এতক্ষণে বেশ বোঝা গেল, গতকাল রাত্রের বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের শব্দের কারণ! ভীষণ-সুন্দর একেই বলে। সুরম্য-দারুণ।

একটু পরের ঘটনা।

শিরদাঁড়া পথ দিয়ে চলেছি। অতি-সাবধানে। কোন রকমে পায়ের উপর ভর রেখে শরীরের ভার সামলে। ডাইনে বাঁয়ে—দু' পাশেই গভীর খদ। পথ আগেও ছিল না, এখানেও নেই। উদয় সিংরা এগিয়ে চলেছে। তাদের অনুসরণ করে আমরাও চলেছি। কুকুরটা, কিন্তু, দেখি এক জায়গায় নীচের দিকে নেমে গেল। যাবার আগে ক'বার ডাকাডাকি করল। তার পর নীচে দিয়ে সোজা এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার ছুটে উপরের দিকে উঠে আসে—মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়ের নীচের অংশ দেখায়, ছুটে নীচে সেদিকে নেমে যায়—আবার উপরে উঠে আসে। ওঠা-নামার ক্লান্তিতে লম্বা লক্‌লকে জিব্ বার হয়। বেশ বোঝা যায়, সে আমাদের নীচের দিকে

যাবার জন্যেই বারবার সঙ্কেত করছে। বিদ্যাকে সে-কথা বলি। জিজ্ঞাসা করি, ঠিক পথে চলেছি তো ?

বিদ্যা বলে, ঠিকই যাচ্ছি। ঐ তো উদয় সিংরাও এই দিক দিয়েই চলেছে। যেতে হবে ঐ যে দূরে কালো পাথরগুলি দেখছেন—তারই পাশ দিয়ে।

এ-সব পথে ঐ-রকমই পথ-চিহ্ন। আবার বছর বছর বদলেও যায়। বেশী বরফ পড়লে, পাহাড় ভাঙলে নতুন দিক দিয়ে তখন যেতে হয়। পূর্ব-গামী যাত্রীরা—কচিৎ কখনো যাঁরা আসেন—পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে রেখে যান,—মানুষের হাতে সাজানো বোঝা যায়। পথ-সঙ্কেতের কাজ করে। পুরানো বছরের সাজানো পাথরগুলি কখনো কখনো দিগ্‌ভ্রমও করায়।

বিদ্যার কথামত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। অনেকখানি নীচে কুকুরটিও এগিয়ে চলে—মাথা তুলে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকায়, কখনো বা ডাক ছাড়ে।

অনেকখানি আসার পর দেখি, উদয় সিংরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কাছে গিয়ে নজর করি, সামনেই পাহাড় সোজা ধসে গেছে। এগোবার উপায় নেই, নামবারও পথ নেই।

নীচে কুকুরটার দিকে তাকাই। মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আমাদের দিকে। ভাবটা যেন,—এতক্ষণ ধরে বলছি না !

অনেকখানি পথ আবার ফিরতে হয়, তবে নীচে নামার মত পথ পাই। কুকুরটা ছুটে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আমাদের ফিরতে দেখে স্ফূর্তিতে লেজ নাড়তে থাকে, তার আনন্দ উছলে পড়ে। আবার পথ দেখাতে দেখাতে হেলে দুলে এগিয়ে চলে।

মনে কিসের এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করি।

ধীরে ধীরে পথ চলি।

ছড়ানো বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে-যাওয়া কতকগুলি ঝরণা-ধারা পাই। জমির উপরে পাথরের আশে পাশে এখানে এখনও সাদা বরফ জমে রয়েছে। কোথাও বা বরফ গলে জলের স্রোত নামছে। জলে বরফের টুকরাও ভেসে চলেছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ধারাগুলি পার হই। বরফের উপর অতি সাবধানে পা ফেলি। চামড়ার জুতার সাধারণ তলা পিছলে যায়। লাঠিতে ভর দিই, কখন বা বিদ্যার হাত ধরি।

অনেকক্ষণ ধরেই বিষ্টা সামনে দেখাচ্ছিল,—ঐ যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন—ছোট পাহাড়ের মতো—ওর উপর যেতে হবে। ওখানে উঠলেই 'শতোপন্থ্ তাল'ও দেখতে পাবেন।

শিশিরবাবু একটু দাঁড়াবার সুযোগ পান। দম নিয়ে বলেন, দেখতে তো পাব—কিন্তু তারপর ওখান থেকে আরও কত দূর ?

বিষ্টা হাসি মুখে আশ্বাস দেয়, ওখানে উঠলেই তো পৌঁছে গেলেন, উঠেই অপর দিকে অল্প একটু নামতে হবে।

শিশিরবাবু হাঁফ ছেড়ে বলেন, যাক্, তাহলে আসা গেল। ওখানে তো এখনই পৌঁছে যাবো।

কিন্তু দেখতে অতি-নিকটে হলেও পৌঁছুতে বেশ সময় লাগে। হিমালয়ের উচ্চস্তরে শুষ্ক, ধূলিশূন্য, নির্মল পরিবেশ—বহুদূরের জিনিসও সন্নিকটে মনে হয়,—দূরত্বে ভ্রম জাগায়। পাহাড়ের উপরে দূরে ঐ যে কালো পাথরটি—তার গায়ের প্রতি রেখাটি পর্যন্ত এখান থেকে সুস্পষ্ট নজরে পড়ে—যেন পাশে এসে দেখা। এখানকার সূক্ষ্ম আব্ হাওয়ায় মনে হয় যেন অলক্ষ্যে বসে কোন্ এক যাদুকর আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ চির-পরিচিত ধ্যান-ধারণাগুলি ভেঙে দিচ্ছে।

দূরের সেই উঁচু লম্বা জায়গাটি একটা বাঁধের মত। শেষ চড়াই জেনে সেটুকু উঠতে নতুন উৎসাহ জাগে।

বিষ্টা ঠিকই বলেছে। ঐ তো শতোপন্থ তাল! নীচে দেখা যায়।

ততঃ সত্যপদন্নাম তীর্থং সর্বমনোহরম্।
ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডং কল্মষনাশনম্॥

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে বর্ণনা।

বিস্মিত হয়ে দেখি, সত্যই তো পুরাণকারের নিখুঁত বিবরণ—ত্রিকোণ আকার। যেন ধরিত্রীর বুকে আঁকা ভারতের মানচিত্র।

শুনি, তিন কোণে তিন দেবতার অধিষ্ঠান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা সেখানে ধ্যানরত। 'ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ।' শ্রেষ্ঠ দেবতার তপস্যাক্ষেত্র। মানুষের গড়া কোথাও কোন মন্দির নেই। প্রকৃতির প্রাকৃতিক দেবায়তন। ঊর্ধ্বে সুনীল আকাশ। চারিপাশে অমল ধবল তুষার প্রাকার। যেন শ্বেত-পাথরে গড়া। নিম্নতলে বিস্তীর্ণ বারিরাশি। নিস্তরঙ্গ,

স্ফটিকস্বচ্ছ, প্রশান্ত সরোবর। সর্ব-মনোহর। যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠে দোলে নীলকান্ত মণি।

ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্বৈঃ পাপমুমুক্ষুভিঃ॥

দুর্গম পথের অশেষ ক্লান্তি কোথায় নিমেষে অন্তর্ধান করে। তবুও গতি-বেগ সংযত করি। মাথা নত করে ধীরপদে হ্রদের তীরে নেমে চলি। প্রাণ-ভরা অসীম আনন্দ। আঁখি-ভরা জল। ভক্তি-নত-শিরে নামে দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে মানুষ-ভিখারী।

১৬

হ্রদের তীরে তাঁবু পড়ে।

সাগর বক্ষ থেকে এখানকার উচ্চতা—১৪,৪৪০ ফিট। মনে পড়ে, মানস-সরোবরের উচ্চতাও ১৪,৯৫০ ফিট। তবে সেই বিরাট হ্রদের বিস্তৃতি ১২৪ বর্গ মাইল। ছোটখাটো সমুদ্রের মত। শতোপন্থ সে তুলনায় ক্ষুদ্র জলাশয়। এই হ্রদের পরিসীমা ছয় ফার্লঙ্ মাত্র। এক কোণ থেকে অপর কোণের দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লঙ্। চওড়া—এক ফার্লঙ্ ৬৪০ ফিট। বদরীনাথ থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, চক্রতীর্থ থেকে তিন মাইল মাত্র।

শিশিরবাবু চেয়েছিলেন, তাঁবুর মুখ হ্রদের দিকে থাকবে। তাঁবুর ভেতরে বসে বা শুয়ে থাকলেও যাতে সারাক্ষণই হ্রদের দৃশ্য চোখে পড়ে।

বিষ্টা জানায়, তা তো হতে পারে না। বাতাস উঠলে ঐদিক দিয়েই আসবে,—বরফের পাহাড়ের মাথা থেকে নামবে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া, তখন ভারী তকলিফ্ হবে। সারাদিন বাইরে রোদে কাটবে। রাত্তিরের জন্যে তো তাঁবু। তখন তাঁবুর চারিদিক বন্ধ থাকবে।

তার উপদেশ আদেশভাবেই মানতে হয়।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে তাঁবুর মধ্যে ঢোকেন। আমি যাই উদয় সিংদের থাকবার কি ব্যবস্থা হল দেখতে।

তারা থাকবে কাছেই দুটা গুহায়। শুনি, নিকটে আরও গুহা আছে। দু'একটা বেশ বড়ও। দশ-বারো হাত লম্বা হবে। উদয় সিং হুঁকা হাতে এসে দাঁড়ায়। এরি মধ্যে নতুন করে কল্‌কে ধরিয়েছে। পথ হাঁটেও সে

অনেক সময় হুঁকা হাতে। হাসিভরা মুখে বলে, তাঁবুর চেয়ে এ-সব গুম্ফা ভাল। এখানে এসে রাত্তিরে থাক। এখানে ঠাণ্ডা কম। শীতে গুম্ফার ভেতর গরম থাকে। আবার ধূপের সময় ঠাণ্ডা রাখে।

এ কি! গুহার মুখে সেই চলমান 'বার্ণাম উড্'! একরাশ শুকনো ডালপালা নিয়ে কে ঢোকে। ডালগুলির ফাঁকে দেখি সেই আপন-নাম-ভোলা ছেলেটি। শব্দ করে মাথার ও হাতের বোঝা গুহার একপাশে নামায়। ক্লান্তিভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দিনশেষে নিজের কর্তব্য শেষ হওয়ার স্বস্তিবোধের আনন্দ ফুটে ওঠে। পকেট থেকে কি একটা বার করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই শুনতে পাই দূর থেকে ভেসে আসা তার বাঁশীর সুর।

উদয় সিং-এর কাছে শুনি, হ্রদের তীরের এক অঞ্চলে কয়েকটা ঝোপ আছে। সেখান থেকে এই কাঠ-সংগ্রহ। সারারাত আগুন জ্বলবে। গুহা গরম থাকবে। দেখি, জুনিপার-এর ডালপালা। কৈলাসের পথেও পেয়েছিলাম।

গুহার একপাশে ছড়ানো কাপড়ের টুকরা, ছেঁড়া কাগজপত্র—চিত্র-বিচিত্র। দেখে মনে হয় যেন ছিন্ন কোষ্ঠীপত্র। জিজ্ঞাসা করে জানি, ঠিক তাই। মানা প্রভৃতি গ্রামের মার্চা অধিবাসীরা এখানে প্রতি বছর শ্রাদ্ধ করতে আসে, মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। বদরীনাথে ব্রহ্মকপালে যেমন হিন্দুযাত্রীদের পিণ্ডদানের বিধি আছে, এই অঞ্চলের পাহাড়ীদেরও তেমনি শতোপন্থে পিণ্ডদানের প্রথা। বদরীনাথে তারা দেয় না। বোধ করি তাদের ঘরের অতি নিকটে বলে তাদের চোখে সেখানকার ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য এর তুলনায় কম। গ্রামের যে কোন লোকের মৃত্যু হলে সকলেই মাথা মুণ্ডন করে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব শতোপন্থে আসে শ্রাদ্ধ করতে। ছিন্ন কোষ্ঠী-পত্রগুলি তারই নিদর্শন।

তাঁবুতে ফিরে আসি।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট তাঁবু। আমাদের দু' জনের জন্যে যথেষ্ট। তাঁবুর মুখে রাখা হয়েছে আমাদের বাক্স। টেবিলের কাজ করবে। খুচরা জিনিসপত্র তার উপরে সাজানো। খাওয়ার সময় থালাও বসবে ঐখানে। তাঁবুর সঙ্গে জোড়া দেওয়া মাটির উপর বিছানো water-proof ground sheet। তার উপর আমাদের দু' জনের পাশা-

পাশি কম্বল-শয্যা পড়েছে। কলকাতা থেকে আনা একজোড়া কম্বলের উপর বদরীনাথের সেক্রেটারীর দেওয়া একটা তিব্বতী কম্বলও পাতা হয়েছে। গায়ে দেবার জন্মেও তিনি সেই ধরণের আরও একটা কম্বল দিয়েছেন। যেমন মোটা, তেমনি গরম। ভারীও কম নয়। গায়ের উপর চাপা থাকলে দু' হাতে তুলে তবে পাশ ফিরতে হয়। মনে হয় যেন একপাল জীবন্ত ভেড়া বুকের উপর চেপে বসেছে। গন্ধেও সে কথা স্মরণ করায়। শরীর গরম রাখার এত আয়োজন, তবুও শিশিরবাবু বলেন, রাতে শুতে হবে কিন্তু এইসব সোয়েটার, পুল্ওভার, গরম অ্যাণ্ডারওয়ার, ফুল্ মোজা পরে—এমন কি মাথায় মঙ্কি-ক্যাপ দিয়ে!

করাও হয় তাই। তবুও মনে হয় যেন গায়ে সামান্য কি আছে—কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে—কন্কনে শীত ঢুকছে। পাশ ফিরলেই চমকে উঠি, বিছানার উপর বাইরের জমা-বরফ গলে জল গড়িয়ে এসেছে নাকি? এত হাওয়াই বা ঢোকে কোথা থেকে? মাথার কাছে তাঁবু কি খুলে গেছে?

সবই ঠিক আছে। তবুও, প্রচণ্ড শীতে এমনি মনে হয়।

খালি হোল্ড্অল্টা টেনে শিশিরবাবু দু'জনের মাথার কাছে দেওয়াল করে রাখেন। তার পর, মাথা মুড়ি দেন। মুখ চাপা দিয়ে শোয়া আমার অভ্যাস নয়। দম আটকে আসে। নাকটুকু বার করে রাখি। একটু পরে নাকের ডগায় হাত দিয়ে দেখি যেন বরফের কুচি। অসাড়। তাড়াতাড়ি আবার চাপা দিই। হাঁটু দু'টি গুটিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে একটু আয়েস পাই।

সকালে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, বালতিতে রাখা জল জমে বরফ হয়ে আছে। হ্রদের জলের উপরও পাতলা বরফের একটা আচ্ছাদন পড়েছে—তা' থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে,—ঠিক যেন কড়া-ভরা গরম দুধে সর পড়েছে।

এত শীত। তবুও আশ্চর্য! কুকুরটা সারারাত তাঁবুর বাইরে দরজার কাছে শুয়ে ছিল, সর্বাঙ্গে লোমের উপর তুহিন-আবরণ! আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, গা ঝাড়ে, সামনের পা দুটা বিছিয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে, তার পর লেজ নেড়ে কাছে আসে, পায়ের জুতার কাছে নাক এনে শোঁকে, লেজ নাড়তে নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে চলে।

একটু বেলা হলে বাঁধের উপর থেকে আচম্বিতে ডাক শুনি—'জয় রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম!'

সকলে মুখ তুলে তাকাই। আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিই। বৈরাগীজি

ছুটতে ছুটতে নেমে আসেন। সকলকে প্রেম-ভরা আলিঙ্গন করেন। খালি পা, শুধু গা—তার উপর সেই সাদা মোটা চাদর জড়ানো। মাথার দু' পাশ থেকে জটা নেমে দুই কাঁধের উপর পড়েছে,—যেন বটগাছের ঝুরি নেমেছে। মুখ ভরা আনন্দের হাসি নিয়ে বলেন, কাল আপনারা ঠিক মত পৌঁছেছিলেন তো? পথে খুব বেশি কষ্ট হয় নি? আমি কাল যাত্রা করে পথে এক জায়গায় গুম্ফায় রাত কাটিয়ে ছিলাম—ভোরে উঠে চলে এসেছি।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, শীতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয় খুব? একটা কম্বলও তো ছিল না।

তিনি হেসে বলেন, কষ্ট? মোটেই না। সীতারাম কষ্ট পেতে দেন কই! হঠাৎ কোত্থেকে দুটো ভুটিয়া এসে হাজির—সারারাত একই গুম্ফায় ছিলাম। আগুন জ্বেলেছিল,—বড় আরামে কেটেছে। কষ্ট পাবার উপায় কই? ঐ দেখুন না—আসতে না আসতেই বিষ্টা গরম চা আনছে!

বলি, চলুন তা হলে ঐখানে ওই পাথরটার ওপর উদয় সিংদের কাছে—ওরাই চা করে পাঠিয়েছে, সকলে এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাক।

মাত্র দু'দিন পরে দেখা। তবুও স্থান-কাল-ভেদে এমনি মনে হয় যেন কতকাল পরে হঠাৎ সকলে মিলিত হয়েছি। রোদে বসে গল্প করে আনন্দে সময় কাটে। বৈরাগীজি গায়ের চাদর ফেলে উঠে পড়েন। বলেন, এবার স্নান সেরে পুজাপাঠ করে নিই।

শিশিরবাবু বলেন, চলুন, আমিও হ্রদে একটা ডুব দিয়ে আসি, আর যখন এলামই এখানে তর্পণটাও করে নিই।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি আর এখন স্নান করবেন কেন? আর একটু বেলা হোক—রোদের আরও তেজ বাড়ুক।

নির্মল নীল হ্রদের জল। কোথাও কোন লতা পাতা সামান্য কুটি পর্যন্ত নেই। কিছু উড়ে পড়লে বা ভেসে এলে তখনি কোথা থেকে পাখী উড়ে আসে, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছোট ও বড় পাখী। বেশীর ভাগ ধূসর বরণ, কারো বা কালো রঙ্। মন্দিরের গৃহতল যেমন পূজারীরা যত্ন ভরে ধূলিহীন ও মার্জিত করে রাখেন—এই হ্রদের জলরাশিও তেমনি সুপরিষ্কৃত। মলিনতাশূন্য। দর্পণের মত ঝক্‌ঝক্ করে। হ্রদের তীরের বিক্ষিপ্ত পাথর-গুলির—এমন কি দূরের তুষার-কিরীট শিখরশ্রেণীর প্রতিবিম্ব জলে জলছবি তোলে। বাতাসের মৃদু কম্পনে ঢেউ-এর বুকে ছায়াগুলি কাঁপতে থাকে।

বৈরাগীজি বলেন, ঐসব পাখীগুলিও শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভাগ্যবান, তাই তাঁরা এমন স্থানে আছেন। ভগবানের সরোবর মার্জন করে রাখা ওঁদের পক্ষীজন্মের নিত্য করণীয় কাজ। একাদশীর দিন হরি স্বয়ং আসেন এখানে স্নান করতে। 'একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্বয়মায়াতি পাবনে।' পড়েন নি পুরাণে? তাঁর পদানুসরণ করে মুনিগণও আসেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের এই তো প্রকৃত দেবভূমি। থাকুন এখানে কিছুদিন—ভাগ্যে থাকে তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। হরিবাসরের মধ্যাহ্ন সময়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সুমধুর গীতধ্বনি এখানে শোনা যায়। কত বিচিত্র শঙ্খ-ঘন্টার রোল—যেন বিশ্বজোড়া বিরাট মন্দিরে পূজারতির ধূম লাগে!

মনে পড়ে হেমকুণ্ডের কথা। সেই শিখ সাধুটিরও কাছে এই ধরণেরই বর্ণনা শুনেছিলাম।

সর্বাধিকারী মহাশয়ের সেই একশো বছর আগেকার ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই ধরণের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের গভীর অঞ্চলে নয়। লছমনঝোলার উপর দিয়ে গঙ্গার পরপারে যাওয়ার সময়। সে-কালে লছমনঝোলার পুল ছিল না। সত্যকার ঝোলাই ছিল। সেই দড়ির ঝোলার সাহায্যে গঙ্গার বেগবতী স্রোতধারা পার হওয়া-স্বভাবতঃই তখন অতি কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল ছিল। যাত্রীরা প্রাণ হাতে করে পার হতেন। সর্বাধিকারী মহাশয় তার বর্ণনা লিখেছেন এইভাবে:

"ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি, পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এইমত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এইমত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ, কোমর পর্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া, ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া ৺গঙ্গা পার হইতে হয়।......ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐস্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দন্ত-কাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ-দেশান্তরে

ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমনঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে 'পন্থি! সাবধান পগধ্যান, মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপনা।' এই শব্দ শূন্য-পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

এখন লছমনঝোলার সেই ঝোলাও নেই, পারাপারের কোন ভয়ও নেই। এ-যুগে লছমনঝোলার লোহার শক্ত সেতু। মোটর চড়ে দলে দলে লোক পুলের কাছে নামে। নির্ভয়ে গঙ্গার সেই চিরন্তন উদ্দামধারা পার হয়। আধুনিক আবেষ্টনীর মধ্যে সেই একশো বছর আগেকার দৈববাণীর কাহিনী কোথায় মিলিয়ে গেছে!

কিন্তু, শতোপন্থের দুর্গমতা তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে এখনও প্রকট আছে। তাই, সেখানে বসে শোনা অলৌকিক কাহিনী এখনও রোমাঞ্চ জাগায়। সেই জনমানবহীন তুষারময় হিমালয়ের নিস্তব্ধ প্রদেশে অনভ্যস্ত কর্ণকুহরে নানারূপ শব্দের রেশ যে না বাজে এমন নয়। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক শব্দও প্রকৃতই শোনা যায়। সেই সব শব্দের প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করাও হয়তো অসম্ভব নয়। তবুও বিশ্বাসী মনের কল্পনার তুলিতে সেই শব্দগুলিই দৈব-রঙে রঙীন্ হয়ে ওঠে।

বিশ্বাসী মন আপন মনের মাধুরী দিয়ে কেমনভাবে আত্মজগৎ রচনা

করতে পারে তা দেখেছিলাম বৃন্দাবনের চুরাশিক্রোশ বন-পরিক্রমার পথে একটি ছোট্ট ঘটনায়।

সেদিন সকালের হাঁটা শেষ করে বনের প্রান্তে এক গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। সারাদিন এখানেই থাকা। রাত্রিবাসও। মা এসে বললেন, শুনছি এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে এক বালক-সাধু থাকেন। মস্ত বড় ভক্ত। রোজই নাকি সাক্ষাৎ দর্শন পান। আমরা সবাই দেখতে যাচ্ছি। চল্, দেখে আসবি।

কেন জানি না, আমার তেমন কৌতূহল জাগে না। তাই যাইও না।

দর্শন করে মা ফিরে আসেন। মুখ-ভরা তৃপ্তির হাসি। উৎসাহ ভরে বলেন, গেলি না কেন? যা, এই তো অল্প দূরেই। দেখে আয়। বড় ভাল লাগল। ছেলেটি কি অদ্ভুত গল্প করলেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের!

মার কাছে তার গল্প শুনি।

মাত্র বছর চৌদ্দ-পনেরো বালকটির বয়স। পিতা জেলা-জজ্। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। আদরে যত্নে লালিত পালিত হলেও ছোট বয়স থেকেই গৃহত্যাগী মন। বছর তিন চার আগে বাড়ি থেকে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুজির পর পিতা তার সন্ধান পান, বাড়িতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু আবার সে গৃহত্যাগী হয়। পিতাও আবার জোর করে তাকে নিয়ে যান। সে আবার চলে আসে। এইভাবে কয়েকবার ঘটবার পর এখন সে এইখানেই থেকে গেছে। মাঝে মাঝে বাপ-মা এসে এখানে দেখা করে যান। বনের মধ্যে একটি গুহায় থাকে। কাছেই আর এক সাধু থাকেন। বালকটি জপতপ আরাধনা করে।

তার একখানি রামায়ণ-পাওয়া সম্বন্ধেও অদ্ভুত গল্প শুনি। মা বলেন, গিয়ে তাঁর নিজের মুখেই শুনবি। আশ্চর্য!

দেখতে যাই।

বনের মধ্যে শান্ত স্থান। চারিদিকে বড় বড় গাছ। বিকেলের হেলে পড়া সূর্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। গাছের ডালে পাখীর মধুর কাকলী। ইতস্তত কয়েকটি শিলাখণ্ড পড়ে আছে। তারি একটির উপর বালক-সাধুটি বসে এক মনে সুর করে কি পড়ছে। পিছন দিক থেকে এসেছি। সে জানতে পারে নি।

তার পরনে ছোট কাপড়। খালি গা। বুকের ও পিঠের উপর দিয়ে

কাপড়ের একটা অংশ পাকিয়ে পৈতার মত ঘুরিয়ে দিয়ে কোমরে জড়ানো। শ্যাম বর্ণ। চওড়া বুক। সরু কোমর। মাথার উপর চুলের জটা পাকিয়ে কুণ্ডলী করে রাখা। শরীর অল্প দুলিয়ে দুলিয়ে একমনে পড়ছে। সামনে খোলা পুঁথি। একটু শুনেই বুঝলাম—তুলসীদাসের রামায়ণ। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকায়। টানা চোখ, লম্বা নাক। মুখে স্নিগ্ধ সরলতা। হঠাৎ মনে পড়ে একটি প্রাচীন চিত্র। বাল্মীকির আশ্রম। লবকুশ পাথরের উপর বসে রামায়ণ গান করছেন। অদূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সীতা দেবী। কিছু দূরে একটি হরিণ। ঘাস ফেলে মুখ তুলে গান শুনছে। আরও দূরে গাছের ফাঁকে দেখা যায় গঙ্গার প্রশান্ত ধারা। সেই চিত্র থেকে এই বালকটি যেন একাকী জীবন্ত বার হয়ে এসেছে আজ এই বাস্তব জগতে!

পাশে বসে স্নেহভরে আলাপ করি। তার বালকসুলভ সঙ্কোচ কাটে। তার পর মায়ের কাছে শোনা কাহিনীর জের টেনে তাকে প্রশ্ন করি: এ রামায়ণটি পেলে কোথা থেকে?

সে বলে, গ্রামের দোকান থেকে কিনেছি।

বলি, দাম নিয়েছিল কত? টাকা পেলে কোথায়?

সে উত্তর দেয়, একদিন গ্রামের দোকানে দেখে কিনতে ইচ্ছে হল। দাম চাইল দশ টাকা। ফিরে এসে বুড়ো সাধুর কাছে টাকা চাইলাম। তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ টাকা ছিল। তিনি দিয়ে বললেন, 'আর টাকা তো আমার কাছে নেই। পারো তো তোমার কৃষ্ণজীর কাছে চেয়ে নিও।' তাই করলামও। রাতে কৃষ্ণজী এলে চাইলাম। সকালে উঠে দেখি, পুরা টাকা এসে গেছে। কিনে নিয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণজীকে তুমি দেখেছ? কবে শেষ দেখা হয়েছে?

বড় বড় চোখ দু'টি তুলে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তাঁকে তো রোজই দেখি। এই তো তিনি এখনি আসবেন। বনের মধ্যে বাঁশী বেজে উঠবে। আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন ঐ গাছের তলায়। ডালে বাঁধা ঐ ঝোলায় আমায় বসাবেন, দোল দেবেন। তারপর তিনি নিজে বসবেন, আমি দোল দেব। কত খেলা দু' জনে খেলব, বাঁশী বাজাব। সন্ধ্যা কেটে যাবে—রাত্রি এলে পাশে বসে তিনি কত গল্প করবেন—চোখে আমার ঘুম নামবে।

হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করে, কেন? তুমি দেখ নি তাঁকে? শোনো নি তাঁর

বাঁশী? শুনবে আজ? চুপ করে থাক তবে আমার পাশে। একটু পরেই ঐ দিক দিয়ে আসবে সেই বাঁশীর ধ্বনি—তারপর ঐ হেলানো গাছের পাশ থেকে বার হবেন—মাথায় চূড়া বাঁধা—হাতে বাঁশী, মুখে হাসি—আমার কৃষ্ণজি!

আঙুল তুলে দেখায়, বনের মধ্যে গোধূলির আবছায়া আঁধারের দিকে। একটা গাছের ডালে মৃদু হাওয়ায় দুলছে শিকড় দিয়ে বোনা একটি ঝোলা!

তাকিয়ে থাকি। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিশ্বাসে-ভরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার সঙ্কোচবিহীন কথাগুলি শুনে আমার যুক্তিবাদী মনের সব কিছু অবিশ্বাস কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

ভাবি, সত্য মিথ্যা এও তো মানুষেরই সৃষ্টি। প্রয়োজন মত আমরাই গড়ি, আমরাই ভাঙি। এই ভক্ত বালকের কাছে—এই-ই তো অতি-বড় সত্য। যুক্তি-তর্কের তীক্ষ্ণ বিচারের শরাঘাতে নাই বা তার সেই আনন্দ-জগৎ জর্জরিত হ'ল!

কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষ তবু ছাড়ে না। বিচার করতে বসে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে।

মনে পড়ে, Aldous Huxley-র *Devils of Loudon* গ্রন্থে এই মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিচারের কথা। এ-সবই বুঝি মনের ফাঁকি বা মস্তিষ্কের বিকার। Psychic ব্যাপার।

William Blake-এর জড়াতীত জগতের বিচিত্র অনুভূতির কাহিনীও মনে আসে। দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যদর্শনের (vision) বর্ণনা। সাধারণের ধারণা, তাঁর কাব্যে ছায়া পড়েছে তাঁর মানসিক বিকৃতির। কিন্তু তাঁর *Spiritual Portraits*-এ তিনি অতি সহজ ভাবেই প্রচার করেন: "You can see what I do if you choose. Work up imagination to the state of vision, and the thing is done."

ধর্ম সম্পর্কে আত্ম-মত ও আত্ম-অভিজ্ঞতা একান্ত স্বকীয়। Cardinal Newman-এর অভিমতে—"In matters religious, egotism is true modesty. In religious enquiry each of us can speak only for himself. His own experiences are enough for himself, but he cannot speak for others; he cannot lay down the law; he can only bring his own experiences to the common stock of psychological facts."

কিন্তু ভারতীয় সাধু-মহাত্মাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনীর যথাযথ বিচার বা বিশ্লেষণ করা অত সহজ নয়। তাঁরা বলেন, এ-সবই দেহনির্মুক্ত আত্মার সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির বিকাশ মাত্র। প্রকৃত সাধু স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে পারেন। এই অলৌকিক দর্শন সেই অভিজ্ঞতারই নিদর্শন।

সাধুরা আরও বলেন, এ আর এমন বিচিত্র কি? সাধনার বলে সাধকের উন্নতি হয়। প্রথমে তৃতীয় নেত্র খোলে। তারপর খোলে দিব্যনেত্র। তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হলে ধ্যানাবস্থায় ভাবানুরূপ দেবতার দর্শন হয়। কিন্তু, দিব্য চক্ষু যখন খোলে তখন আর ধ্যানের প্রয়োজন হয় না, সাধক তখন যে কোন সময়ে যে কোন দেবতার দর্শন পেতে পারেন।

এ-সবই সাধুদেরই উক্তি। সাধুদেরই যুক্তি। সত্যকার সাধুরাই এর বিচার করতে পারেন।

জানি না, সেই বালক-সাধু কোন্ স্তরের!

১৭

কিন্তু, থাক ওসব সাধু-সন্তদের অলৌকিক কাহিনী।

হিমালয়ের এই সকল দুর্গম নিভৃত অঞ্চল সাধারণ মানুষেরও প্রাণে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগায়, সেই কথা বলি।

নিদারুণ গ্রীষ্মে রৌদ্রের রুদ্রতাপে মানুষের দেহে যখন জ্বালা ওঠে, সরোবরের শান্তশীতল জলে অবগাহন স্নানে দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়। তেমনি আবার অতি অপরিচ্ছন্ন পুতিগন্ধময় স্থানে ক্ষণিকের অবস্থানও দেহ-মনকে সঙ্কুচিত করে তোলে। মানুষের মনের উপর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর এই বিভিন্ন প্রভাব সকলেই সাধারণ জীবনে অনুভব করি। এর বৈজ্ঞানিক কারণও নিশ্চয় আছে। সেই কারণ বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু মর্মে মর্মে বোধ করি, হিমালয়ের এই শান্ত প্রদেশ মনে শান্তিময় অসামান্য এক অনুভূতি আনে।

বৈরাগীজি বলেন, এই তো এখানে স্বাভাবিক। কত প্রাচীন সিদ্ধ যোগী মহর্ষিদের তপস্যার ক্ষেত্র এসব। মহাত্মাদের আত্মার সংযোগে এখানকার আলো-বাতাস জলস্থল চারিদিক এক পবিত্রভাবে সারাক্ষণই সঞ্জীবিত হয়ে

থাকে। যেমন তোরঙ্গে ফুল রাখলে ভেতরের সব কিছু সুবাসিত হয়ে ওঠে। ঋষিদের যোগসিদ্ধির প্রভাবে এখানকার বায়ুমণ্ডল বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো একপ্রকার শক্তি বিকীরণ করে। প্রাণে আধ্যাত্মিক শিহরণ জাগায়। তাই তো সাধু-সন্তেরা সাধনার জন্যে এসব স্থানে আসন পাতেন। সিদ্ধির অতি অনুকূল পরিবেশ।

হ্রদের তীরে কালো মসৃণ একটি পাথরের উপর বসে সেই কথাই ভাবি। হবেও বা। নিজে সেই ভাবে বিভোর হয়ে সাধনা করতে না বসলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কি করে? কিন্তু তবুও মনে মনে বেশ অনুভব করি যে চারিদিকের আবহাওয়া এক অভূতপূর্ব প্রভাব মনের উপর বিস্তার করে। শহর-সভ্যতার মধ্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে মনে যেসব সাধারণ ভাবের উদয় হয়, এখানে এখন অন্তরের নিভৃত কোণেও তাদের সন্ধান মেলে না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। প্রকৃতির বিরাট রূপরাজির মধ্যে নিজেকে নগণ্য, অতি সামান্য মনে হয়। দৈত্যাকার গিরিরাজের অঙ্গে যেন 'গ্যালিভারস্ ট্রাভেলস্'-এর সেই লিলিপুটিয়ানরা! মহাকালের অসীম সাগর-তরঙ্গে জলকণার বুদ্বুদ। জাগতিক জীবনে বা সভ্যজগতে যেসব গুণের ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এতকাল স্বীকার করে এসেছি এখন মনে হয় সে-সবই নিরর্থক। জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভেদ হারায়। জানি শুধু, এইটুকু,—কিছুই জানি না। মনের গভীরতম প্রদেশে তাকিয়ে দেখি, ভয়-ভাবনা-চিন্তা, স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা কোন কিছুরই রেশমাত্রও নেই। লোভ-মোহ-দ্বন্দ্ব সংকোচের অতীত। বাসনার শিকল ছিন্ন হয়েছে। নির্বিকার চিত্ত। যেমন উচ্ছ্বাসবিহীন ঐ নিস্তরঙ্গ হ্রদের জল। সুনীল সুনির্মল। শিশুর চোখে টানা কালো কাজল। ছলছল্ জল-ভরা। সরল স্বচ্ছ দৃষ্টি।

মাথার উপর আকাশ। গাঢ় নীল। চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীর প্রাচীর বেষ্টন। 'নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম'। সেই পর্বতকারার মধ্যে আকাশের নীলে মুক্তির আহ্বান শোনায়। অজানা ভাষাবিহীন গানে দূরের পানে টানে। বিরাট ব্যোম। শব্দহীন। গতিহীন। অসীম নির্জন। 'অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল'। সেই সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে প্রাণে নিবিড় শান্তি পাই।

আজ সভ্যজগতের শহরে বসে লিখতে গিয়ে ভাবি, সেই সীমাহীন শূন্যের নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতা Pascal-এর মনে এককালে ভীতিরই সঞ্চার করেছিল।

আজ সেখানে বিজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে রকেট ছোটে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। জ্ঞানের সীমা আরও বাড়ে। বিশ্বের মানুষের গড়া যন্ত্রদানবের হুঙ্কারে নভোমণ্ডলের বিরাট স্তব্ধতা ভেঙে পড়ে। তবুও মানুষ শান্তির সন্ধান পায় না।

সন্ধ্যার ছায়া নামে।

বৈরাগীজি এসে জানান, আজ সত্যনারায়ণ পাঠ। তীর্থে এসে বিশেষ করে করা উচিত। কি বলেন?

তাঁবুর ভেতর এক পাশে তিনি মৃগচর্ম বিছিয়ে বসেন। সামনে একটা বাক্সের উপর পুঁথি খোলা। একধারে ছোট্ট রেকাবিতে পূজার নৈবেদ্য—এক মুঠা শুক্‌নো ভাজা আটা চিনি দিয়ে মাখা, উপরে দুটো কিস্‌মিস্‌। হেসে বলেন, যেমন দেশ, তেমনি দেবতার ভোগ। ঠিক না? ভক্তিভরে দিলে দেবতার কাছে অল্প-বেশী ছোট-বড়র তফাৎ নেই। শিশিরবাবুকে বলেন, দিন্‌ দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে।

তাঁবুর আর একপাশে শিশিরবাবু ও আমি বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে মাথায় মঙ্কি-ক্যাপ লাগিয়ে বসে আছি। তাঁবুর মুখে বিন্থা ও উদয় সিংরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে। শিশিরবাবু একটা কম্বল এগিয়ে দিয়ে বসতে বলেন। সবাই বসে। উবু হয়ে। ঐ তাদের অভ্যাস। হ্রদের তীর থেকে তুলে আনা ফুল অঞ্জলি ভরে ধরে রেখেছে। কুকুরটাও বাইরে স্থির হয়ে বসে আছে।

বৈরাগীজির সামনে ছোট্ট লণ্ঠন। তাঁর ছোট দেহ। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তাঁবুর গায়ে তারই প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে,—মসীকালো বিরাট আকার।

সুর করে বৈরাগীজি সংস্কৃত শ্লোক পড়েন। শরীর একটু দুলতে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বিন্থাদের দিকে তাকান। হিন্দীতে ব্যাখ্যা করেন। কেমন করে সত্যনারায়ণের পূজা করে, ভক্তিভরে ভোগ দিয়ে দীনহীন মানুষ অতি সুখে দিন কাটায়। ধনী সওদাগর বাণিজ্যে চলে। ধন-দৌলতের মোহে সত্যনারায়ণের পূজা ভোলে। দেবতার রোষ জাগে। প্রবাসে বিপদ আসে। রাজরোষে লাঞ্ছিত হয়। চুরির দায়ে দণ্ড পায়। ঘোর দুর্বিপাকে আবার দেবতার শরণ নেয়। সত্যনারায়ণের পূজা করে। পুনর্বার দেবতার

কৃপাদৃষ্টি নামে। প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটে। বাণিজ্যে লক্ষ্মীশ্রী ফেরে। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের পূজার প্রথা চলে। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন প্রভেদ নেই। পূজার সামান্য উপচার। সওয়া পাঁচ পোয়া দুধ, আটা, শর্করা, কলা মিশ্রিত শিরনি।

নিবিষ্টমনে বিস্তারা কথা শোনে। দেবতার অসীম ক্ষমতার ও অশেষ করুণার কাহিনী—ভক্তের রক্ষা, দুর্জনের শাসন, অনুতাপীকে ক্ষমা, আবার স্বল্পেই তুষ্টি। কৃপার সিন্ধু ভগবান এমনিভাবেই প্রেমে ধরা দেন! বিস্তারা থেকে থেকে মাথা নেড়ে সায় দেয়, চোখ মোছে। কপালে জোড় হাতে প্রণাম করে।

মনে পড়ে, বাড়িতেও ছেলেবেলা থেকে দেখছি সত্যনারায়ণের পূজা। পুরুত-ঠাকুর আসেন। সত্যনারায়ণের কথা শোনান। মেয়েরা জোড়-হাতে বসে শোনেন। প্রণাম করেন। পূজাশেষে শিরনি বিতরণ হয়। বাতাসা মাখিয়ে মুখে ফেলা। এখনও কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করলে সেই অমৃত-স্বাদের স্মৃতি জেগে ওঠে।

দেশ-কাল অতিক্রম করে এই সুদূর হিমালয়ে আজও সেই সনাতন প্রথারই প্রকাশ দেখি।

রাত্রে পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ জমে। গুরু গুরু গর্জন ওঠে। আশ্চর্য হয়ে দেখি বিদ্যুতের অপরূপ খেলা। ছেদহীন। অবিরাম। তড়িতের ত্বরিতগতি নয়। হঠাৎ-আলোর ঝলকানি নয়। একের আলো নিভে যাবার আগেই আবার চমক্ ওঠে। একটানা কম্পমান বৈদ্যুতিক দীপ্তি। তাঁবুর বাইরে চারদিকে,—ভেতরে ছোটোখাটো সব জিনিস—সুস্পষ্ট দেখা যায়।

শিশিরবাবু উঠে বসেন। বলেন, এত তীক্ষ্ণ আলোয় কখনো ঘুম আসে! আকাশেও যে নিঅন্-লাইট্-এর চলন হল দেখি। বসে বসে বই পড়লে হয়!

ভাবি, রাত্রে তুষারপাত হবে।

কিন্তু কিছুই হয় না। শুধু শীতই বাড়ে। হি হি করে কাঁপতে থাকি। থুল্মার মধ্যে আরও কুঁকড়ে শুই।

পরের দিন চলি শতোপন্থ ছাড়িয়ে আরও দূরে সোমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ডের

দিকে। আজও সেই শিরদাঁড়া পথ। তেমনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চলা।

হ্রদের জলের কাছে পাথরের আশেপাশে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। পাড়ের এক জায়গায় কয়েকটা পাখী ঘুরছে। সর্বাঙ্গে বড় পালক। তুষাররাজ্যে স্বভাবজাত শীতবস্ত্র। ধূসর রঙ্—যেন ধূলি-ধূসরিত গৈরিক বসন। হাঁসের মত আকার। কুকুরটা ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ধরে একটাকে। পাখীটা ডানা মেলে ঝট্পট্ করে। সবাই চেঁচিয়ে উঠি। বিস্তা ছুটে যায়। পাথর ছুঁড়ে কুকুরটাকে মারে।

পাখীটা ছাড়া পায়। খুঁড়িয়ে দু' পা চলে অল্প উড়ে জলের উপর পড়ে। সকলে নিশ্চিন্ত হই।

এই শান্ত প্রদেশে হিংসা ও লোভের অকস্মাৎ প্রকাশ! মনে কোথায় ব্যথা জাগে।

বৈরাগীজি হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আপনি কৈলাস গেছেন, তাই না? অতি শান্তিময় স্থান শুনেছি। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু এখনো ভাগ্যে হয় নি।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

উত্তর দিই, চলে যান না। যাওয়ার আপনার বাধা কোথায়? নিজে গিয়েই দেখে আসবেন।

বৈরাগীর প্রফুল্ল বদন ম্লান হয়। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, যাব। সেখানে গিয়েও দেখব। শুধু চোখে দেখা নয়; দীর্ঘদিন থাকব। নিশ্চয় মনে সেখানে নিরঙ্কুশ গভীর শান্তি মিলবে।

কথা শুনে চমকে উঠি। জিজ্ঞাসা করি, কেন? বদরীনাথে আপনার অমন গুহায় শান্তি পাচ্ছেন না?

বলেন, সেখানে আর মন বসছে না। তাই ভাবছি, কৈলাস যাই। কি বলেন?

বলি না কিছুই। মনে মনে ভাবি, বৈরাগীর মনের এই অশান্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতও তো কোনদিন পাই নি!

বিধাতার বিচিত্র সৃজন মানুষের মন। সব কিছু পেলেও কোথায় যেন কিসের অভাব! বাইরে আনন্দের প্রকাশ, অন্তরে অতৃপ্তির অতল গহ্বর। যেন, আপাত-শান্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে অনির্বাণ-অগ্নিদাহ।

হ্রদের তীরে কয়েকটি গুহা। ভিতরে উঁকি মেরে দেখি। বন্য জীবজন্তুর

গুহার ভিতর তাদের গন্ধ থাকে। মানুষ সে ঘ্রাণ পায়। বনের পশুও, শুনি, মানুষের গায়ের গন্ধ পায়। বহু দূর থেকেও। কিন্তু, মানুষ মানুষের গন্ধ সেভাবে অনুভব করে না। গুহার ভিতর এককালে মনুষ্য-বাসের সাক্ষ্য দেয় চারিদিকে ফেলে যাওয়া ছোটখাটো জিনিসগুলি। টুকরা কাগজ। কাপড়ের ফালি। ভাঙা টিনের কৌটা। সাজানো পাথর। একপাশে বেদী। মাঝখানে ধুনি—এখনো আগুনের কালি মাখা। আধপোড়া কাঠ। রৌদ্র বৃষ্টি শীতের প্রকোপ থেকে মানুষের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল। সাধু-সন্তদের প্রস্তর-প্রাসাদ। আজ দেখি,—সবই পরিত্যক্ত।

শূন্য গুহা মনে প্রশ্ন তোলে,—এলেনই বা কেন? পেলেনই বা কি? গেলেনই বা কোথায়?

মনে পড়ে সেই সাধুগুলির কথা। শতোপন্থে এসেছিলেন কয়েকমাস কাটাতে। তারপর তুষারপাতে মৃত্যু ঘটে। পরের বছর তাঁদের শবদেহ-গুলি লোকে দেখতে পায়। সাধুদের সৎকার করে। এখানে কি ভাবে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন কেউ তা জানে না। সাধারণ মানুষের মত তাঁরাও কি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলেন?

মৃত্যু-পথ-যাত্রী অপর এক সাধুর শেষ দিনগুলির কথা মনে আসে।

সে বছর কলকাতা থেকে রওনা হচ্ছি আবার হিমালয়-পথে।

তারই ক'দিন আগে এক বন্ধু দেখা করতে এলেন। হিমালয়ের এক প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে নিরালায় দিনকয়েক কাটানো তাঁর উদ্দেশ্য। তাই খোঁজ নিলেন, কোথায় থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে এক স্বামীজির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। নির্জন আশ্রমে তিনি একাকী থাকতেন। গঙ্গার উপকূলে। শান্ত, মনোরম স্থান। ফলফুলের ছোট বাগান। আশ্রমের একটি কাঠের সুন্দর বাড়িও ছিল। গঙ্গার দিকে বারান্দা ও ঘরগুলিতে কাচ বসানো। হিল্ স্টেশনের সৌখিন বাড়ির মত। কিন্তু স্বামীজি নিজে থাকতেন পাশে এক ছোট্ট কুটিরে। বাড়ি খালি পড়ে থাকত। আমায় অনেকবার বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে। কিন্তু, গিয়েছিলাম বটে, থাকা হয় নি। বন্ধুবান্ধব ক্বচিৎ কেউ ঐ অঞ্চলে গেলে স্বামীজির কাছে পরিচয়-পত্র দিতাম। তিনি সানন্দে তাঁদের গ্রহণ করতেন। স্বামীজি শিক্ষিত ব্যক্তি। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে, সদ্ আলাপ-

আলোচনায় ও জপ-তপে দিন কাটাতেন। ত্রিশ বছরের উপর হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। তারই মধ্যে কয়েক জায়গায় তাঁর সাক্ষাৎ পাই। পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ষাট-এর কোঠায় বয়স হলেও অটুট স্বাস্থ্য। বিধি-নিয়মে বাঁধা জীবনধারা। আহার-বিহারে কঠিন সংযম। পত্রযোগেও আমার সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। বছরখানেক আগে লিখেছিলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। ফলে শহরের হাসপাতালেও যেতে হয়েছে। কাঁপা হাতের হরফে ছোট্ট চিঠির মধ্যে তাঁর রোগের গুরুত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতাম, কিন্তু রোগের স্বরূপ জানতে পারি নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে লিখলেন, স্বাস্থ্য ভেঙেছে। রোগভোগের উপশম হলেও, নিরসন হয় নি। যতদিন এ দেহ থাকবে দুর্ভোগও চলবে। দেহের এই-ই তো ধর্ম।

বন্ধু যখন সেখানে যাবার কথা বললেন, স্বামীজির উল্লেখ করলাম। বললাম, কয়েক মাস তাঁর খবর পাই নি। হিমালয়ের যেসব অঞ্চলে ছিলাম, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সুবিধে ছিল না। আবার শীঘ্রই বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার নাম করে লিখে দিন, ওঁর ওখানে আপনার থাকা সম্ভব হবে কিনা। শরীর তাঁর এখন কেমন আছে বিশেষ করে জেনে নেবেন। বেশী অসুস্থ থাকলে তাঁর কাছে থাকবেন না, তাও জানাবেন। ওষুধপত্র বা অন্য কোন পথ্য এখান থেকে নিয়ে যাবার থাকলে আপনাকে নিঃসঙ্কোচে জানাতে লিখবেন।

বন্ধু সাধু সেবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, নিশ্চয়। সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

কয়দিন পরের কথা। সেইদিনই হিমালয়-যাত্রা করছি। বন্ধু টেলিফোন করলেন। স্বামীজির চিঠির উত্তর এসেছে। তাঁর থাকার সম্বন্ধে লিখেছেন, উমাপ্রসাদবাবুর বন্ধু আপনি, আপনার নিজের যদি এখানে অসুবিধা বোধ না হয়—আশ্রমের দ্বার অবারিত।—শরীরের বিষয়ে জানিয়েছেন সেই সংক্ষিপ্ত এক কথা, মানুষ-দেহ যতদিন আছে, রোগভোগও ততদিন থাকবে।—প্রয়োজনীয় কোন কিছু নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবেরও উত্তর দিয়েছেন,—সন্ন্যাস-ধর্ম নেবার পর কোন কিছু দ্রব্যের আবশ্যকতা থাকার কথা নয়। নেই-ও। তবে যখন এ বিষয়ে লিখেছেনই, একটা কথা লিখি। সম্ভব হলে সঙ্গে আনবেন আপনার বন্ধুকে। বহুদিন দেখি নি। আনতে পারেন তাঁকে?

চিঠির কথাগুলি শুনে মনটা কেমন করে উঠল।

সেইদিনই ট্রেনে উঠেছি। গন্তব্যস্থল হিমালয়ের অন্যত্র। কিন্তু ভাবলাম,

হু' দিন পরেই না হয় সেদিকে যাব। স্বামীজির কথাগুলি যেন টানতে থাকে!

গেলামও তাঁরই আশ্রমে।

বিকেলবেলা। ভাগীরথী তীরে। হিমালয়ের এককালের নিভৃত শান্ত অঞ্চল। সাধুসন্তদের বহু বাঞ্ছিত তপোভূমি। আধুনিক সভ্য যুগে বাস্-পথ সেই শান্ত আবহাওয়ার বুক চিরে চলেছে। উদ্ধতভাবে। নবীন সমৃদ্ধ শহর উঠছে। ধর্মশালায় সরকারের দপ্তর বসেছে। বুভুক্ষিত সভ্যতা সাধুদের আশ্রম গ্রাস করতে চলেছে।

আশ্রমের সদর দরজা বন্ধ। মৃদু আঘাতেই খুলে গেল। বাগানে জঙ্গল ভরা। তবুও ফুল ফুটেছে। মানুষের বিনা যত্নেও। চারিদিক নীরব। কেমন একটা ছম্‌ছমে ভাব। সন্তর্পণে স্বামীজির কুটিরের দিকে এগিয়ে যাই। দরজার সামনে চিক্ ফেলা। ভেতরে কে যেন কি পড়ছেন। চাপা গলায়। অস্ফুট শব্দ করি। অপরিচিত কণ্ঠে মৃদু আহ্বান পাই, আসুন!

চিক্ তুলে দরজার সামনে দাঁড়াই।

ছোট ঘর। বাঁ দিকে একটা চৌকি পাতা। উপরে কম্বল-শয্যা। দেওয়ালের তাকের উপর কতকগুলি বই, কাগজপত্র, লেখবার সাঁজ-সরঞ্জাম, কয়েকটি ওষুধের শিশি। চৌকির পায়ের কাছে ছোট জানালা। তারি খুপরিতে একটা লণ্ঠন ও পাথরের বাটি। ঘরের অপর কোণে নর্দমার কাছে এক বালতি জল, একটি কমণ্ডলু। আর এক কোণায় দণ্ডীধারীর দণ্ড। গেরুয়া কাপড় জড়ানো। তারই কাছে মাটিতে কুশাসনে বসে আছেন এক ব্রহ্মচারী। চৌকির উপর একজন গেরুয়াবাস সাধু বসে। তাঁর হাতে খোলা একখানি গ্রন্থ। বুঝলাম, ইনিই পাঠ করছিলেন। যাঁকে শোনাবার জন্যে পাঠ,—তিনি বসে আছেন সামনে এক চেয়ারে। দরজার দিকে মুখ করে।

ইনিই কি স্বামীজি? আশ্চর্য হয়ে তাকাই। বহুবার তাঁকে দেখেছি। একসঙ্গে থেকেছি। দেখেই না-চেনবার কথা নয়। তবুও প্রথম দর্শনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু তখনি মনে হয়, নিশ্চয় ইনিই হবেন, এ যে তাঁরই আশ্রম। আকৃতির প্রভূত পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর প্রচ্ছন্ন পরিচয় তখন প্রকাশ পায়।

স্বামীজিকে এর মাত্র বছর দুই আগেও দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গ। সবল সুস্থ। লম্বা মুখ। মাথা, দাড়ি, গোঁফ—কামানো।

কিন্তু এখন চেয়ারে বসে আছেন দেখি, স্থূলকায় এক বিপুল দেহ। প্রকাণ্ড চেয়ারখানি জুড়ে আছে গেরুয়া চাদরে জড়ানো এক মাংসপিণ্ড। হাতলের উপর হাত রাখা,—আঙুলগুলি বেরিয়ে আছে, অসম্ভব ফোলা। মাথা থেকে লম্বা সাদা চুলের জট নেমেছে। প্রকাণ্ড গোলাকার মুখ। বুক অবধি দাড়ি ঝুলছে। সেই দাড়ি-গোঁফ ভরা ফোলা গালের উপরে চোখ দুটি কোনরকমে খোলা। আবিল দৃষ্টি।

আমার দিকে স্তম্ভিতভাবে ক্ষণিক তাকিয়ে থে'ক অস্ফুটস্বরে টেনে টেনে বললেন, উ-মা-প্র-সা-দ! আ-স-বে আ-স-বে, দে-খা হ-বে-ই জা-ন-তা-ম!

আর কথা ফুটল না। দু' চোখের বাঁধ ভেঙে ঝর্‌ঝর্‌ করে ধারা নামল। কখনো তাঁর অঙ্গস্পর্শ করি নি। তবু কিসের এক টানে এগিয়ে গেলাম। মাথাটি কোলের কাছে নিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়ালাম।

হিমালয়বাসী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তবুও দেখি, 'রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশু'!

আশ্রমে উঠব ভেবেছিলাম। তিনিও বলেন। তবুও থাকি না। কেন না দেখি, তিনি উত্থানশক্তি রহিত। তাঁরই আশ্রমে তাঁরই কাছে থাকব, অথচ তিনি অসহায়ভাবে পড়ে থাকবেন,—আমার উপস্থিতি তাঁর এই অবস্থায় নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাবে। অতএব নিকটে অন্যত্র থাকি। যখন-তখন তাঁর কাছে আসি।

স্থানীয় ডাক্তারটি বাঙালী। তাঁরই চিকিৎসাধীনে প্রথম ছিলেন। এখন চিকিৎসার বাইরে। তবুও ডাক্তারবাবু রোজই এসে দেখে যান। খোঁজখবর নেন।

ডাক্তারের কাছে তাঁর অসুখের ইতিবৃত্ত শুনি।

বছরখানেক আগে রোগ ধরা পড়ে। ক্যান্সার! মূত্রনালীতে। ডাক্তারেরই উপদেশ ও ব্যবস্থামত শহরে হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। নালীটি বাদ দিয়ে এখন পাইপ লাগানো আছে। ফিরে এসে কিছুকাল শরীর অনেকটা সুস্থ ছিল, দেহে বলও পাচ্ছিলেন। মাসাবধি আবার হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সারা অঙ্গ অতিমাত্রায় ফুলে গেছে। কোন ওষুধেই সাড়া দিচ্ছে না। ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ হয়েছে। স্থানীয় এক স্বামীজি কবিরাজী ওষুধ জানেন। দিচ্ছেন। এক ব্রহ্মচারী এখন কাছে

থেকে সেবা করেন। কতদিন করবেন জানা নেই। কেউই দু-চার দিনের বেশী থাকতে পারেন না। এমন রোগীর বেশীদিন একটানা শুশ্রূষা করা কঠিন। টাকা দিয়েও এখানে লোক মেলে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন, দেখেছি তো মশাই, কিছুদিন পরে পরম আত্মীয়স্বজনই ছেড়ে চলে যায় এসব রোগীকে। নেহাৎ না যেতে পারলে মনে মনে ভাবে, রোগীর রোগভোগের মুক্তি হবে কবে,—তারও আপদের শাস্তি! এ স্বামীজির এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। চিকিৎসায় যে আর কিছু হবার নেই এবং রোগ-ভোগেই তাঁর শীঘ্রই শেষ হবে—এ সবই তিনি জানেন। নির্বিকার হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। স্বামীজির রোগের যা অবস্থা তাতে অন্য যে কোন রোগীরই দু'এক দিনে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এঁর হৃদ্‌যন্ত্র এখনও এত সক্ষম ও সতেজ যে মাস দুইয়ের মধ্যে এঁর শাস্তি মিলবে না।

ডাক্তারের কথা শুনি আর ভাবি, ব্যাধির গতিবিধি কি সর্বত্রই! যতদিন মানুষদেহ, ততকালই নিগ্রহ। হিমালয়ের শান্ত আশ্রমে দীর্ঘ তপস্যায় কাটিয়েও রোগভোগের অন্ত কই!

ডাক্তার বলতে থাকেন, কি অসীম সহ্যগুণ স্বামীজির! হবার কথাই। বছর দুই এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক অবস্থাতেই দেখেছি। যেমন বিদ্বান, তেমনি মধুর ব্যবহার। যদিও কঠোর জীবনযাপন করতেন। এই তো সত্যিকারের সাধু। সাধারণ লোকের কাছে তো বটেই, সাধু-সমাজেও দেখেছি এঁর প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান। অথচ কি ভোগটাই না ভুগছেন! আমার কিছু করবার নেই, তবু যাই রোজ দেখতে। না গিয়ে পারি না।

আমি বলি, সাধুরাও আসেন দেখলাম।

ডাক্তার বলেন, তা তো আসবেনই। কিন্তু ওঁদের কথা না বলাই ভাল। আছেন বটে কয়েকজন সত্যিকার ভাল লোক। রোজ এসে ওঁর কাছে বসেনও। কিন্তু—তারপর চাপা গলায় বলেন, অনেক কিছুই দেখলাম এইসব পুণ্যতীর্থেও। এখানে তো চারিদিকেই সাধু। অথচ এখন বেশ জেনেছি, গেরুয়াবাস পরলেই সাধু হয় না। হিমালয়েও নয়। এঁর অসুখের মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম। ইনি তখন এখানে আমার হাসপাতালে। রোগের কঠিন অবস্থা। অনেকেই আসেন খোঁজখবর নিতে। রোগনির্ণয়ও হয়েছে। সকলে জেনেছেও। সাধারণ লোক শুনে চিন্তিত হয়ে বলে, 'আহা, এত বড় সাধু, তাঁর এমন অসুখ! ভালয় ভালয় সেরে উঠুন। যতদিন থাকেন,

আমাদেরই সৌভাগ্য।'—কেউ বা গিয়ে মন্দিরে পুজো দেয়। সাধুরাও আসতেন খবর নিতে। কিন্তু অবাক হয়ে যাই, যখন তাঁদেরই মধ্যে দু' এক জন আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে যান, চুপিচুপি বলেন, 'কুৎসিত কোন রোগ নাকি ডাক্তারবাবু? লুকোবার দরকার নেই। আমার কাছে বলবেন তাতে আর ক্ষতি কি? কারো কাছে তো প্রচার করছি না।' আমি যত তাঁদের জানাই, সে ধরণের কোন কিছুই নয়, তবুও তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন। স্তম্ভিত হয়ে দেখি মশাই, আমার উত্তর তাঁদের মনোমত হয় না!—অথচ তাঁরাও গেরুয়াধারী! এখানে তাঁদেরও নাম-ডাক আছে!

আমিও স্তব্ধ হয়ে শুনি।

স্বামীজির কাছে গিয়ে বসি। আমিই কখনো-সখনো কথা বলি। তাঁকে বলতে দিই না। কথা বলায় কষ্ট হয় দেখি। কাসির দমক আসে। গাঢ় শ্লেষ্মা ওঠে। পাশেই মরচে-পড়া টিনের একটা কৌটা। তাতে ফেলেন। ফেলে ধুঁকতে থাকেন। চোখ দিয়ে জল ঝরে। এ জগতে মুছে দেবার কেউ নেই। নিজেও মোছেন না। তবুও মুখে কাতরতা-জ্ঞাপক কোন ধ্বনি ওঠে না। শ্রান্ত, অথচ আবার শান্তভাবে বসে থাকেন।

সেই প্রথম দিন অকস্মাৎ দেখা হওয়ার সময়ে একবার মাত্রই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর কয়দিনের মধ্যে কখনো কোন ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি নি। সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত, নির্বিকার। অথচ, বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র হ্রাস নেই। স্মৃতিশক্তিও প্রখর আছে। সামান্য কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে তার প্রমাণ পাই। আমার বন্ধুটির চিঠির কথা বলেন। আশ্চর্য হয়ে বলি, আপনার এই অবস্থা, তবুও তাঁকে এখানে উঠতে নিষেধ করেন নি! আমি এসেই তাঁকে খবর দিয়েছি, এখানে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আশ্রমে ওঠা কোন রকমেই চলবে না।

ফোলা মুখে তাঁর হাসির রেখা ফোটে। চোখ দু'টি আরও কুঁচকে যায়। অদ্ভুত দেখায়। বলেন, উঠতেন না হয় এখানে। থাকতেন ওদিকের ঘরগুলিতে। এ শরীরের মাস দুয়েকের মধ্যে হবার তো কিছু নয়, ডাক্তারই বলেছেন। তবে তাঁদের নিশ্চয় অস্বস্তি বোধ হত। তা ভালই করেছেন।

আমাকে চিরকাল 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সেদিন প্রথম দেখার সময় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলাম। এখন আবার 'আপনি' বলায় হেসে বললাম, কি হল? আজ আবার 'আপনি'তে ঘুরে গেছেন?

আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, কি জান? ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। একবার এক ভক্তের সঙ্গে একটি যুবক এসেছিলেন। স্নেহভরে তাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলাম। শিক্ষিত পুরুষ। তাঁর সম্মানে আঘাত লাগল। কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে সবাইকে আপনি বলাই অভ্যাস হয়ে গেছে। সামান্য সম্বোধনের মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিতে কাজ কি? এই তো ক'দিনের পরিচয়!

চুপ করেন। একদৃষ্টে দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকেন। কোন কিছুর প্রতি নয়। উদার নীল আকাশের পানে নয়, বিরাট হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের দিকেও নয়। লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টি। এই পঞ্চভূতময় জগতের সব কিছুর মূল্য যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়েছে। জাগ্রত সজীব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পৃথিবীর কেউ তিনি নন্। মৃত্যুর রহস্যময় গুহা অতিক্রম করে জীবনোত্তর অজানা এক লোকের সন্ধান যেন তিনি পেয়েছেন। সেখানে শোক নেই, দুঃখ নেই, রোগভোগের গ্লানি নেই,—শুধু এক অপার প্রশান্ত আনন্দ। মনে হয়, জীবনের প্রান্তদেশে নবতর বিজয়যাত্রার যাত্রী পরপারের জ্যোতির্ময় রাজ্যের রূপ দেখছেন!

তাই কাছে বসে দেখি, শান্তভাবে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করার তাঁর অসীম ক্ষমতা, শান্তিপ্রদ আসন্ন মরণের জন্য তাঁর নীরব প্রতীক্ষা।

মনে আসে *War and Peace*-এর একটি চরিত্র-চিত্র। Prince Andrey-র জীবনের শেষ দিনগুলির কথা। গুণী, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত পুরুষ। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়েছেন। পশ্চাৎপদ সৈন্যদল তাঁকে শহরে এনেছে। চিকিৎসার সব কিছু সত্ত্বেও জীবনের আশা নেই। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁর দিন কাটে। পরম আত্মীয়স্বজন কাছে আসেন। অতি প্রিয়জন সেবা করেন। কিন্তু তিনি বন্ধনমুক্ত, নির্লিপ্ত। ঋষি টলস্টয় বর্ণনা দিয়েছেন:

"It seemed that he did not understand what was living, not because he had lost the power of understanding, but because he understood something else that the living did not and could not understand, and that entirely absorbed him.......He experienced a sense of aloofness from everything earthly, and a strange and joyous lightness in his

being. Neither impatient, nor troubled, he lay awaiting what was before him,......The menacing, the eternal, the unknown, and remote, the presence of which he had never ceased to feel during the whole course of his life, was now close to him, and—from that strange lightness of being, that he experienced—almost comprehensible and palpable".

১৮

এগিয়ে চলি মহাপ্রস্থানের পথে। সামনে রেখে স্বর্গারোহণী।

সত্যপদ হ্রদ থেকে ঘণ্টাখানেক গিয়ে সোমকুণ্ড। মাইল দেড় হবে, শুনি। সেই শতোপন্থ গ্লেসিয়ারের চাপা-পড়া তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলা। কোথাও বা সেই শিরদাঁড়া পথ। কুণ্ডটি ছোট। হাত কুড়ি-পঁচিশ মাত্র পরিধি। তুষার-তরলিত স্বল্প জল। যেন বৃহৎ এক শ্বেতপাথরের পাত্রে নির্মল সুনীল বারি সঞ্চয় করে রাখা। গরলপায়ী নীলকণ্ঠ পান করবেন। শোনা যায় চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে কুণ্ডে জলের পরিমাণও কমে, বাড়ে। অমাবস্যায় সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়। হয়তো সব জল জমে যায়। এখান থেকে আরও ঘণ্টাখানেকের পথ সূর্যকুণ্ড। এই ধরণের ছোট ছোট কুণ্ড এসব তুষাররাজ্যে আরও আছে। রুদ্রকঠোর হিমাঞ্চলে স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল জলে স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত পাই। যেন যোগীবর গিরিরাজের আবেশ-বিভোর নয়নে শান্ত মধুর দৃষ্টি।

সামনে কিছুদূরে গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণী। হিমবান্ মহাশৈল। বিরাট আকার। যাত্রাপথে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নাম বদরীনাথ পর্বত। সার্ভের ম্যাপ্-এ বলে চৌখাম্বা। ঐদিক থেকে নেমে এসেছে এই শতোপন্থের হিমবাহ, অপরদিকে নেমে গেছে গঙ্গোত্রী-গ্লেসিয়ার। ঐ পর্বতের গিরিসঙ্কট দিয়ে যেতে পারলে মদমহেশ্বরে নামা যায়। কেদার-নাথেও পৌঁছানো চলে। তবে সাধারণ যাত্রীর পক্ষে এসব সম্ভব নয়। পর্বত-আরোহণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা চাই, সাজ-সরঞ্জাম চাই, দেহের বল এবং অন্তরের সাহস ও সঙ্কল্প চাই। যোগী-ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। অভিযাত্রী-দল দু'একটা গিয়েছে শোনা যায়। চৌখাম্বা শিখরেও উঠেছেন। বিদেশীও,

পথপাশে পড়ে থাকে হিমালয়ের সাধুদের জনহীন গুহাগুলি। আলো-আঁধারে ভরা। অনন্তকালের প্রহেলিকা-প্রচ্ছন্ন। জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপে।

ভাবি, এই গুহাগুলিই ছিল এককালে আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল। বর্বর অসভ্য মানুষ তখন বনচর। গৃহনির্মাণ অজানা কঠিন কর্ম। রৌদ্র-বৃষ্টিতে, রাত্রের অন্ধকারে আশ্রয় নেয় প্রকৃতির স্বাভাবিক গুহার ভিতর। সেইখানেই সংসার পাতে। পাষাণ-শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে। পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ছবি আঁকে। জীবজন্তুর আকার। প্রকৃতির নিপুণ নকল। সতেজ, বেগময়, প্রাণবন্ত রেখা। মানুষের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার প্রথম প্রকাশ। অরণ্য-বাসী মানুষ আহারের সন্ধানে বনে বনে ঘোরে। গাছের ফলমূল খায়। নদীর মাছ ধরে। বনের পশুপাখী শিকার করে। চকমকির আঘাতে আগুন জ্বালায়। চাকার আবিষ্কার করে। মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়। জাগ্রত প্রাণে আলোকের দ্যুতি দেখে। বিজ্ঞানের বুদ্ধি জাগে। জ্ঞানের স্পৃহা আনে। সুদূরের ডাক শোনে। গিরিগুহা ছেড়ে বনপ্রান্তরে নেমে আসে। অরণ্য কেটে শহর তোলে। এককালের গুহাবাসী মানুষ পৃথিবী জুড়ে সুসভ্য মানবজাতির প্রতিষ্ঠা করে। পরিশ্রমে, যত্নে, চেষ্টায়, শিক্ষার গুণে, বুদ্ধির বলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখায়। নিখিল বিশ্বের অসীম রহস্য মনে তার কুহক জাগায়। তারই উন্মাদনায় মানুষ মত্ত হয়। পৃথিবী ছেড়ে গ্রহলোকে ছুটে চলে। আদিম কালের সেই গুহাবাসী মানুষ সভ্যতার আস্তরণে লুপ্ত হয়। আত্মসুখ-সমৃদ্ধির শিখরে ওঠে। কিন্তু, কুসুমেও কণ্টক থাকে, কীটে বাসা বাঁধে। বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানের গরিমা, ধন-সম্পদের দম্ভ মানুষের মনে স্পর্ধা জাগায়। রিপুর দংশন ফোটে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা আসে। দ্বন্দ্ব বাধে। ভোগের লিপ্সা, রাজ্যবিস্তারের লালসা, শক্তির দুর্জয় প্রতাপ ধ্বংসের মুখে টানে। কত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, কত সভ্যতার বিলোপ হয়।

'ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।'

নিমেষে সব ভেঙে পড়ে। তবুও আশাবাদী মানুষ আবার ওঠে। নতুন স্বপ্ন দেখে। জীবনের শুষ্ক বালুচরে আবার স্ফটিকের প্রাসাদ তোলে। ভাবে, জীবনের এই সত্য, এতে পাব সুখ।

কিন্তু প্রকৃত শান্তির তথাপি সন্ধান মেলে না। অতৃপ্ত বাস কামনা অন্তর আকুল করে। যেন, বিধাতার অভিশাপ। 'নিসর্গের নিয়ম'।

অপরদিকে জেগে ওঠেন আর একদল মানুষ। ভিন্ন গোত্র। বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর দল। জাগতিক সভ্যতার সব কিছু দান হেলায় দেন। ধীরপদে দৃঢ়মনে ফিরে চলেন হিমালয়ের গুহামুখে। সং শতকর্ম থেকে ভীরু পলায়ন নয়। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার নয়। কর্তব্যের গুরুভার বহন করে, অনিত্য জগতে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে। জয়যাত্রায়। নিখিলের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়। অন্তর্মুখী অভি সসীম থেকে অসীম অনন্তে। আত্মা থেকে পরমাত্মায়। অন্তরের দীপ জ্বেলে চির-জ্যোতির্ময়ের মিলন-সন্ধান।

তাঁরা আশ্রম করেন ভাগীরথী তীরে। শিবজলা, পুণ্যা, মহানদী, দেবর্ষিগণসেবিতা দেবনদীর উপকূলে। ধ্যানে বসেন একান্তে নিভৃত গিরি-গুহায়। দেবতাত্মা হিমালয়ে।

এইরূপেই ঘটে, সত্যসন্ধানী মানুষের হিমালয়ে পুনরাবর্তন।

এইভাবেই বইতে থাকে চির-মানবের ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহ। ঘেরা গিরি-কন্দর থেকে মানব-সভ্যতার নীল-সাগরে। তারপর আবার আসা হিমাচলের গুপ্ত-গুহায় লুপ্তরত্নের আশায়।

সত্যের অমৃতরূপের সন্ধানে ফেরে অতৃপ্ত মানব।

—শেষ—